# সন্ধানীর সাধুসঙ্গ

প্রভুপাদ শ্রীমৎ প্রাণকিশোর গোস্বামী
এম্‌, এ, বিদ্যাভূষণ,

( দ্বিতীয় সংস্করণ )

প্রকাশক :
শ্রীবিনোদ কিশোর গোস্বামী পুরাণরত্ন
৩।২, নবীন ব্যানার্জী লেন,
পো: সাতরাগাছি, হাওড়া

দুই টাকা

মুদ্রাকর :
শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক
শ্রীকান্ত প্রেস ৭৫, বৈঠকখানা রোড,
কলিকাতা—৯

# উল্লাস

উৎসারিত মনোবেগ অচ্যুত-আনন্দ-পরায়ণ হইলে উদগ্র-সচেতন জিজ্ঞাসার উদয়ন। মানব-মনের মগ্নচৈতন্যে আদর্শ বোধি-কল্পদ্রুম-মূলে ঋদ্ধি-সম্প্রাপ্তির প্রমূর্ত উল্লাস দর্শনের নিমিত্ত সাধনার সম্প্রবৃত্তি। সমুচ্ছয়িত সাধনার নন্দিনী-শক্তি করে সম্বুদ্ধচিত্তের বিস্ফারণ। তখন সাধুসঙ্গের প্রজ্ঞানময় মধুর-সংবেদন জাগ্রতজীবনে রূপায়িত হইয়া ঐতিহ্য ও উপলব্ধি, ইহলোক পরলোকের [illegible]-রেখা অনন্তের আঙ্গিনায় করে সম্প্রসারিত।

দেশকালের ব্যবচ্ছেদ অস্বীকার করিয়া মরমিয়ার মর্মবাণী যুগে যুগে অনুরণিত—মানবমনের সুপ্রসন্নতায়। নবজাগরণে সেই অনাদি অনন্ত চিরন্তন প্রেমের প্রতিষ্ঠা হউক স্বাধীনতার অনাস্বাদিত অপূর্ব রূপে।

# নম্র নিবেদন

অলৌকিক রস পিপাসা চিরন্তনী। মানব মনের গোপনে অজানা অভীপ্সা। প্রাণ স্পন্দনে আনন্দ স্ফুরণ। প্রতিটি ইন্দ্রিয় বৃত্তি অনুভব-উজ্জীবন। দেহমনের নিবিড়সম্বন্ধে প্রিয় অপরিচিতের অঙ্গুলি সঙ্কেত। ঋষির দর্শনে চিরসুন্দর, মুনির মননে পরমানন্দময়, জ্ঞানীর বিজ্ঞানে নিখিল ভুবনভরা, মরমিয়ার অন্তরতম মধুররসাল রূপের পরিচয় হয় সাধুগণের সঙ্গপ্রভাবে।

সমাজ, গোষ্ঠী, শিক্ষা ও কালের প্রভাব অতিক্রম করেন সাধক। উদার প্রাণ নির্মল দৃষ্টি লোকোপকারী পরমসুহৃৎ মহতের অভ্যুদয়ে জনগণের অপরিমেয় শ্রেয়ঃ সংসাধিত হয়। হিংসাবিদ্বেষপূর্ণ ব্যবহারিক-জীবনের কলরোল অন্তর্মনা পরমার্থ-পথিকের ধৈর্য্য ধ্বংসকরিতে অসমর্থ। কামনার বিষবাষ্প বিশ্বের সর্ব্বত্র বিসর্পিত হইলেও অধ্যাত্মবাদীর প্রাণের দেউলে প্রেমের পূজা চিরদিন নির্বাধরূপেই চলিতে থাকে। সত্য সন্ধানীর সমীপে প্রাদেশিকতা, জাতীয়তা বা গোষ্ঠীর বাধ্যবাধকতা একান্ত অলীক। নিত্য আনন্দময় অনন্ত আকাশচারী নিরবচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহে সঞ্চরণশীল নিখিলের মঙ্গলায়তন চৈতন্য পুরুষ নিবেদিত বিশুদ্ধ আত্মার অভিভাবক। ভাবশান্ত জীবনের সুমঙ্গল আদর্শ জৈবলালসার সংগ্রাম-ভূমিতে সাময়িকভাবে অনাদৃত হয়। সংস্কৃতির শুভ্রাবরণে পুঞ্জীভূত দুষ্কৃতির আপাতমনোরম ভ্রান্তিচিত্র ক্ষণিকের মোহ সৃষ্টি করিতে পারে। মরমিয়ার মর্মবাণী মোহাবর্তের বিলুপ্তি বিধানে অসাধারণ মন্ত্রশক্তির প্রভাব বিস্তার করে। সন্ধানীর সাধুসঙ্গ আদর্শ রহস্যবাদীর জীবন-কথা ও বাণী সংগৃহীত হইয়াছে উহা সামাজিকের মনে অলৌকিক ভাব পরিবেশ রচনার সহায়ক হইবে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে এই গ্রন্থ প্রকাশে যে "উল্লাস" তাহার পরে আর "ভূমিকা" সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করি নাই। দ্বিতীয় সংস্করণে পাঠকপাঠিকাগণের সাদর অধ্যয়নই একমাত্র প্রার্থনা।

শ্রীনিত্যানন্দ ত্রয়োদশী
১৩৬৩

বিনীত
গ্রন্থকার

# সন্ধানীর সাধুসঙ্গ

—(০)—

## নরসী

নাম নরসিংহ রাম। লোকে বলে নরসী। ছেলেটি দেখিতে সুন্দর কিন্তু কথা বলিতে পারে না। প্রায় আট বৎসর অতীত হইল। কথা ফুটিল না। সকলেই বলে, নরসী বোবাই থাকিয়া যাইবে। পাঁচ বৎসর বয়সে পিতৃমাতৃহীন নরসীকে পালন করেন তাহার ঠাকুর মা—জয়কুমারী। ইনি সর্ব্বদাই সাধু মহাত্মার কাছে নাতির কথা ফুটিবার প্রার্থনা করিয়া বেড়ান। তিনি ভাবেন—দেবতার কৃপা ভিন্ন কিছু হইবার নয়। সাধুরা ভগবানের দয়ার মূর্তি। মানুষের উপকারের জন্য তাহারা দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ান। তাহাদের দয়া ভগবানেরই দান।

ফাল্গুন মাস। হোলীর আনন্দ সুরু হইয়াছে। জুনাগড়ে হাটকেশ্বর-মহাদেবের মন্দিরে বহু দর্শকের সমাগম। আঙ্গিনা হইতে ভিতর দালান পর্যন্ত ফাগুতে লালে লাল হইয়া আছে। যাহারা আসে মহাদেবকে ফাগ্ দিয়া যায়। উৎসবের দিনে দূর দেশান্তর হইতে নূতন নূতন সাধুর আগমন হয়। জয়কুমারী তাহার বোবা নাতিটিকে লইয়া আসিয়াছে। তিনি দেখিলেন, এক সাধু পদ্মাসনে যোগস্থ হইয়া আছেন। বৃদ্ধা নাতিকে লইয়া সাধুর যোগ-ভঙ্গের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সমাধি ভঙ্গ হইল। সাধু ইতি উতি দৃষ্টিপাত করিলেন। সুন্দর বালকটির উপর তাহার করুণামাখা দৃষ্টি পড়িল। তিনি ইঙ্গিত করিয়া

বালককে কাছে ডাকিলেন। উদগ্র উৎসাহে বৃদ্ধা নাতিকে লইয়া অগ্রসর হইল। দুইজনেই সাধুকে প্রণাম করিল। জয়কুমারী বলে—বাবা, আমার বড় দুঃখ। এই ছেলেটির মা বাপ নাই। আমি ওর ঠাকুর মা। আমিই পালন করি। কিন্তু বাবা নরসীর যে এখনো কথা ফুটিল না। কানেও শুনিতে পায় না। ওর একটা উপায় আপনি করুন।

সাধু বলেন- তাই নাকি? এমন সুন্দর ছেলে কানে শুনে না-- কথা বলে না। আহা! দেখি, দেখি, আয় বাছা কাছে আয়।

নরসী সাধুর খুব কাছে গেল। সাধু তাহাকে দেখিয়া আনন্দিত। তাহার মাথায় হাত রাখিয়া কানে চুপি চুপি কি যেন বলিলেন। তারপর উচ্চস্বরে আদেশ করিলেন—বল বাছা, আমার সঙ্গে বল—রাধেকৃষ্ণ রাধেকৃষ্ণ। একবার —দুইবার—তিনবার। কি আশ্চর্য—সেই কালা বোবা ছেলেটি স্পষ্ট ভাষায় উচ্চারণ করিল—রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ—রাধেকৃষ্ণ।

দিল্লীর সম্রাট হুমায়ুন। জুনাগড়ের শাসনকর্তা মাণ্ডলিক রাও হুমায়নের অধীন হইলেও স্বতন্ত্র রাজার মত প্রভাবশালী। ইনি নাগর ব্রাহ্মণ। নরসীর পিতা দামোদর ইঁহারই আত্মীয়—খুব উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র বংশীধরকে রাজা নিজে ডাকিয়া চাকুরি দিয়াছেন। বংশীধর বিবাহ করিয়াছে—পত্নীর নাম গৌরী। দাস দাসীর অভাব নাই. যথেষ্ট অর্থাগম—বিপুল প্রতিষ্ঠা। সবই আছে কিন্তু ঘরে শান্তি নাই—কারণ গৌরী—সে বড় অভিমানী। অপরকে দুঃখ দিয়া সে সুখী হইতে চায়। ইহাতে সংসারে লোকজন আত্মীয় স্বজন সকলেই অসন্তুষ্ট। বংশীধর ছোট ভাই নরসীকে বড় ভালবাসে। ইহাতে গৌরীর আরো গাত্রদাহ। নরসীর কথা ফুটিয়াছে—

বড় হইয়াছে। সে বেশ লেখাপড়া করিতেছে। ঠাকুর মা একদিন বলিলেন,—বংশীধর নরসীকে সংসারী করিয়া দে। গৌরী প্রস্তাব শুনিয়া চটিয়া গেল। সে বলিয়া উঠিল—এক পয়সা রোজগারের নাম নাই, তার আবার বিবাহ। বংশীধর কিন্তু বৃদ্ধা ঠাকুরমার কথা ঠেলিতে পারিল না। সে বলিল,—আচ্ছা, ঠাকুরমা, দেখিতেছি। একটি ভাল মেয়ে পাইলে বিবাহ দিয়া দিব।

কিছুদিন হইল নরসীর বিবাহ হইয়া গিয়াছে। বৌটি যেন সোণার প্রতিমা নাম মাণিক। নরসীর কিন্তু ঘরে মন নাই। মাণিক কোণে বসিয়া কাঁদে। নূতন বৌ কাহাকেও কিছু বলিতে পারে না। নরসী ফিরিয়াও দেখে না। তাহার কাছে এক জোড়া করতাল, গুন্ গুন্ করিয়া সে আপন মনে গান করে—সময়ে অসময়ে করতাল লইয়া বাহির হইয়া যায়। তাহাকে খুঁজিলে দেখিতে পাইবে কোনো নাম কীর্ত্তন দলের মধ্যে আর না হয় তো কোনো ঠাকুর বাড়ীর বারান্দায়।

সাধু কি নাম দিয়া গিয়াছে—সেই "রাধে কৃষ্ণ" নাম সে গান করে আর বিভোর হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে দেখা যায় সে ফুল তুলিয়া আনে মালা গাঁথে, ঠাকুর বাড়ীতে দিয়া আসে। দ্বারকার পথে কোনো সাধুর দল জুনাগড়ে আসিলে নরসী তাহাদের দলে যায়, কেহ ভজন কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সে করতালে তাল দেয়, কেহ নাচিতে আরম্ভ করিলে সেও সঙ্গে সঙ্গে নাচে। কোনো কৃষ্ণলীলার দল আসিলে তো কথাই নাই, নরসীকে আর তখন বাড়ীতে পাওয়া যাইবে না, তাহার খাওয়া দাওয়া ঘুচিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণলীলা দলের সঙ্গে সে নাচিয়া নাচিয়া গান গাহিয়া বেড়ায়। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে বলে, আর ভাই, আমি যে রাসলীলা দেখি। দলের লোক তাহাকে নিজেদের দলে টানিয়া লয়, সখী সাজাইয়া দেয়—সে গোপীর ভাবে নাচে। নৃত্য

ভঙ্গিতে সে রসকে প্রমূর্ত করিয়া দেয়। সে যেদিন যে দলে নাচে, সে দলের গান খুব জমিয়া যায়। তাহার খাওয়া পরার ভাবনা নাই—মাণিকের টান নাই। এই ভাবেই দিন যায়।

গৌরী পাড়াপরসীর কাছে শুনে—দেবর কৃষ্ণলীলায় ঢুকিয়াছে। তাহার শরীর জ্বলিয়া যায়। সে মাণিককে গালি দেয়। স্বামীর উপর রাগ করে। দাস দাসীর সহিত কথা বলে না। সে কি করিয়া নরসীকে শাসন করিবে ভাবিয়া পায় না। বুকের মধ্যে অরুন্তুদ হিংসার আগুন সমুচ্চয়িত হইতে থাকে। নরসী ঘরে আসিয়া দেখে মাণিক কাঁদে। গৌরী কথা বলে না। খাবার জল নাই। ঘরে আলো নাই। কেহ জিজ্ঞাসা করে না। সকলকার মুখ ভার। বংশীধর ফিরিয়া তাকায় না। নরসী ভাবে, আমি কি দোষ করিলাম, আমি তো রাস দেখিতেই গিয়াছিলাম।

সেদিন দুপুরবেলা বড় ক্ষুধা পাইয়াছে। নরসী আসিয়া বলিল, বৌদি, ভাত দাও। রণচণ্ডী গৌরী বলিয়া উঠিল—কাজের নামে রামদাস, খাওয়ার বেলায় সবার আগে, কেন, তুমি কি কিছু কাজ করিতে পার না? দেখ না তোমার দাদা খাটিয়া খাটিয়া আর পারিয়া উঠিতেছে না। চাকর বাকর গুলিকে খাটাইলেও তো হয়। তুমি কি সাপের পাঁচ পা দেখিয়াছ? গান আর কীর্তন করিলেই দিন যাইবে? আমরা আর কত দিন তোমাকে খাওয়াইব? দুদিন পর তোমার ছেলে হইবে। তাহাকে কি খাওয়াইবে একবার ভাব না? শুধু গোকুলের ষাঁড় হইয়া ঘুরিলেই চলিবে? নরসী উত্তর করিল না। মাথা নীচু করিয়া চলিয়া গেল। সে খবর পাইয়াছে নূতন একদল কৃষ্ণলীলা আসিয়াছে। ততক্ষণ হয় তো তাহাদের গান সুরু হইল। ক্ষুধার্ত হইলেও সে সেই দিকেই চলিল।

এবারে সে অনেকদিন বাড়ী ফিরে নাই। যখন সে বাড়ী ফিরিল দেখিল তাহার একটি কন্যা জ গ্রহণ করিয়াছে। মেয়েটি মাণিকেরই ছাঁচে ঢালা—সোণার পুতুল। নাম রাখিয়াছে "কুমারী"। গৌরীর সন্তান নাই, কুমারীকে পাইয়া সে আনন্দিত। অন্তরের গোপন বাৎসল্য ফুটিয়া উঠিয়াছে কুমারীর যত্নে। নরসী এবার আসিতেই গৌরীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। সে হাসিয়া মেয়েটিকে কোলে লইয়া নরসীর সুমুখে আনিয়া দাঁড়াইল। বলিল, দেখ কিরকম রাঙা টুকটুকে মেয়ে। তুমি কোথায় ছিলে ? রাগ করো না ভাই, কত কথা হয়, কত কথা যায়। আর তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না। এইবার হাড়ে বাতাস লাগিবে।

কিছুদিন যায়। নরসী রাজ-সরকারে একটি কাজ লইয়াছে। যাহা রোজগার করে তাহাতেই সংসার চলিয়া যায়। অবসর সময়ে কীর্তন করে। তাহার এক মেয়ে, এক ছেলে—কুমারী ও শ্যামলদাস।

কুমারী বড় হইয়াছে। বৃদ্ধা জয়কুমারী বলিলেন—আরে নরসী, তোর মেয়েটার বিবাহ দে, আমি দেখিয়া যাই। নরসী ভাবে, যাহা পাই তাহাতে সংসার কুলায় না, আমি কুমারীর বিবাহ দিব কি করিয়া ? সে একদিন দাদার কাছে কথাটা পাড়িল। বংশীর অর্থের অভাব নাই। সে বৃদ্ধা ঠাকুরমার অভিলাষ পূর্ণ করিবে। গৌরীরও উৎসাহ কম নয়। কারণ সে মেয়েটিকে বড়ই ভালবাসে।

সম্বন্ধ স্থির হইল। পাকা দেখা হইল। বহু অর্থব্যয়ে আনন্দ করিয়া কুমারীর বিবাহ উৎসব সম্পন্ন হইল।

কন্যার বিবাহের পর নরসী কাজ ছাড়িয়া দিল। কীর্তনের দলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো কাজ নাই। একদিন বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইয়াছে। দ্বারের কড়া নাড়িতেই গৌরী চেঁচাইয়া উঠিল—"এসেছেন, বড় ভক্ত এসেছেন—কাজের সময় অষ্টরম্ভা শুধু লোকের জ্বালাতন।

কত রাত্রি হইয়াছে সারাদিন খাটুনীর পর ঘুমাইব—তাহার উপায় নাই। এখনো তাহাদের দাসীগিরি করতে হবে। আর পারি না।" মাণিক জাগিয়াই ছিল। সে বড় দিদির কথাগুলি শুনিয়া মনে মনে দুঃখিত হইল। মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই।

নরসী খাইতে বসিয়াছে। সম্মুখে অর্ধদগ্ধ কতগুলি বাসি রুটি উপকরণ আর কিছু নাই। গৌরী বলিতেছে—কে জানে তুমি অতরাত্রে না খাইয়া আসিবে। কেন, যাহাদের দলে নাচাকুঁদা হইল তাহারা খাইতে দিল না? নরসী বলিল, আমি তো আজ মোটে কীর্তনের দলে যাই নাই। দাদা একটু কাজে পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতেই রাত্রি হইয়া গেল। গৌরীর রাগ কমিল না। সে চীৎকার করিয়া বলিল, আমি তোমার কোনো কথাই শুনিতে চাই না। তুমি তোমার ব্যবস্থা কর, আমাদের এখানে আর চলিবে না।

বংশীধর ঘরে আসিলে গৌরী কাঁদিয়া তাহার কাছে বলিতে লাগিল,—তুমি তোমার ভক্ত ভাইকে লইয়া থাক, আমি আর এ বাড়ীতে আসিব না। আমি চলিলাম বাপের বাড়ী। যেমন তোমার গুণধর ভাই, তেমন বৌটি। এ বাড়ীতে আর আমার থাকা চলিবে না। তুমি আমাকে বাপের বাড়ী রাখিয়া এস।

মানুষের ধৈর্য বেশীদিন থাকে না। দিনের পর দিন স্ত্রীর মুখে ভাইয়ের নিন্দা শুনিয়া একদিন বংশীধর বলিতে বাধ্য হইল,—ভাই নরসী, তুমি তোমার পথ দেখ। আমি আর তোমাদের সংসার চালাইতে পারিব না। নরসী অসহায়। দাদার কথা শুনিয়া সে উদাস মনে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

বৈশাখী পূর্ণিমা। চন্দ্রকিরণ চতুর্দিক সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে। নরসীর মনের মধ্যে গাঢ় অন্ধকার। সে পথ পাইতেছে না। কোথায়

যায় কি করে ? গ্রামের বাহিরে একটি চৌতারা। বসিয়া বসিয়া সে অনেকক্ষণ ভাবিল। গভীর রাত্রে কখন নিদ্রা আসিয়া তাহাকে সেই ভাবনার হস্ত হইতে অবসর দিল তাহা সে জানে না। যখন ঘুম ভাঙ্গিল মন্দ মন্দ পবন বহিতেছে, কূজন-নিরত পক্ষিকুলের কাকলিতে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। অরুণ কিরণ আসিয়া ভূমিকে চুম্বন করিয়াছে। নরসীর অবসাদগ্রস্ত মনে নূতন চেতনার ধারা প্রবাহিত করিয়াছে। সে উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে পড়িল—আজ সোমবার। উপবাসের দিন। নিকটেই একটি শিব-মন্দির। সে সেই দিকে চলিল। সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া কয়েকটি ফুল বেলপাতা সংগ্রহ করিয়া সে মন্দিরে ঢুকিয়া পড়িল।

অনেকক্ষণ চুপ্‌চাপ। সে যেন এক ভিন্ন রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দরধারে অশ্রুধারা প্রবাহিত। ধীরে ধীরে ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল। শঙ্করের উদ্দেশ্যে অস্ফুট বাণী ক্রমশঃ স্ফুট লইতে লাগিল। সে বলে—দেবাদিদেব, তুমি অন্তর্যামী। তুমি আমার মনের কথা সবই জান। আমি তো কখনো কারো অনিষ্ট করি না। আমি তো খাটিতে রাজি আছি। তুমি আমাকে দিয়া যাহা করাইবে তাহাই করিব। আমার যে কোনো স্বাধীনতা নাই ? তুমিই যে আমার চালক। হে প্রভু! তুমিই যে আমার একমাত্র সহায়। বড় বিপদে পড়িয়া তোমার শরণাগত। তুমি প্রসন্ন হও। তোমার করুণা জীবনে অনুভব না হইলে আমি উপবাসেই প্রাণত্যাগ করিব। ব্যবহার জীবনের জগদ্দল ভার সরাইয়া লও।

প্রার্থনা চলিল। হঠাৎ এক ব্রাহ্মণ শিবপূজা করিতে আসিয়া নরসীকে দেখিয়া বলিলেন—ওহে নরসী, তুমি যে এখানে। বেশ হইয়াছে। আমি তোমাকে খুঁজিয়াছিলাম। আমাদের গ্রামে কৃষ্ণলীলার একটি দল

আসিয়াছে। তাহারা সাত দিন গান করিবে। তুমি এই ক'দিন আমাদের ওখানে থাকিয়াই গান শুনিবে। নরসীর আনন্দ আর ধরে না। সে বলে,—ঠাকুর বড় ভাল হইল। আমি আজই বিকাল বেলা যাইব।

নরসী প্রতিদিন সন্ধ্যায় কৃষ্ণলীলা শুনে, সকালবেলা শিবালয়ে ভজন করে। এইভাবে সাতটি দিন কাটিয়া গেল। রাত্রিতে গান শুনিয়া আসিয়া সে জনহীন শিবালয়েই পড়িয়া থাকে। শিবালয়ে তাহার সাধনা চলিয়াছে। তাহার মন নিষ্ঠায় পূর্ণ।

দুপুর রাত্রি। নরসী ঘুমাইতেছিল। হঠাৎ চমকিয়া উঠিল। উঠিয়া বসিল। শঙ্কর হস্ত প্রসারিত করিয়া নরসীকে ইঙ্গিত করিতেছেন। সে মুগ্ধের মত চাহিয়া দেখিতে লাগিল। শঙ্কর বলিলেন,—তোমার সাধনায় আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। তুমি বর প্রার্থনা কর। নরসী বলে,—আমি চাহিতে জানি না। তুমি যাহা সব চাইতে ভাল বলিয়া মনে কর, উহাই আমাকে দাও। শঙ্কর বলেন,—বাঃ সুন্দর বর চাহিয়াছ। আমি কৃষ্ণচন্দ্র ভিন্ন আর কিছুই ভাল বুঝি না। তুমি যদি চাও, আমি কৃষ্ণকে দেখাইয়া দিতে পারি। নরসীর এই আকাঙ্ক্ষাই ছিল। যখন সে দেখিল, শঙ্করের করুণায় সেই আশালতা পুষ্পিতা হওয়ার উপক্রম হইয়াছে তখন সে আনন্দে নাচিয়া উঠিল।

নরসী কি জানি কেমন হইয়া গেল। সম্প্রাপ্তির আনন্দে—তাঁহার দেহ মন পরিবর্ত্তিত হইল। সে দেখিল এক উজ্জ্বল আলোকের মধ্য দিয়া সে যাইতেছে। অনেকদূর অগ্রসর হওয়ার পর একটি বৃহৎ রত্নদ্বার মন্দিরের অভ্যন্তরে শান্ত স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ। শঙ্কর নরসীকে লইয়া সেই মন্দিরে ঢুকিলেন। দিব্য সিংহাসনে কৃষ্ণ। সম্মুখেই পরমভাগবত অক্রূর উদ্ধব, বিদুর বসিয়া আছেন। উগ্রসেন ও বলরাম বিশিষ্ট আসনে উপবিষ্ট। শঙ্কর প্রবেশ করিলে সভ্যগণ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বয়ং

ভগবান কৃষ্ণ অগ্রসর হইয়া আসিলেন। সুন্দর আসনে শঙ্কর বসিলেন। কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—দেবাদিদেব এই সময়ে আপনার আগমনের কারণ কি? শঙ্কর বলিলেন,—ভগবন্! এই ব্রাহ্মণ নরসী তপস্যা করিয়া আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি—ইহাকে লইয়া আসিয়াছি। আপনি ভক্তবৎসল ইহাকে গ্রহণ করুন। শঙ্করের কথা শুনিয়া কৃষ্ণ হস্ত প্রসারিত করিলেন। তাঁহার কোমল কর নরসীর মস্তকের উপর স্থাপিত হইল। ভগবদনুভবের অনুপ্রাণনা ও আনন্দ তাহাকে বিহ্বল করিয়াছে। তখন কি আর নরসী স্থির থাকিতে পারে? তাঁহার নয়নে প্রেমের অশ্রুধারা। ভগবান্ শঙ্করের প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—সাধকপ্রবর, তুমি শঙ্করের প্রীতিবিধান করিয়াছ। শঙ্কর আমার প্রিয়, আমি শঙ্করের প্রিয়। তুমি শঙ্করের করুণায় সফল মনোরথ হইয়াছ। এখন তুমি এই দ্বারকাপুরীতে অবস্থান কর।

শরৎকাল। পূর্ণিমা রজনী। দ্বারকার উদ্যানবাটিকা। নবকুসুম-বিকশিত উপবন। মনে হয়, যেন বৃন্দাবনের আবির্ভাব হইয়াছে। কৃষ্ণের প্রিয়াগণ রাসকেলি কৌতুক দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়াছেন। বৃন্দাবনে গোপীমণ্ডলে প্রতি গোপীর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া গোপীনাথের রাস নৃত্য। দ্বারকার উদ্যান বাটিকায় নরসী সেই লীলা দর্শন করিয়া আনন্দে নাচিতেছে। তাঁহার অঙ্গভঙ্গি, ভাব ব্যাকুলতা গোপীনাথেরও আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছে। গোপীনাথ নিজ অঙ্গের পীতাম্বর ছুড়িয়া দিলেন নরসীর অঙ্গে। কৃষ্ণপ্রসাদি বস্ত্র ধারণ করিয়া নরসীর অব্যক্ত আনন্দ সংবেদন। ভগবান্ একটি মশাল লইয়া নরসীর হাতে দিলেন। জ্বলন্ত মশাল হাতে লইয়া মণ্ডলীর মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়াছে নরসী। সে তন্ময় হইয়া রাস দেখিতেছে। কত রঙ্গ, কত ভঙ্গি, কত ছন্দ, বিচিত্র সঙ্গীত লহরীতে তাঁহার অন্তর আন্দোলিত। মশালটি পুড়িয়া পুড়িয়া

তাহার হাত ধরিয়াছে। মশালের মতো হাত পুড়িয়া যাইতেছে। নরসীর সেদিকে লক্ষ্য নাই।

নৃত্য থামিল। রাসপ্রেমিকের হাত পুড়িয়া যাইতে দেখিয়া বিচলিত কৃষ্ণ ছুটিয়া গেলেন। নিজের অমৃত পরশে তাহার অগ্নি নির্বাপিত করিয়া দিলেন। কৃষ্ণপ্রিয়াগণ নরসীর অদ্ভুত প্রেম দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত। কৃষ্ণ তাহাদিগকে বলেন,—নরসী আমার অভিন্ন হৃদয়। সে প্রেমে আমার সমান হইয়াছে।

আনন্দ উৎসবে অনেকদিন কাটিয়া গিয়াছে। নরসী প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে কৃষ্ণের পদসেবা করে, আর ভাবে—অহো! দেবমুনি-বাঞ্ছিত চরণ আমি সেবা করিবার সুযোগ পাইয়াছি। গৃহের অন্ধকূপে পড়িয়া থাকিলে আমার এই অবসর মিলিত না। আমি তো সংসারে আসক্তই ছিলাম। আমাকে সংসারের আসক্তি হইতে অনিচ্ছাসত্বেও দূরে সরাইয়াছে আমার বৌদি। তাঁহার দুর্বাক্যে আমি সংসারে বিতৃষ্ণ হইয়াছি। শঙ্করের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। তাই তো আজ এই মহা সৌভাগ্যের উদয়। আজ্ বুঝিতে পারিয়াছি—তিনি আমাকে হিংসা করিয়া আমার উপকারই করিয়াছেন।

কৃষ্ণ বলেন,—নরসী, তোমার সেবায় আমি সন্তুষ্ট। তুমি কি চাও বল। নরসী উত্তর দেয়, প্রভু চিন্তামণি পাইলে কি আর অন্য কিছু পাইবার লোভ থাকে? কৃষ্ণ বলেন,—তুমি গৃহস্থ তোমার কয়েকটি ঋণ আছে। দেবতার প্রতি কর্তব্য, পিতৃপুরুষগণের প্রতি কর্তব্য, স্ত্রীপুত্রের প্রতি কর্তব্য আছে। এই সকল কর্তব্য পালন না করিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

নরসী দুঃখ করিয়া বলে, তোমার সেবার পরেও আবার ঋণ, কর্তব্য? হে ভগবন্! মিনতি করি, আর আমাকে মায়ার বাঁধনে বাঁধিও না।

যদি কিছু কর্তব্য অবশিষ্ট থাকিয়া থাকে, তুমিই উহার সমাধান করিয়া লও। ভগবান্ বলেন, আমার সেবকের সমস্ত ভার আমিই বহন করি। তথাপি লৌকিক মর্যাদা রক্ষার জন্য তাহাকে দিয়া সাধারণ মানুষের মতো কাজ করাইয়া লই। ভয় করিও না। সংসার কালসর্প আর তোমাকে দংশন করিতে পারিবে না। তুমি আমার চিহ্নিত দাস হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ কর। ভজনের রীতি শিক্ষা দিবার জন্য আমার বিগ্রহ সেবা কর। এই আমার অভিন্ন স্বরূপ বিগ্রহ তোমাকে দিতেছি। এই লও করতাল, এই আমার পীতাম্বর। এই আমার ময়ূরপুচ্ছ। করতাল বাজাইয়া যখনই আমার নাম গান করিবে আমি তোমার কাছে উপস্থিত হইয়া অভিলাষ পূর্ণ করিব।

নরসীর সমাধি ভঙ্গ হইল। সত্যই তাহার পরিধানে পীতবস্ত্র সম্মুখে অভিনব সুন্দর গোপীনাথের বিগ্রহ, করতাল ও ময়ূরপুচ্ছের মুকুট। সে জুনাগড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রথমেই আসিয়া সে বৌদিদিকে নমস্কার করিল। বংশীধর ও গৌরী তাহার বেশভূষা ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত ও ক্ষুব্ধ হইল। বংশীধর বলিল,—ওরে মূর্খ, পয়সা রোজগার করিতে না পারিয়া এখন সাধুর বাহানা ধরিয়াছ। কপালে তিলক, গলায় তুলসী মালা, হাতে করতাল, মাথায় ময়ূরপুচ্ছের মুকুট; হল্‌দে কাপড় এ সকল দিয়া লোক ভুলাইতে পারিবে, আমাদের ভুলাইতে পারিবে না। এগুলি তুমি কোথা হইতে জোগাড় করিয়াছ? আমাদের বাড়ীতে থাকিতে হইলে এই সব চলিবে না। এইগুলি ফেলিয়া দাও। নরসী বিনীতভাবে বলে,—দাদা! এইগুলি যে ভগবানের দান। ভগবানের প্রসাদি বেশভূষাকে অবজ্ঞা করিলে ভগবান্‌কে অপমান করা হয়। বংশীধর রাগিয়া বলে, হয়েছে ঢের শুনেছি। আর ভাঁড়ামিতে কাজ নাই। তুমি কচি খোকাটি নও। দু'টী সন্তানের পিতা হইয়াছ।

আর কতদিন ভবঘুরের মত থাকিবে ? ভিখারীর বেশ ছাড়িয়া দাও। আমার কথা শুনিয়া ঠিক রাস্তায় চলো। এখনো সময় আছে। আমি রাজাকে বলিয়া কহিয়া একটি চাকুরি করিয়া দিব। কথা না শুনিলে শেষ পর্যন্ত শুকাইয়া মরিতে হইবে।

নরসী বলে, দাদা ! ভগবানে ভক্তি করিলে যদি তুমি অসন্তুষ্ট হও, আমি নাচার। সংসারের আর সব রসাতলে যাউক। আমি ভজন ছাড়িতে পারিব না। গৌরী এতক্ষণ চুপ্ করিয়াছিল। নরসীর কথা শুনিয় সে আর সহ্য করিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল, আহা ! কি ভক্ত রে। বড় ভাইয়ের সম্মান করিতে জানে না, সে আবার ভজন করিবে। তোমাকে বাড়ীতে রাখিয়া লোকের কাছে আমি নাক কাটাইতে পারিব না। আর দশজনের মত থাকিতে হয়তো বাড়ীতে থাকিবে। লজ্জা নাই তোমার—এতদিন বসাইয়া খাওয়াইলাম। তার প্রতিদান এই অবাধ্যতা। যাক্ অদৃষ্টে যা ছিল হইয়াছে। এবার তোমার স্ত্রীটিকে লইয়া সরিয়া পড়ো। কোথায় ছিলে এতদিন ? আমরা না দেখিলে তো সে শুকাইয়া মরিত। নরসী বিনীতভাবে বলে, —বৌদিদি ! তোমাকে আমি মায়ের মত মান্য করি। আমার স্ত্রী যদি তোমাদের কাছে এতই ভার বোধ হইয়া থাকে, আমি তাহাকে পৃথক্ করিয়া দিব। তোমাদের আর ভাবিতে হইবে না। গৌরী তর্জন করিয়া বলে,—দেখ এক পয়সার ক্ষমতা নাই, কত বড় কথা। নির্লজ্জ "দিব কেন" ? আজই দাও। আমার হাঁড়ীতে আর তোমাদের ভাত নাই। নরসী পুত্রের সহিত মাণিককে ডাকিয়া লইল। বংশীধরকে নমস্কার করিয়া বলিল,—দাদা তবে নমস্কার।

সহরের প্রান্তে ধর্মশালা। কত লোক আসে, কত যায়। এ বেলা আসে, ওবেলা যায়। দেশ দেশান্তরে বাড়ী ধর্মশালায় একত্র অবস্থান

করে। দিনেক দুদিনের জন্য কোলাহল। আবার নিজের পুঁটলী বাঁধিয়া যে যাহার গন্তব্যস্থলে চলিয়া যায়। কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র। ধর্মশালায় সকলেই ঠাঁই লয়। কেহ শুষ্ক রুটি চর্বণ করে, কেহ রসাল পরমান্ন ভোজন করে। ক্ষুধা সকলেরই সমান। উদর পূর্তির সন্তোষও এক জাতীয়—ভোজ্য সামগ্রীর রূপান্তর মাত্র। মাণিককে লইয়া নরসী ধর্মশালায় উঠিল। মাণিক বলে,—সাধু, ফকীর, পথিক, তাঁহারাই তো ধর্মশালায় থাকে। আমরা গৃহস্থ। এখানে থাকা কি আমাদের ভাল দেখায়? নরসী বলে, ভাবিয়া দেখ মাণিক, এই সংসারটাই একটা বড় ধর্মশালা নয় কি? তবে আর আমাদের এই ধর্মশালাতে দোষ কি হইল?

নরসী ভজন করিতে বসে। করতাল বাজাইয়া সে রাধাকৃষ্ণ নাম গান করে। বাহিরের জগতের কোনো সন্ধানই তাঁহার নাই। পাশের কামরা হইতে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাহির হইয়া আসেন। নিবিষ্ট চিত্তে ভজন গান শুনিতে থাকেন। সাধুর গান শুনিয়া লোকটির অন্তর গলিয়া গিয়াছে। তিনি জিজ্ঞাসা করেন,—সাধুজীর কোথায় থাকা হয়? নরসী আদ্যোপান্ত তাঁহার দুঃখের কথা বলে। কথা শুনিয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তি বলেন,—আপনার যদি আজ্ঞা হয়, নিকটেই আমার একটি বাড়ী আছে। সেই বাড়ীটি আপনার থাকিবার জন্য বন্দোবস্ত করিতে পারি। আপনার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে ভগবৎকৃপায় আমি যোগাইতে চেষ্টা করিব। নরসী বুঝিল, ইহা সেই সাধুগণের যোগক্ষেম বহনকারী ভগবানের অনুগ্রহ। পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহারা নূতন বাড়ীতে নূতন সংসারী।

নূতন বাড়ী। ঠাকুর মন্দির। তুলসী কানন। কুসুম উদ্যান। বড় নাট মন্দির। নরসী খুব খুসী। তাহার মনের মত বাড়ী। নাট মন্দিরে

ভক্ত সমাগম হইবে। ফুল তুলসীর জন্য আর কোথাও যাইতে হইবে না। মন্দিরে বিগ্রহ-সেবা বেশ ভাল ভাবেই চলিবে। ভাণ্ডারে প্রচুর সামগ্রী। তিন বৎসর উৎসব করিয়া কাটাইলেও উহা ফুরাইবার নয়। বাড়ীতে আসার পর আর সেই ধনী ব্যক্তির সঙ্গে দেখা নাই। নরসী ভাবে– লোকটি কোথায় গেল? আর যে তাহাকে দেখিতে পাইনা?

গভীর নিশায় নরসী স্বপ্ন দেখিল। কৃষ্ণ বলিতেছেন নরসী, অক্রূরকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছিলাম। যখন প্রয়োজন পড়িবে সে যাইবে। কৃষ্ণ সেবায় দিন দিন নরসীর আগ্রহ। কোনো অচেনা সাধু আসিলে সে ভগবান্ বলিয়া যত্ন করে। কি জানি কোন্ দিন কোন্ ছদ্মবেশে ভগবান্ আসিবেন। যদি তাঁহার সেবার কোনরূপ ভুল হইয়া যায়?

মাণিকের মেয়ে শ্বশুর বাড়ী যাইবে। তাহার সঙ্গে কিছু তত্ত্ব পাঠাইতে হইবে। কাপড়, জামাতার জন্য ভাল জামা, দু-এক পদ নূতন গয়না আরো সব সামগ্রী চাই। সাধু তো নিশ্চিন্ত হইয়া কীর্তন করিয়া বেড়ান। সেদিন অধিক বেলায় বাড়ী ফিরিয়া সাধু জিজ্ঞাসা করিলেন —আজ কোনো মহন্তের আগমন হয় নি বুঝি? সাধু-সেবা না হইলে যে গোবিন্দের সেবাই হয় না। গোবিন্দ যে সাধুদের তৃপ্তিতেই তৃপ্ত হন।

মাণিক বলে—আজ অপর কোনো সাধু তো আসেন নাই, তবে কুমারীর শ্বশুর বাড়ীর পুরোহিত আসিয়াছেন। কুমারীকে পাঠাইতে হইবে। ঘরে তো তত্ত্ব দিবার মত কোনো সামগ্রী নাই। এখন উপায় কি?

সাধু বলে—তোমার এখনো বিশ্বাস হয় নাই? কে কাহাকে কি দেয় বল তো? দেওয়ার মালিক কৃষ্ণ ভিন্ন আর কেহ আছে বলিয়া তো আমি জানি না।

মাণিক বলে—তোমার সব কথাতেই ঐ এক কথা, আমি সংসারী লোক অত বুঝি না। এখন কি ভাবে কি হয় তাহা বল।

সাধু বলে—পুরোহিত মহাশয়কে দুই দিন অপেক্ষা করিতে বল। কৃষ্ণ যাহা ইচ্ছা করেন সকলই পাওয়া যাইবে।

কয়েকদিন কাটিয়া গেল। পুরোহিত ব্যস্ত হইয়াছেন। আব দেরী করা যায় না। মাণিক সাধুকে বলে—কোথায় তোমার কৃষ্ণ তো এখনো আসিলেন না। তুমিও অন্য চেষ্টা করিলে না। পুরোহিতকে যে আর বসাইয়া রাখা যায় না। তত্ত্বজ্ঞানে আর জাত রক্ষা হয় না।

সাধু বলে—কৃষ্ণ আসেন। আমি যখন তাঁহার নাম করিতে থাকি তিনি আসেন। তিনি বলেন—বল নরসী তোমার কী চাই? আমি বলিতে পারি না। মনে সঙ্কোচ হয়। কন্যার জন্য সামগ্রী তাঁহার কাছে চাহিয়া লইব? যাহা হউক তোমরা যখন নাছোড়বান্দা ভাবে লাগিয়াছ, আমি তাঁহাকে বলিব।

সন্ধ্যার আরতি হইয়া গেল। আজ আর কেহ নাই। একা নরসী। মন্দিরের কবাট বন্ধ করিয়া করতাল লইয়া ভজন করিতে বসিয়াছে। সে গান করে—

সন্তো হমে বে বেবারিয়া শ্রীরাম নামনা।
বেপারী আবে ছে বধা গাম গামনা॥
হমারু বসান্নু সাধু সউকো নে ভাবে।
অঢারে বরণ জেনে হোরবানে আবে॥

হে সন্ত, আমি রাম নামের ব্যবসায়ী। আমার এখানে সকল গ্রামের ব্যাপারী আগমন করে। আমার মাল সকলের কাছেই ভাল লাগে। আঠার বর্ণের ছত্রিশ জাতির লোক উহা লইতে আসে। দুর্ভিক্ষের সময় আমার মালের অভাব হয় না। আমার মালের জন্য আয় বৃদ্ধি কর দিতে হয় না। চোর আমার মাল চুরি করিতে পারে না। এক লক্ষের কম হইলে তো উহা আমি হিসাবের মধ্যেই ধরি না।

মূলধন আমার অগণিত। নিতে হয় তো লইয়া যাও। দামী জিনিষ কস্তুরী অতি অল্প মূল্যে বিক্রয় হইতেছে। আমার ধন 'রাম নাম'।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ। চুপি চুপি সাধু যেন কাহার সঙ্গে কথা বলিতেছে। মন্দিরের ভিতর সাধু কি করে দেখিবার জন্য পুরোহিত অতি সন্তর্পণে আসিয়া দরজার ফাঁকে দৃষ্টি দিয়া দাঁড়াইয়াছেন। একি বিগ্রহ যে কথা বলিতেছে। শুধু কথা বলা নয়—কতগুলি বহুমূল্য অলঙ্কার নিজের অঙ্গ হইতে খুলিয়া দিতেছেন। দামী বস্ত্র জামা মন্দিরের মধ্যে যে কিছুরই অভাব নাই। চারিদিকে বন্ধ মন্দিরের ভিতরে এইগুলি কেমন করিয়া আসিল। পুরোহিত যাহা দেখিলেন—তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন—।

পরদিন প্রাতঃকালে পুরোহিত কুমারীকে লইয়া চলিয়া গেলেন। তাহার সঙ্গে ভগবানের প্রসাদি সামগ্রী। পুরোহিত নরসীর ভক্তিভাব দর্শনে নূতন মানুষ।

নিত্য সাধু সেবা, উৎসব, কৃষ্ণলীলা গান, দরিদ্র-সেবা করিয়া অতি অল্প দিনেই নরসী বহু অর্থ ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। এখন অর্থের অভাব বোধ হইতেছে। এদিকে পুত্র শ্যামল বড় হইয়াছে। মাণিক বলে—শ্যামলকে বিবাহ দিতে পারিলে আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারি। গরীবের ঘরে কে কন্যা দান করিবে তাহাই ভাবনা।

সাধু বলেন—সে জন্য তুমি ভাবিও না। পুত্র কন্যা সংসার সবই ভগবানের। তাঁহার ইচ্ছা যখন হইবে সকলই আপনা আপনি হইয়া যাইবে। আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না। ঘোড়া বিক্রয় করিয়া ফেলিলে তাহার রক্ষার ভার ক্রেতার উপরেই পড়ে। আমি কৃষ্ণ পদে বিক্রীত।

মদন মেহতা প্রসিদ্ধ লোক। গুজরাটে বড় নগরে তাঁহার খুব বড় কারবার। প্রসিদ্ধ ধনী মেহতার কন্যা সুরসেনা বড় হইয়াছে। সৎপাত্রের

খোঁজে মেহতা নানাস্থানে লোক পাঠাইয়াছেন। ঘর পছন্দ হইলে বর হয় না, বর হইলে ঘর হয় না। জুনাগড়ে লোক আসিয়াছে। নাগর ব্রাহ্মণদের ঘরে যোগ্য পাত্রের অন্বেষণ চলিয়াছে। এখানে এক চাপে বহু ব্রাহ্মণের বাস। মদন মেহতার সহপাঠিবন্ধু সারঙ্গধর এই গ্রামে বাস করেন। মদন কুলপুরোহিতকে সম্বন্ধ দেখিবার জন্য পত্র দিয়া ইহার নিকট পাঠাইলেন। সারঙ্গধর পুরোহিত দীক্ষিতকে ধনী নাগর ব্রাহ্মণের ঘরে যে সকল যোগ্য পাত্র ছিল দেখাইলেন। দীক্ষিতের পছন্দ হয় না। তিনি ভাবেন—সারঙ্গধর নিজেদের আত্মীয়স্বজনের ছেলে কয়টি দেখাইল। হয় তো এই গ্রামে আরো ভাল ছেলে আছে। সারঙ্গধর ক'দিন ধরিয়া পুরোহিতের সহিত এ বাড়ী ও বাড়ী করিয়া বিরক্ত হইতেছিলেন। তিনি ভাবেন—এতগুলি ছেলে দেখাইলাম, কাহাকেও পছন্দ হয় না। কোথা হইতে মেহতার কন্যার জন্য নূতন করিয়া বর গড়িয়া আনে দেখাই যাক্।

দীক্ষিত জিজ্ঞাসা করেন—তবে আর দেরী করিয়া লাভ কি? পছন্দমত পাত্র মিলিল না। যদি আর কোনো পাত্র থাকে বলুন, দেখিয়া বাড়ী যাই।

সারঙ্গধর মনে মনে বিরক্ত হইয়াছেন। তিনি বলিলেন—মেহতার কন্যার উপযুক্ত বর সত্যই তো পাওয়া গেল না। তবে একটি পাত্রের খোঁজ দিতে পারি, আপনি যাওয়ার সময় দেখিয়া যাইবেন। ঐ যে গ্রামের শেষ প্রান্তে মন্দির দেখা যাইতেছে। ঐ বাড়ী নরসিংহরাম মেহতার। উনি খুব বড় গৃহস্থ। তাহার একমাত্র গুণবান্ পুত্র শ্যামলদাস। পছন্দ হইলে এই সম্বন্ধ হইতে পারে।

দীক্ষিত সারঙ্গধরের গৃহ হইতে বিদায় হইয়া বাহির হইলেন। সেদিন নরসীর মন্দিরে খুব উৎসব চলিয়াছে। নরসী কীর্তনে বিভোর। বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া দীক্ষিত বড়ই আনন্দিত। তিনি মনে ভাবেন—সারা

জুনাগড়ে কোনো বাড়ীতে এরূপ সাধু-সেবা, ঠাকুর-সেবা দেখি নাই। এ বাড়ী আসিয়া প্রাণ জুড়াইল। এখানে সম্বন্ধ হইলে মদনের মেয়ের সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

উৎসবের বাড়ীতে যিনি আসিতেছেন—আদৃত হইতেছেন। দীক্ষিত মণ্ডলীতে বসিলেন। প্রসাদি মালা দেওয়া হইতেছে। মধ্যাহ্ন সময়ে কীর্তন শেষ হইল। প্রসাদ গ্রহণের জন্য সকলেই বসিলেন। কত বিচিত্র ব্যঞ্জন, মিষ্টান্ন, উপকরণ। সাধুগণ ভগবানের জয় দিয়া প্রসাদ ভোজন করিতে লাগিলেন। দীক্ষিতের বড় ভাল লাগিল।

আগন্তুক সাধুগণ চলিয়া গিয়াছেন। দীক্ষিত নরসিংহরাম মেহতার সহিত কথা আরম্ভ করিলেন। তিনি বলেন—মহাশয়, এখানে বহু ব্রাহ্মণের ঘর দেখিলাম। কোথাও এরূপ শান্তি পাই নাই। বড় নগরের মদন মেহতার কন্যার জন্য পাত্র খুঁজিতে আসিয়াছিলাম। একটি ছেলেও সবদিক্ দিয়া আমার মনের মত মিলিল না। আপনার পুত্র শ্যামলকে তো দেখিলাম। ওকে দেখিয়া আমার খুব পছন্দ হইয়াছে। আপনি যদি অনুমতি দেন আমি সম্বন্ধের কথা উত্থাপন করিতে পারি। আর আমি বলিলে সম্বন্ধ হইবেই।

নরসী বলেন—তাঁহারা ধনী লোক। আমাদের ঘরে তাঁহার কন্যা দিবেন কেন? আমার যা কিছু সম্বল ঐ মন্দিরের ঠাকুর।

পুরোহিত বলিলেন—সে জন্য আপনি ভাবিবেন না। আমি সব ঠিক করিয়া লইব। লৌকিক ধন কার কতদিন থাকে? আপনার যে প্রেমধন উহাই আপনাকে মস্তবড় ধনী করিয়াছে। মদন মেহতা কন্যার বিবাহে বিশপঁচিশ হাজার টাকা যৌতুক দিবে। তাহার লক্ষ লক্ষ টাকা। আমি তাহাকে বুঝাইয়া বলিব। এমন বর, এমন শান্তিপূর্ণ ঘর সহসা পাওয়া দুর্লভ।

পাকাকথা হইয়া গিয়াছে। সকলেই বলে—কি আশ্চর্য! এই জুনাগড়ে কত কত বড ঘরের বিদ্বান বিচক্ষণ ছেলে দেখানো হইল, কাহাকেও পছন্দ হইল না। শেষটা ঐ দরিদ্র স্বজন-পরিত্যক্ত গ্রামপ্রান্তবাসী নরসীর ছেলের সহিত প্রসিদ্ধ বড়লোক মদন মেহ্তার মেয়ের বিবাহ! ইহাকেই বলে ভবিতব্য।

পাকা সমাজপতিগণ বিবাহ-ভঙ্গের ব্যবস্থায় লাগিয়া গেলেন। তাহারা মদন মেহ্তাকে গোপনে পত্র দিলেন। নরসী স্বজন-পরিত্যক্ত। সে দরিদ্র। সমাজে তাহার স্থান নাই। তাহার সহিত আত্মীয়তা স্থায়ী হওয়ার আশা করা নিরর্থক।

মদন রায় বড়ই চিন্তায় পড়িয়াছেন। বাগ্‌দত্তা কন্যা। এখন কি করিয়া এই বিবাহ বন্ধ করা যায়? তিনি এক পত্র লিখিলেন। পত্র লইয়া লোক জুনাগডে আসিল। নরসীকে পত্র দিল। নরসী পত্রখানা পড়িয়া হাসিয়া বলিলেন—একমাত্র পুত্র শ্যামল। তাহার বিবাহে উপযুক্ত বরযাত্রীই যাইবে। আর মদন মেহ্তার কন্যার উপযুক্ত বস্ত্র অলঙ্কারও দেওয়া হইবে।

বিবাহের দিন নিকটবর্ত্তী। বরযাত্রীর মধ্যে দুই চারিজন সাধু আর পুরোহিত ঠাকুর। সকলের অঙ্গে মালা, তিলক। করতাল হাতে করিয়া নরসী বাহির হইতেছেন। ছেলে বিবাহ করাইতে যান! মাণিক আসিয়া বলে—তুমি এ কি পাগলের মত সব আরম্ভ করিয়াছ। তোমার আত্মীয়স্বজন সকলকে ডাক, বাজ্‌না সঙ্গে লও। এ ভাবে গেলে কি মদন রায় তাঁহার কন্যাকে দান করিতে স্বীকৃত হইবেন? তিনি পূর্ব্বেই জানাইয়াছেন—তাঁহার মর্য্যাদার যোগ্য বরযাত্রী ও বেশভূষা চাই। তাহা না হইলে তিনি এই বিবাহে সম্মত নন। সমানে সমানে কাজ না হইলে সুখের হয় না।

নরসী বলেন—আরে তুমি ঠাকুর ঘরে যাও না। প্রভুর নিকট শ্যামলের জন্য প্রার্থনা কর না। তাঁহার ইচ্ছা হইলে সকলই সমাধান হইবে।

গ্রাম হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইলে দেখা গেল—বিরাট্ এক বরযাত্রী দল। মস্তবড় মাঠের উপর তাঁবু ফেলিয়াছে। সঙ্গে হাতী, ঘোড়া, রথ, পাল্কী, বাদ্যদল, দাস, দাসী, সে এক বিরাট্ ব্যাপার। নরসী গাছের তলায় বসিয়া করতাল বাজাইয়া নাম গান করেন। শ্যামলকে একটি তাঁবুর মধ্যে নিয়া দাস দাসীগণ বরবেশে সাজাইতে লাগিল। সে কি সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ! এদেশে ঐরূপ দামী সামগ্রী একটিও পাওয়া যায় না।

বরযাত্রী মহাসমারোহে চলিয়াছে। বিবাহের নির্দিষ্ট তারিখের পূর্বেই তাহারা বড নগরের ময়দানে তাঁবু ফেলিয়াছে। হাতী, ঘোড়া, রথ, পাল্কীর বহর দেখিয়া মদন রায় স্তম্ভিত। কি আশ্চর্য, যাহার এরূপ ঐশ্বর্য তাহাকে ছোট দরিদ্র বলিয়া আমার কাছে যাহারা গোপন-পত্র দিয়াছে তাহারা কিরূপ নীচাশয়। বাড়ীতে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব আসিয়াছেন। অধিবাসের বাজ্না বাজিয়া উঠিল। মদন রায় ভাবেন এত বৃহৎ বরযাত্রী দলের সমাধান করা রাজারও সাধ্যাতীত। আমি কি ভাবে কি করিব? যাই একবার সেই ভাগ্যবান মেহতা মহোদয়কে দেখিয়া আসি। তিনি আত্মীয়গণের সঙ্গে চলিলেন। অতি সুন্দর তাঁবু। ভিতরে বিচিত্র আসন। মণিময় পাত্র চতুর্দিকে ছড়ানো রহিয়াছে। মদন রায় মনে করিলেন—এই তাঁবুতেই নরসিংহ আছেন। তিনি কাছে আসিতে তাঁবু হইতে মণিরত্ন অলঙ্কারে সুসজ্জিত উজ্জ্বল শ্যামলবর্ণ এক পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন—আসুন মেহতাজী, আপনাকে নরসিংহজীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিই। আমি তাঁহার এক সেবক। তিনি অন্যত্র আছেন।

নরসী এক গাছের তলায় ভাবমগ্ন হইয়া আছেন। মদন রায়কে সেখানে আনা হইল। নরসী ভগবানের অঙ্গ গন্ধে চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। করজোড়ে ভগবানের পাদপদ্মে নমস্কার করিলেন। মদন রায় স্তম্ভিত। একি স্বপ্ন অথবা সত্য! সম্মুখে মণিভূষণে ভূষিত ভগবান্ শ্যামলকান্তি কৃষ্ণ, আর তাঁহার চরণে প্রণত নরসী!

যথা সময়ে শুভ-বিবাহ হইয়া গেল। মদন রায়ের ধনের অভিমান দূর হইয়া গিয়াছে। সাধু সঙ্গ লাভে সে ধন্য হইয়াছে। সে বুঝিয়াছে, ভগবানের করুণার কাছে ঐহিক সম্পত্তি তুচ্ছ।

সংসারীর সুখ জলের বুদ্বুদ। বিবাহের আনন্দ কলরব শান্ত হইতে না হইতেই মৃত্যুর ডাক আসিয়া উপস্থিত। কে জানে সুরসেনার অদৃষ্টে অকাল বৈধব্য লেখা ছিল? কে জানে সুস্থ সবল শ্যামলদাস হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হইবে? কন্যার শোকে মদনরায় পাগলের মত হইয়া গিয়াছে। সে ছুটিয়া গেল পুত্র শোকাতুর নরসিংহ রায়ের নিকট। ভজনের বল তাহাকে শোক সহ্য করিবার সামর্থ্য দিয়াছে। মন্দিরের মধ্যে একাকী নরসী বিগ্রহের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন। চুপি চুপি তাহার সহিত কি কথা বলেন। কখনো করতাল বাজাইয়া গান ধরেন—

ভলুঁ থয়ুঁ ভাঙ্গী জঞ্জাল
সুখে ভজীশুঁ শ্রীগোপাল।

বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে ভালই হইয়াছে। মনের আনন্দে এখন একান্তে গোপালের আরাধনা করিব।

কয়েক মাস পরের কথা। বংশীধর আসিয়া বলিল—আগামী কল্য বাবার তিথিশ্রাদ্ধ। আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব সকলেরই নিমন্ত্রণ। তুমি খুব সকালবেলা কিন্তু বউমাকে লইয়া যাইবে। একদিন তোমার বৈরাগীর আখড়ায় না গেলেও চলিবে। বুঝিলে তো?

বৈরাগীর আখ্‌ড়ার উপর কটাক্ষে নরসীর প্রাণে ব্যথা লাগিল। সত্যকার বৈরাগী যে ভগবানের অতি প্রিয়। তাঁহারা পদধূলিদ্বারা জগৎ পবিত্র করিতে সমর্থ। তিনি বলিলেন—আমি সাধু-সেবা ছাড়িয়া কুটুম্বের ভোজে যাইতে পারিব না। আমার স্ত্রী ঠাকুর সেবা করিয়া সাধুদের সেবা করাইয়া যদি সময় পায় যাইবে।

বংশীধর কথা শুনিয়া চটিয়া গিয়াছে। সে বলিল—ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষুক খাওয়ানো—তাহার অহঙ্কার দেখ। ইহার নাম সাধু-সেবা। পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করিবার ক্ষমতা নাই—সাধু-সেবা করান।

নরসী বিনীত ভাবে বলেন—দাদা, তোমার আদেশ হইলে আমিও পিতৃশ্রাদ্ধ করিব। বংশীধর চলিয়া গেল। নরসীও মন্দিরে যাইয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন।

বৈষ্ণব জননে বিষয়থী তলবুঁ, হলবুঁ মাহীথী মন রে।
ইন্দ্রিয় কোঈ অপবাদ করে নহী, তেনে কহিয়ে বৈষ্ণব জন রে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহেতাঁ কণ্ঠজ সূকে, তো যে ন মুকে নিজনাম রে।
শ্বাসোশ্বাসে সমরে শ্রীহরি, মন ন ব্যাপে কাম রে।

বিষয় সম্বন্ধ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া বৈষ্ণব সর্বদা মনটিকে নির্মল রাখিবে। যাহার ইন্দ্রিয় অন্যায় ব্যবহার করে না, তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহিয়া কণ্ঠ শুষ্ক হইলেও যে নামকে পরিত্যাগ করে না—প্রতি শ্বাস প্রশ্বাসে শ্রীহরির স্মরণ করে, যাহার মন কামাসক্ত নয়, তাহাকে বৈষ্ণব জানিবে।

অন্তর বৃত্তি অখণ্ড রাখে হরিনুঁ ধরে কৃষ্ণনুঁ ধ্যান রে।
ব্রজবাসিনী লীলা উপাসে, বীজুঁ সুণে নহিঁ কান রে॥

যাহার মন অখণ্ডরূপে অন্তর্বৃত্তি হইয়া কৃষ্ণ ধ্যান করে, যে শ্যাম-সুন্দরের ব্রজলীলা উপাসনা করে—তাহাকেই বৈষ্ণব বলিয়া জানিবে।

সাধু মন্দিরের বাহিরে আসিলেন। মাণিক বলিল—বাজারে যাইতে হইবে। ঘরে যে ঠাকুর সেবার সামগ্রী কিছু চাই। সাধু বলেন—আমার কাছে কিছু নাই। কি করি? মাণিক তাহার কানের একটি ফুল খুলিয়া দিল। দেখ ইহাতে কতটুকু সোণা আছে। আমার আর গয়নার প্রয়োজন কি? ঠাকুর সেবা তো চলুক।

নরসী বাহির হইয়া গেল। রাস্তায় যাইতে যাহার সঙ্গে দেখা হয় সকলেই বলে, সাধু তোমার বাড়ীতে নাকি পিতার তিথিশ্রাদ্ধে খুব সমারোহ হইবে? সাধু বুঝিলেন, বংশীধর রাগ করিয়া এরূপ কথা রটাইয়াছে। সাধু বিনীত ভাবে উত্তর দিয়া চলিয়া যান। ভাই, পিতৃকার্য করা তো কর্তব্যই। দু' চারজন জ্ঞাতি ভোজন হইবে। তাহারা বলে, আপনার দাদার ওখানে তো সপরিবারে সকল ব্রাহ্মণেরই নিমন্ত্রণ। অনেকেই ওখানে যাইবেন। আপনি আর দু' চারজনের নিমন্ত্রণ করেন কেন? ঠাকুরের প্রসাদ সকলেই আশা করে। আপনার উচিত সকলকেই সমান ভাবে নিমন্ত্রণ করা।

ধনীলোক দরিদ্রকে লইয়া অনেক সময় খেলা করে। মাতব্বর নরসীকে নাচাইবার জন্য পরামর্শ দিলেন—তাই হউক। পুরোহিত ডাকিয়া সমাজের সকলকেই নিমন্ত্রণ দেওয়া হউক। লোক আর কত হইবে, সাতশ'র বেশী নয়।

বাজার লইয়া সাধু ঘরে ফিরিয়াছেন। মাণিক ঘৃত, আটা, চিনি এবং অন্যান্য সামগ্রী তুলিয়া রাখিতেছে। নরসী বলিলেন—আগামী কল্য সমাজের লোক এখানে প্রসাদ পাইবে। প্রায় সাতশ' লোক হইবে। মাণিক অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। সে বলে, এই বাজার! নিত্যকার বাজার দিয়া তুমি নিমন্ত্রণের লোক খাওয়াইবে? সাধু বলিলেন—তুমি ব্যস্ত হও কেন? কৃষ্ণ যা হয় ব্যবস্থা করিবেন। মাণিক স্তব্ধ হইয়া রহিল।

পুরোহিত বলিয়া পাঠাইয়াছেন—আসিতে পারিবেন না। বংশী-ধরের বাড়ীতে কাজ। দরিদ্র নরসীর মত যজমান থাকিলেই কি আর গেলেই কি? নরসী—চিন্তিত হইয়া বাহির হইলেন। পথে এক ব্রাহ্মণের সহিত দেখা। নরসী বলেন—আপনি অনুগ্রহ করিয়া আগামী কল্য আমাকে তিথিশ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়াইবেন? ব্রাহ্মণ বলে—আমি মূর্খ ক্রিয়া কাণ্ডের কিছুই জানি না। তুমি সাধু। আমি তোমাকে বঞ্চনা করিতে পারিব না। সাধু বলেন—আপনিই সর্বাপেক্ষা যোগ্য। যিনি অপরকে প্রবঞ্চনা করেন না—তিনিই সর্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন। আমি আপনাকেই পৌরোহিত্যে বরণ করিলাম।

প্রাতঃকাল হইতেই মাণিক আসিয়া বলিল,—বাজার তো করিতে হইবে। এতগুলো লোকের আয়োজন কি করিয়া যে হইবে ভাবিয়া পাই না। নরসী বলেন—ঘৃতের ভাণ্ডটা দাও। দেখি, কোনো মহাজনের নিকট যদি ধারে পাওয়া যায়। একটি পাত্র লইয়া নরসী বাহির হইয়া গেলেন।

এক দোকানী ডাকিল—সাধুজী, কোন্‌দিকে যাইতেছেন? সাধু বলেন—ভাই, ঘৃত আছে? দোকানী বলিল—মূল্য নগদ দিবেন তো? সাধু বলেন—দু'চার দিন পরে দিব। দোকানী বলিল—ভাল ঘৃত নাই। আপনি অপর দোকানে দেখুন। সাধু অগ্রসর হইলেন।

মস্তবড় ব্যাপারী রামদাস। সাধু তাহার দোকানের নিকট দিয়া যাইতেছেন দেখিয়া সে ডাকিল। সাধুজী, একবার এদিকে পদার্পণ করিবেন কি? সাধু রামদাসের দোকানে ঢুকিলেন। রামদাস বলে—কি মনে করিয়া বাজারে আসিয়াছেন। সাধু সব কথা বলেন। রামদাস সদাশয় ব্যক্তি। সে বলে—আপনি চিন্তা করিবেন না। যত আটা, ঘৃত, প্রয়োজন, আমি আপনার বাড়ীতে আমার লোক দিয়া পাঠাইয়া

দিতেছি। আপনি একটু ভজন গান শুনাইবেন তো? বসুন, করতাল সঙ্গে আছে? সাধু যেন হাতে চাঁদ ধরিলেন। তিনি বসিয়া পড়িলেন। ভজন সুরু হইল। একে একে বহুলোক জড়ো হইতে লাগিল। সকলেই সাধুর সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে গান ধরিল। গৃহের কথা ভুল হইল।

রামদাস তাহার লোক দিয়া সাধুর বাড়ীতে আটা, ঘৃত এবং অন্যান্য সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছে। সাধু কীর্তনে মাতিয়া আছেন। এদিকে শ্রাদ্ধকাল অতীত হইয়া যায়। নরসীর দেরী দেখিয়া মাণিক ভাবিতেছে।

কৃষ্ণ দেখিলেন—নরসী কীর্তন করিতেছেন। গৃহের কথা সে ভুলিয়া গিয়াছে। এখন আমি না গেলে যে তাহার পিতৃশ্রাদ্ধ পণ্ড হয়। তিনি নরসীর মূর্তিতে বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুরোহিতকে বলিলেন, আপনি আমাকে মন্ত্র পড়াইবার যোগাড় করিয়া প্রস্তুত হউন। পুরোহিত কার্য আরম্ভ করিলেন।

দুপুর বেলা আত্মীয়স্বজন আসিতে লাগিল। তাহাদের ভোজনের সব সামগ্রী প্রস্তুত। ভোজন করিয়া তাহাদের পরম তৃপ্তি। সকলেই বলে নরসী, তোমার এই কার্যে আমরা বড়ই সুখী হইয়াছি। খুব যোগাড় করিয়াছ। অনেকদিন এরূপ তৃপ্তির সহিত ভোজন হয় নাই।

সন্ধ্যার সময় কীর্তন সমাপ্ত হইল। ঘৃতের ভাণ্ড হাতে লইয়া নরসী ঘরে ফিরিতেছেন। নরসী মাণিককে বলেন—তুমি কি করিয়া কি করিলে? লোকজন খাওয়া হইয়া গিয়াছে—দেখিতেছি। আমি আজ বড় অন্যায় করিয়াছি। কীর্তন করিতে বসিয়া কাজের কথা সব ভুল হইয়া গেল। মাণিক বলে—সে কি যাহারা আটা ঘি দিয়া গেল, তাহারা যে বলিল—তুমিই ঐ সকল পাঠাইয়া দিয়াছ। এই না তুমি শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়িয়া কাজ সারিয়া বাহিরে গেলে? সাধু বলেন—মাণিক, আমি তো বাড়ীতে এই মাত্র ফিরিতেছি। শ্রাদ্ধ আমি করিলাম, ইহার অর্থ

বুঝিলাম না। মাণিক বলে—তুমি নয় তো কে? সাধু বলে—বুঝিলাম সেই পরম দয়াল—যাঁহার নাম কীর্তন করিয়াছি—তিনিই আমার মূর্তি ধরিয়া আমার পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া গেলেন। ধন্য মাণিক, তুমি তাঁহাকে দেখিয়াছ। আহা, তাঁহাকে দেখিয়াও চিনিতে পারিলে না?

প্রতি একাদশীতে রাত্রি জাগরণ করিয়া কীর্তন করা নরসীর নিয়ম। ভোজন ত্যাগ, সংযম এবং হরিনাম কীর্তন উপবাসের অঙ্গ। জুনাগড়ের নিকটবর্তী দামোদর কুণ্ড প্রসিদ্ধ। নরসী দামোদর কুণ্ডে স্নান করিয়া বাগানে ফুল তুলিতেছিলেন। একটি লোক পশ্চাৎ হইতে ডাকিল,—সাধুজী, আমার একটি নিবেদন। আপনি অনুগ্রহ করিয়া যদি আজ আমাদের বাড়ীতে হরিবাসর করেন—আমরা কৃতার্থ হই। সাধু বলেন বেশ, আমি সন্ধ্যার পর তোমার ওখানে যাইব।

সন্ধ্যার পর কীর্তন সুরু হইল। বহু অস্পৃশ্য জাতির লোক আসিয়া কীর্তনে নাচিতেছে, কাঁদিতেছে আর সাধুর পায়ে লুটাইতেছে। এক ব্রাহ্মণ এতগুলি অস্পৃশ্যের মধ্যে, অনেকের চক্ষে ইহা ভাল ঠেকিল না। পর দিন সকাল হইতেই এই কথা লইয়া সমাজে খুব আলোচনা চলিল। সমাজপতিরা স্থির করিল—নরসীকে সমাজচ্যুত করিয়া রাখিতে হইবে। দু'দিন বাদে সমাজের একটি নিমন্ত্রণ আছে। সেখানে নরসীর যাহাতে আমন্ত্রণ না হয়, তাহার ব্যবস্থা হইয়া গেল।

নিমন্ত্রণের বাড়ী। ব্রাহ্মণগণ আসিয়া আসনে বসিয়াছেন। পরিবেশন হইয়া গিয়াছে। ভোজনও আরম্ভ হইয়াছে। হঠাৎ পাশের দিকে দৃষ্টি পড়িল। অ্যাঁ, একি একটা অস্পৃশ্যলোক যে পাশে বসিয়া আহার করিতেছে। ব্রাহ্মণ পাত্র ত্যাগ করিয়া উঠিয়া পড়িলেন। একজন নয়, প্রত্যেক ব্রাহ্মণ এইরূপ অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া পাত্র ত্যাগ করিলেন। ব্রাহ্মণ-ভোজন পণ্ড হইয়া গেল। সমাজপতিরা কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া

পবিত্র হইবেন, তাহাই আলোচনা করিতে লাগিলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন—প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা যেন হইল, কিন্তু এই বিপদ্ কেন হইল, সে সম্বন্ধে কিছু ভাবিয়া দেখিলেন কি? অপর কেহ বলিয়া ফেলিলেন, যে যাহাই বলুক না কেন, আমার মনে হয়, সাধু নরসীকে জাতিচ্যুত করাই ইহার মূল কারণ। অনন্ত রায় নরসীর মামা। তিনি বলেন—কথাটা মিথ্যা নয়। আমারও মনে হয়, নরসীকে অপমান করার ফলেই এরূপ হইয়াছে। তাহাকে ডাকিয়া অপরাধ ক্ষমা না করাইলে অপর কোনো প্রায়শ্চিত্তে শুদ্ধি হইবে না, নাগর ব্রাহ্মণ সমাজে অনন্ত রায়কে সকলেই সম্মান করে। তাহার কথায় অনেকেরই বিশ্বাস হইল। তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল তাই তো, নরসী সাধু। সে কীর্ত্তন করিতে গিয়াছে। সে তো অস্পৃশ্যদের বাড়ীতে সামাজিক খাওয়া দাওয়া করিতে যায় নাই? তবে আর তাহাকে জাতিচ্যুত করা কেন? চলুন, আমরা সকলে যাইয়া তাহার নিকট একথা বলিয়া আসি। আহা, শুনিলাম তাহার স্ত্রীবিয়োগ হইয়াছে।

সমাজপতিরা সমবেদনা প্রকাশ করিতে আসিলেন। নরসীর অন্তরের ভাব রূপান্তরিত হয় নাই। তাহাকে জাতিচ্যুত করা হইয়াছিল। সে খবরও রাখে না। অনন্তরায় প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ আসিয়া সাধুর সমীপে ক্ষমা চাহিতেছেন। সাধু বলেন -সে কি আমি অতি অধম। আপনারা কি জন্য কাহার নিকট ক্ষমা চাহিতে আসিয়াছেন? আমরা সকলেই ভগবানের নিকট অগণিত অপরাধে অপরাধী। আসুন, আমরা তাঁহার নিকট অপরাধ ভঞ্জনের জন্য সমবেত ভাবে প্রার্থনা করি। মিলিত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন হইতে লাগিল। যাহারা কোনোদিন হরিনাম উচ্চারণ করেন না, তাহারাও লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কহেতাং উঠো রে প্রাণী।
কৃষ্ণজী না নাম বিনা জে বোলো তো মিথ্যা রে বাণী॥

কৃষ্ণজী এ বাস্য় রুড়ু, গোকুলীউ রে গাম।
কৃষ্ণজী এ পূরী, মারা মনডা কেরী হাম॥

কৃষ্ণজী এ অহল্যা তারী, গুণকা ওধারী।
কৃষ্ণজী না নাম উপর, জাউ বলিহারী॥

কৃষ্ণজী মাতা, কৃষ্ণজী পিতা, কৃষ্ণ সহোদর ভাঈ।
অন্তকালে জাবু একলড়া, সাথে শ্রীকৃষ্ণজী সগাঈ॥

কৃষ্ণজী কৃষ্ণজী কহেতাং, কৃষ্ণ সরাখা থাশো।
ভণে রে নরসৈঁয়ো সেহেজে, তমে বৈকুণ্ঠে জাশো॥

হে জীব কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ধ্বনি কর। কৃষ্ণনাম ভিন্ন বাণী মিথ্যা। কৃষ্ণ গোকুলে বাস করেন। তিনি আমার আশা পূর্ণ করিয়াছেন। কৃষ্ণ অহল্যা উদ্ধার করিয়াছে, গণিকাকে ত্রাণ করিয়াছেন। কৃষ্ণনামের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। কৃষ্ণই আমার পিতা, মাতা এবং সহোদর ভাই। মৃত্যু সময়ে একেলা হইবে। তখন কৃষ্ণভিন্ন আর সঙ্গী নাই। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে তুমি কৃষ্ণের গুণে গুণবান্ হইবে। নরসী বলে, অনায়াসে বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি হইবে।

সমাজপতিগণ বলিল—সাধুজী, ভজন তো হইল। এখন আপনি আমাদের ব্রাহ্মণের পংক্তিতে বসিয়া ভোজন না করিলে যে আমাদের মন পরিষ্কার হয় না। নরসী বলেন—সে আর এমন কঠিন কথা কি? যে ব্রাহ্মণের মর্যাদা স্বয়ং কৃষ্ণজী প্রদর্শন করিয়াছেন, পংক্তিতে বসিয়া তাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিব, ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের কথা। পরদিন বিরাট্ ভোজের ব্যবস্থা হইল। শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দিয়া প্রসাদ

পরিবেশন করা হইল। ব্রাহ্মণগণ নরসীকে পংক্তিতে লইয়া বসিয়া আনন্দে ভোজন করিলেন। তাহাদের জাতিচ্যুতির বিভীষিকা দূর হইল।

সারঙ্গধরকে কে না জানে? নাগর ব্রাহ্মণ সমাজে তাহার কথা ঠেলিয়া কাজ করে কার সাধ্য। সে একদিন আসিয়া বলে—নরসী, তোমার গৃহশূন্য হইল। আহা, তোমার এ বয়সে বড়ই দুঃখ হইল। যা হইবার হইয়াছে। এখন তাহার সদ্গতির জন্য কিছু ব্রাহ্মণ ভোজন করানো কর্তব্য নয় কি? নরসী বলেন—ভগবানের ইচ্ছা হইলে হইবে। আমি তাঁহার হাতের যন্ত্র। তিনি যেমন চালাইবেন, তেমন চলিব। সারঙ্গধর বলে—আরে সাধু, নিজেরও ইচ্ছা বলিয়া একটা কথা আছে। তুমি ইচ্ছা করিলেই কৃষ্ণের ইচ্ছা হইবে। যা'হউক কর্তব্য বলিয়া গেলাম, এখন ভাবিয়া দেখ। নরসী ভাবিতেছিলেন—জাতির লোক খাওয়ানো হইতে সাধুদের খাওয়ানো অনেক ভাল। কিন্তু সারঙ্গধর যে ভাবে বলিলেন, তাহাতে জাতি না খাওয়াইলে একটা অশান্তির সৃষ্টি হইবে। যা হয় ভগবান্ করিবেন। আমার স্বতন্ত্র কোনো চেষ্টার প্রয়োজন নাই। আর আমি এখন অত টাকাই বা পাইতেছি কোথায়? তিনি মন্দিরে বসিয়া ভজন করিতে লাগিলেন।

রাস্তার ধারে বসিয়া কয়েকটি লোক গল্পসল্প করিতেছে। কয়েকজন বিদেশী—দ্বারকার যাত্রী। সেকালে ব্যাঙ্কের কাজ করিত আমাদের ব্যবসায়ীরা। তীর্থের পথে নানারকম উপদ্রব। যাত্রীরা কোনো মহাজনের নিকট টাকা গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থে হুণ্ডী লইয়া যাইত। সেখানে সেই মহাজনের বিশ্বস্ত কর্মচারীর নিকট হইতে টাকা বুঝিয়া লইত। দ্বারকার যাত্রীরা এরূপ কোনো প্রসিদ্ধ মহাজনের সন্ধান করে। লোকগুলিকে রহস্য করিয়া গ্রামবাসী কয়েকজন বলে—বাপু, এখানে কোনো মহাজন নাই। ঐ দূরে দেখা যাইতেছে বাড়ী। ওখানে

নরসী মেহতা একজন মহাজন। তাহার কাছে সব কিছু ব্যবস্থা হইতে পারে। তীর্থযাত্রীরা সরল বিশ্বাসে সেইদিকে চলিল।

নরসীর সাধুতা দেখিয়া যাত্রীরা মুগ্ধ হইয়াছে। তাহারা বলে—মহাজন, আপনি আমাদের এই সাতশত টাকার একটি হুণ্ডী কাটিয়া দিন। দ্বারকায় যাইয়া আমাদের যেন কোনো বেগ পাইতে না হয়। গ্রামের দশজন লোকে বলিল, আপনার শরণাপন্ন হইলেই আমাদের সব কিছু ব্যবস্থা হইয়া যাইবে।

নরসী কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া ভাবেন—ভগবান্ এ তোমার কি লীলা! আমি ভাবিতেছিলাম লোক খাওয়ানোর টাকা কোথায় পাই। টাকা তো তুমি পাঠাইয়াছ। কিন্তু এই যাত্রীদের কি বলিয়া কার নামে হুণ্ডী দেই? তুমি ভিন্ন আমার যে আর কোনো 'মহাজন' নাই। প্রভু, আমি তোমার ভরসায় হুণ্ডী দিয়া টাকা লইতেছি। ইহার পর যাহা কিছু সমাধান করিতে হয়, তুমি করিবে। নরসী টাকা লইল। হুণ্ডী লেখা হইল।

"সিদ্ধিরস্তু শ্রীপরম শোভাসাগর অভিন্ন হৃদয় পরমবান্ধব আমার জীবনাধার শ্রীশ্যামচন্দ্র রায় বসুদেব রায় গদী। সপ্রেম প্রণাম পূর্বক নিবেদন—আমি এখানে পত্রবাহক যাত্রীর নিকট হইতে নগদ সাতশত রৌপ্যমুদ্রা পাইয়া এই হুণ্ডী লিখিয়া দিলাম। আপনি এই হুণ্ডী লিখিত টাকা হুণ্ডী পাওয়া মাত্র যাত্রীকে বুঝাইয়া দিলে কৃতার্থ হইব।

আপনার বিনীত সেবক
নরসিংহ মেহতা
(জুনাগড়)

হুণ্ডী লইয়া যাত্রীগণ চলিয়া গেল। নরসী ভগবানের সমীপে প্রার্থনা করেন—প্রভু, আমি তোমার উপর নির্ভর করিয়াই এই খত লিখিয়া দিয়াছি। এইবার তোমার কৃপা কতখানি তাহা বুঝা যাইবে।

বিদেশী যাত্রীর সমীপে আমাকে মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক বলিয়া প্রমাণিত করিও না। বিশ্বের সকল সম্পদের মূল মহাজন তুমি। তোমার নামে পত্র দিয়াছি। তুমিই সমাধান করিবে।

টাকাগুলি হাতে পাইয়া নরসী প্রচুর পরিমাণে জ্ঞাতিভোজের আয়োজন করিল। এদিকে যাত্রীরা দ্বারকায় আসিয়াছে। বহুলোক দ্বারকা নাথের দর্শনের জন্য পর্ব উপলক্ষে সমাগত। টাকাগুলি পাইবার জন্য হুণ্ডী লইয়া যাত্রীরা জিজ্ঞাসা করে বড় বড় ব্যবসায়ীকে--মহাশয়, শ্যাম রায় বসুদেব রায়ের গদী কোন্ দিকে? এই নামের কোনো ব্যবসায়ী মহাজন দ্বারকায় আছে বলিয়া তাহারা জানে না। যাত্রীরা খোঁজ না পাইয়া ক্রমশঃ চঞ্চল হইতেছে। তবে আমরা কি প্রবঞ্চিত হইলাম! তাহা হইতে পারে না। যিনি হুণ্ডী দিয়াছেন, তাহাকে দেখিয়া প্রবঞ্চক বলিয়া মনে হয় না। দেখা যাক্, হয় তো বহুলোক সমাগম হইয়াছে বলিয়া খোঁজ পাইতেছি না। দুইদিন এই মহাজনের খোঁজ করিতে করিতে তাহারা পরিশ্রান্ত হইয়াছেন। টাকারও একান্ত প্রয়োজন।

এইমাত্র দ্বারকানাথের সন্ধ্যারতি দেখিয়া যাত্রীরা মন্দির হইতে বাহির হইল। মন্দিরের গায়ে একখানা ক্ষুদ্র দোকান। একজন লোক কর্মচারী সহিত বসিয়া আছেন। যাত্রীরা দেখিল, তাহারা হুণ্ডীর কারবার করেন। দোকানের নিকটে আসিতেই গদীর উপর যিনি বসিয়া আছেন তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাশয় আপনারা কি জুনাগড়ের কোনো হুণ্ডী আনিয়াছেন? কে যেন আমাকে বলিল, আপনারা দু'দিন আমাদের গদীর সন্ধান করিতে পারেন নাই? যাত্রীগণ হুণ্ডীখানা বাহির করিয়া মহাজনের সম্মুখে ধরিল। মহাজন কর্মচারীকে আদেশ করেন—টাকাটা মিটাইয়া স্বাক্ষর লও। যাত্রীরা টাকা পাইয়া হুণ্ডীর পিছনে লিখিয়া দিল।

মন্দিরে বসিয়া নরসী ভজন করিতেছেন। হঠাৎ তাহার সম্মুখে একখানা কাগজ উড়িয়া পড়িল। নরসী উহা তুলিয়া লইলেন। উহা সেই শ্যাম রায় বসুদেব রায় নামে দেওয়া হুণ্ডী। উহার পশ্চাতে যাত্রীর স্বাক্ষর। টাকা বুঝিয়া পাইয়া স্বাক্ষর দিয়াছে। ভগবানের এইরূপ কৃপার পরিচয় পাইয়া নরসী আনন্দে ডুবিয়া রহিল। প্রভু তোমার সরল-স্বভাব সেবকের জন্য তুমি সব কিছুই কর। ধন্য তুমি, ধন্য আমি!

ভক্তের কন্যা কুমারী বড় সুখে নাই। সন্তান হওয়ার বয়স চলিয়া যায়, কোনো সন্তান হয় না। পরিবারের সকলেই তাহার উপর অসন্তুষ্ট। শাশুড়ী মাঝে মাঝে ছেলেকে দ্বিতীয় বার বিবাহ করাইবে বলিয়া শাসায়। কুমারী বসিয়া বসিয়া কাঁদে। শ্বশুর রঙ্গধর ভাললোক। সে-ও পারিবারিক অশান্তি দূর করিতে অসমর্থ। একমাত্র পুত্র নিঃসন্তান হইলে এই বিষয় ভোগ করিবে কে? বংশলোপ হইবে। তাহার ভাবনা বড় কম নয়। কিন্তু উপায় নাই। টোট্‌কা ঔষধ, মন্ত্র, মাদুলী, কুমারীর জন্য কিছু বাকী রহিল না। কিছুতেই ফল হইল না দেখিয়া এখন তাহাকে ভগবানের নামে রাখা হইয়াছে। ঔষধ মাদুলী বন্ধ। খুব দায়ে পড়িলেই আর্তির সহিত ভগবানে নির্ভরতা।

ভগবানের দয়ায় অসম্ভব সম্ভব হয়। কুমারীর গর্ভ লক্ষণ প্রকাশ পাইল। সকলেই আনন্দিত। সপ্তামৃত সাধ দেওয়ার সাধ তীব্র হইল। রঙ্গধর বলে—নরসিংহরামকে খবর জানাইবার প্রয়োজন নাই। সে দরিদ্র এ সংবাদ পাইলে তাহাকে বস্ত্র ও ভূষণ সংগ্রহ করিতে বেগ পাইতে হইবে। ইহাতে তাহার ভজনের ক্ষতি হইবে। শাশুড়ীও এই সম্বন্ধে একমত। আমার এক পুত্রবধূ যাহা করিতে হয় আমরা করিব। গরীব বাপকে চাপ দিয়া প্রয়োজন নাই।

কুমারী সেদিন কাঁদিতেছে। রঙ্গধর বাড়ী আসিয়া শুনিলেন, তাহার

বাপকে নিমন্ত্রণ জানানো হইবে না বলিয়া সে দুঃখিত। শ্বশুর বলেন—বউমা, তুমি দুঃখ করিও না, আমি তোমার পিত্রালয়ে খবর পাঠাইতেছি। আমাদের বাড়ীর উপযুক্ত ব্যাভার দিয়া সাধ দেওয়া কষ্টকর হইবে ভাবিয়াই আমি তাহাকে ব্যস্ত করিতে চাই না। তা তোমার যখন সে জন্য দুঃখ হইয়াছে, আমাকে লোক পাঠাইতে হইবেই।

পত্র লইয়া রঙ্গধরের লোক উপস্থিত। নরসী পত্র পড়িলেন। খুব আনন্দ সংবাদ কিন্তু তাহার মুখে কোনো চিহ্ন দেখা গেল না। তিনি গম্ভীর ভাবে লোকটিকে বিদায় দিলেন। যথা সময়ে তিনি উপস্থিত হইবেন।

সপ্তামৃতের শুভদিন সমাগত। বহু আত্মীয় রঙ্গধরের একমাত্র পুত্রবধূর এই উৎসবে আসিয়াছে। নানাপ্রকার উপহার সামগ্রী তাহারা লইয়া আসিয়াছেন। নরসীর দেখা নাই। সময় প্রায় উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ও কে? বহু কাপড়, জামা, তেল এবং অন্যান্য প্রসাধন দ্রব্য লইয়া কে অগ্রসর হইতেছে? কি সুন্দর চেহারা। তাহার সঙ্গিনী যেন স্বয়ং লক্ষ্মী-প্রতিমা। ইহারা নরসীর বাড়ী হইতে আসিয়াছে।

সামগ্রী দেখিয়া রঙ্গধর স্তম্ভিত। কত বিচিত্র বর্ণের শাড়ী! প্রচুর প্রসাধন দ্রব্য। ভাগ্যবতী নারীগণকে দিবার জন্য নানাপ্রকার দ্রব্য দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা নরসীর কোনো আত্মীয় কি? তিনি স্বয়ং আসিলেন না তার কারণ কি? আগন্তুক বলিলেন,—নরসিংহরামের সর্বদা ভজনে থাকিতে হয়। তাহার ব্যবহারিক কাজ করিবার সময় কোথায়? তাহার যখন যাহা কিছু করিবার প্রয়োজন পড়ে, আমিই উহা করিয়া দিই। অন্য কোনোরূপ লৌকিক সম্বন্ধ তাহার সহিত আমার না থাকিলেও সে আমাকে বড় প্রীতি করে, আমিও তাহাকে অত্যন্ত প্রীতি করি। ইহা হইতে আর বড় সম্বন্ধ কি থাকিতে পারে? রক্ত সম্বন্ধ হইতেও প্রীতি সম্বন্ধ বড়।

ভক্তের লোক বলিয়া পরিচয় দিয়া ভগবান্ নিজেই কুমারীর শ্বশুর-বাড়ীতে কার্য সমাধান করিলেন। নরসীর মহিমার কথা সকলেই বলে। তাহার জন্য ভগবান্ মানুষের বেশে কাজ করিয়া দেন। কোনো সময় তাহার অসুবিধায় পড়িতে হয় না। হিংসুক লোকে নিন্দা করে। তাহার দোষ বাহির করিতে পারিলে আনন্দ হয়। ভক্ত নির্দোষ। তাহার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করিবার জন্য চেষ্টা চলিল। এক অপবিত্রচিত্ত নারী আসিয়া তাহাকে প্রলুব্ধ করিতে চেষ্টা করিল। নরসী ভগবানের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। তিনি সেই নারীকে ভক্তিশিক্ষা দিয়া শুদ্ধ করিলেন।

কিছুদিন ধরিয়া সারঙ্গধর নরসীর বিরুদ্ধতা করিতেছেন। সে ঐ নারীকে পাঠাইয়াছিল ভক্তজীবন কলঙ্কিত করিতে—ফলে সে একদিন সর্প দংশনে ঢলিয়া পড়িল। তাহার আত্মীয়েরা বলিল, জীবনের আশা নাই। তবে ভক্ত নরসীর অনেক রকম আলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। চল, একবার তাহার কাছে, যদি কোনোরূপে প্রাণ রক্ষা করা যায়।

মূর্ছিত সারঙ্গধর ধূলিতে লুণ্ঠিত। সাধুর সহিত হিংসার পরিণাম। সর্পবিষে জর্জরিত দেহ। তাহার আত্মীয়েরা অত্যন্ত আকুল ভাবে নরসীর নিকট বলে—আপনি পরম সাধু। আপনার বিরোধিতার দুঃখ বুঝিয়াছি। সাধুর নিকট শত্রু বা মিত্র ভেদদৃষ্টি নাই। সারঙ্গধর শত্রুতা করিলেও তাহাকে আপনি কোনোদিন শত্রু বলিয়া বিরোধ করেন নাই। এই বিপদে অনুগ্রহ করুন। আপনার আলৌকিক ক্ষমতার বলে ইহাকে রক্ষা করুন।

নরসী বিনীত ভাবে বলেন—ভাই, আমার কোনো আলৌকিক ক্ষমতা নাই। আমার প্রাণের প্রভু নিজের দয়ায় আমাকে কৃতার্থ

করেন। যদি তোমরা তাঁহার প্রতি নির্ভর করিতে পার তবে ভগবানের চরণামৃত পান করাইয়া দাও। বিষ দূর করিতে পারে এরূপ ভাল ঔষধ আর কিছু জানি না। অকাল মৃত্যুহরণ চরণামৃত।

চরণামৃত দেওয়া হইল। সারঙ্গধর সেই অমৃত স্পর্শে চক্ষু মেলিয়া চাহিল। ক্রমে তাহার বিষ-দোষ দূর হইল। সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত। চরণামৃতের এরূপ প্রভাব! সারঙ্গধর নরসীর পায়ে লুটাইয়া পড়িল।

সে বলে,—সাধু, আমার জীবন রক্ষক তোমার নিকট আমি অপরাধী; আমার অপরাধ ক্ষমা কর। সাধু হাসি মুখে বলেন—ভাই, কেহ কাহারও শত্রু নয়। ভগবানই কখনো শত্রু, কখনো মিত্র। সকলের মধ্যেই তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা কর। বাহিরের খোলস উঠিয়া গেলে দেখা যাইবে ভিতরে ভগবান্ আছেন।

সেদিন এক ব্রাহ্মণ নরসীর দ্বারে উপস্থিত। নরসী বলে—মহাত্মন্, আমাকে কি জন্য প্রয়োজন? ব্রাহ্মণ বলেন—সাধু, কন্যাদায়ে পড়িয়াছি; কিছু টাকার প্রয়োজন। সাধু বলেন—চলুন, ধরণী ভক্তলোক, আমাকে সে বিশ্বাস করে, যদি তাহার নিকট হইতে ধার পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণকে লইয়া সাধু ধরণীর নিকট আসিয়াছেন। সে বলে—টাকা পয়সার ব্যাপার। সাধুজী, আমি হঠাৎ অতগুলি টাকা কোথা হইতে দিই? তবে কিছু বন্ধক রাখিলে চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি। ব্রাহ্মণের অত্যন্ত প্রয়োজন। সাধুর এরূপ কোনো সোনারূপার সামগ্রী নাই যে বন্ধক দিতে পারেন। জমি নাই যে উহা দিবেন। তিনি বলেন—ধরণী, তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস কর, তাহা হইলে বলি—আমার অপর কোনো সামগ্রী বন্ধক দেওয়ার মত নাই। 'কেদার রাগ' আমার প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়। আমি যখন সেই সুরে গান করি প্রভুর বড় আনন্দ

হয়। আমি উহাই তোমার নিকট গচ্ছিত রাখিতেছি। যতদিন ঋণ শোধ করিতে না পারি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, 'কেদার রাগ' গাহিব না। তুমি অর্থ দিয়া এই ব্রাহ্মণের উপকার কর। কেদারা সন্ধ্যার পর গান করা হয়।

নরসী সাধুর প্রতিজ্ঞামত দলিল লিখিয়া টাকা দিল। এদিকে রাও মাণ্ডলীকের সভায় সাধুর নামে ভয়ঙ্কর অভিযোগ। দল বাঁধিয়া কতগুলি দুষ্টলোক সাধুর বিরুদ্ধে লাগিয়াছে। তাহারা বিশেষ করিয়া বলে - সাধুতার নামে নরসী যাদু করে। তাহার লোক ভুলাইবার ক্ষমতা আছে। সে শাস্ত্র সদাচার পালন করে না, সমাজের মধ্যে সে কতগুলি অনাচার চালাইতেছে। এই জন্য তাহার শাসন প্রয়োজন। পণ্ডিতের সম্মুখে শাস্ত্রবিচার করিয়া সে তাহার ব্যবহার সম্বন্ধে শাস্ত্র সম্মত প্রমাণ দিতে বাধ্য।

নরসী অভিযোগ শুনিলেন। প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—আমি পণ্ডিত নই। কখনো পণ্ডিত হওয়া পছন্দ করি নাই। অপরের সঙ্গে তর্ক করিয়া আমার মত স্থাপন করিবার ইচ্ছা আমার নাই। আমি কাহারও উপদেষ্টা হইতে চাই না। আমার জীবনটিকে সুন্দর ভাবে ভগবানে অর্পণ করিবার জন্যই আমার চেষ্টা। এই জন্য আমি তাঁহার চিন্তা করি, নাম গান করি। আমার মনে হয়, শাস্ত্র পড়িয়া যাহারা লোকের সঙ্গে শুষ্ক বিচারে রত হয়, তাহারা শাস্ত্র জানে না। যে হরিভজন করে সে সকল শাস্ত্র জানে। ভগবানে যাহার ভক্তি নাই তাহার দান, ব্রত, যজ্ঞ, অপর সকল কর্ম্ম নিরর্থক হইয়া যায়। অলবণ সকল ব্যঞ্জন অখাদ্য।

রাজ দরবারে সহস্র অভিযোগের সম্মুখেও ভক্ত নির্ভয়। তিনি গান ধরিলেন—যতদিন ওরে মন, তুই আত্মাকে সন্ধান করিস্ নাই, ততদিন

তোর সকল সাধন বৃথা। তোর মনুষ্যদেহ শরৎকালের মেঘের মত ক্ষণিক, রসশূন্য। স্নান, সেবা, পূজা, দান, ব্রত, ভস্ম-ধারণ, চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বসিলে কি হইবে? তপ, জপ, তীর্থসেবা, বেদপাঠ, জ্ঞান, বর্ণাশ্রম বিচার, আত্মদর্শন বিনা সব কিছুই ব্যর্থ হইয়া যায়। যাহারা উদর পূরণের লালসায় ধাবিত হয়, তাহারা শাস্ত্রবিচার করিয়া নিজের পাণ্ডিত্যের বড়াই করুক। আমার রুটি জুটুক্ বা না জুটুক্ আমি সকল অবস্থায় একপ্রকার আছি। আমার পরম আশ্রয় কৃষ্ণ। তাহার আশ্রিত ব্যক্তি বিপদকে সম্পদ্ বলিয়া মনে করে। ভক্তি-স্বর্ণের কষ্টিপাথর বিপদ্।

রাও মাণ্ডলীক চতুর ব্যক্তি। তিনি বিবেচনা করেন - সাধুর পিছনে দুষ্টলোক লাগিয়াছে। সাধু সরল প্রকৃতি। তাহার যাহাতে কোনোরূপ অনিষ্ট না হয় দেখিতে হইবে। সাধারণ লোক অভিযোগ করিয়াছে, তাহাদেরও সন্তুষ্ট করা চাই। তিনি একটি ফুলের মালা আনাইলেন। মালাটি সাধুর হাতে দিয়া তিনি বলেন—আমাদের মন্দিরে রাধা-দামোদর জাগ্রত বিগ্রহ। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনিলাম। আমি ইহার বিচারের ভার রাধা-দামোদরের উপর দিতেছি। আপনি মন্দিরে যাইয়া এই মালা প্রভুকে পরাইয়া দিন। মন্দিরে তালা বন্ধ করিয়া চাবি আমি রাখিব। আজ রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে যদি দেখিতে পাই যে, এই মালা রাধা-দামোদর কোনোরূপে আপনাকে প্রসাদরূপে দিয়াছেন, বুঝিব আপনি যে ভজনের মহিমা বলিয়াছেন উহা সত্য। যদি তাহা না হয়, অন্যরূপ ব্যবস্থা করা যাইবে।

ভক্ত-নরসী নির্ভয়ে চলিলেন মালা লইয়া। মন্দিরে ভগবানের গলায় মালা পরাইয়া তিনি বলেন—প্রভু, তুমি আমার অন্তর জান। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। আমার জন্য মন্দির ও কারাগার সমান। আমি যেখানে থাকি তোমাকে ডাকি। আমার কোনো দুঃখ নাই। আমি

চলিলাম মন্দিরের বাহিরে। তুমি যাহা ভাল মনে কর করিও। তোমার বিধানে তোমার দাস চির পরিতুষ্ট।

মন্দিরের বাহিরে নরসী ভজন করিতে বসিয়াছে। মন্দিরের দ্বারে বড় বড় তালা বন্ধ করা হইল। চাবি মাণ্ডলীকের নিকট চলিয়া গেল। বিরোধীরা আসিয়া নরসীকে দেখে আর বলে- এবার সাধুতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। লোক ঠকানো কতদিন চলে? এবার সত্যকার পরীক্ষা। নরসী কাহাকেও কিছু বলেন না। নিজের মনে গান করেন—

কৃষ্ণ কহো কৃষ্ণ কহো, আ অবসর ছে কে 'বান্থ।
পাণীতো সবে বরসী জাশে, রামনাম ছে রে 'বান্থ॥
রাবণ সরখা ঝট চাল্যা, অন্তকালনী আঁটী মাঁ।
পলকবার মা পকডী লীধা, জাণে৷ জমনী ঘাঁটী মা॥
লখেসরী লাখো লুটায়া, কালে তে নাখ্যা কুটীনে।
ক্রোড়পতিনূ জোর ন চাল্যূঁ তে নর গয়া উঠীনে॥
এ কহেবান্থ সৌনে কহিয়ে, নিশদিন তালী লাগী রে।
কহে নরসৈঁয়ো ভজতাঁ প্রভুনে ভবনী ভাবট ভাগী রে॥

অবসর মিলিয়াছে কৃষ্ণ বল, কৃষ্ণ বল। মেঘের জল বর্ষণ হইয়া ফুরাইয়া যায়। রাম নাম অমৃত বর্ষণ চিরকাল থাকে। রাবণের মত বীরপুরুষকেও যমরাজ চক্ষের নিমেষে আক্রমণ করিয়া অসহায় শিশুর মত কালের গ্রাসে নিক্ষেপ করে। লক্ষ লক্ষপতিকে কাল চূর্ণ করিয়াছে। কোটি পতিরও কালের সঙ্গে বলপ্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। তাহারাও এই সংসার হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই কথা সকলের নিকট জানাইয়া দেওয়া কর্তব্য। নরসী বলে—নিশিদিন মন দিয়া প্রভুর ভজনে লাগিয়া থাকিলে সংসারে জন্মমরণ ভয় দূর হইয়া যায়। মৃত্যুর মধ্যে সাধক অফুরন্ত জীবনের সন্ধান পাইয়া তাহাকেও বলে—'তুমি

'আমার শ্যাম সমান'। লোকে ভয় দেখায়। সাধু এবার যদি পরীক্ষায় সাধুতার পরিচয় দিতে অক্ষম হন, তাহা হইলে তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। নরসী বলেন—আমার মৃত্যুর জন্য ভয় নাই। সত্যকে আশ্রয় করিয়া যে প্রাণ ত্যাগ করে সে অমর হইয়া থাকে। মৃত্যু হয় সকলেরই কিন্তু মহৎ কার্য করিতে যাইয়া সত্যকে সমর্থন করিতে করিতে যে মৃত্যু, উহা অমর লোকের আনন্দ সঙ্গীত শ্রবণের মতই সুখদায়ক। মৃত্যু ভয়ের নয়। মৃত্যুব পরে সুখের স্পর্শ।

রাত্রি অনেক হইয়াছে। নরসীর শেষ পর্যন্ত কি হয় দেখিবার জন্য বাহিরে বহুলোক সমবেত হইয়াছিল। তাহারা একে একে চলিয়া গিয়াছে। প্রধান ব্যক্তিরা এবং প্রহরীবা তখনও অপেক্ষা করিতেছে। নরসী ভাবে আমাব প্রভুব প্রিয় 'কেদার রাগ' আমি যে ধরণীর নিকট টাকার জন্য বন্ধক রাখিয়া আসিয়াছি। আমার প্রভুর আনন্দের জন্য সেই রাগিণীতে গান করিব তাহাও পারি না।

ভক্তবৎসল দ্বারকানাথ বত্ন-পালঙ্কে শায়িত। রুক্মিণী দেবী পদসেবা করিতেছেন। হঠাৎ প্রভু শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। দেবী জিজ্ঞাসা করেন—প্রভু, হঠাৎ আপনার এত অধিক রাত্রে কি কাজের কথা মনে পড়িল? প্রভু বলেন—আজ আমার নিরপরাধ ভক্ত নরসীর বড় কষ্ট হইতেছে। সে কষ্ট করিবে আর আমি ঘুমাইয়া থাকিব, ইহা হইতে পারে না। 'আসিতেছি' -বলিয়া প্রভু মন্দিরের বাহির হইয়া গেলেন।

এতরাত্রে সদর দরজায় কে ডাকে দেখ তো? ধরণী ঘুমাইয়া ছিল। দ্বারে আসিয়া দেখিল নরসিংহ মেহতা। ধরণী বলিল—এত রাত্রে কি মনে করিয়া? নরসিংহ বলেন—তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে আসিয়াছি। টাকাটা বুঝিয়া লও। দেরী করিও না আমাকে অনেক দূর যাইতে হইবে তাই রাত্রেই আসিলাম। টাকা লইয়া ধরণী বিনা

বাক্যব্যয়ে দলিল খানা স্বাক্ষর করিয়া ফিরাইয়া দিল। সে বুঝিল না অধমর্ণরূপে কে তাহার দ্বারে আসিয়াছিল।

মন্দির প্রাঙ্গণে ভগবানের চিন্তায় আবিষ্ট নরসী। হঠাৎ তাহার সম্মুখে একখানা কাগজ পড়িল। নরসী উহা তুলিয়া লইলেন। আরে এটি যে ধরণীকে দেওয়া টাকার দলিল। দেখিলেন পিছনে কি যেন লেখা আছে। নরসী উহা পাঠ করিলেন—অদ্য মধ্যরাত্রে নরসিংহ এই দলিলের প্রাপ্য সমস্ত টাকা আমাকে দিয়াছে। সে ঋণমুক্ত অতএব 'কেদারা' গান করিতে পারে। স্বাক্ষর শ্রীধরণীধর।

নরসীর মন নাচিয়া উঠিল। আমি কেমন করিয়া 'কেদারা' গান করি ভাবিতেছিলাম। প্রভু আমার সেই পথ করিয়া দিয়াছেন। আমি তো এই রাত্রে ধরণীর বাড়ী যাই নাই। তবে সেখানে গেল কে? নিশ্চয় আমার প্রভু আমার দুঃখ জানিয়া এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। নরসীর নয়নে প্রেমের অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তিনি রোমাঞ্চিত দেহে দাঁড়াইয়া উঠিলেন—আনন্দে নাচিতে লাগিলেন আর কেদারায় গান ধরিলেন।

সংসারনো ভয় নিকট ন আবে শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল গাতাঁ।
উগার্যো পরীক্ষিত শ্রবণে সুণতা, তাল বেণা বিষ্ণু না গুণ গাতা॥
বালক ধ্রুব দৃঢ় ভক্ত জাণী, অবিচল পদবী আপী।
অসুর প্রহ্লাদনে উগারী লীধো, জনম জনমনী জড়তা কাপী॥
দেবনা দেব তু কৃষ্ণ আদি দেবা, তারু নাম লেতাঁ অভেপদ দাতা।
তে তারা নামনে নরসৈঁয়ো নিত্য জপে, সারকর সারকর বিশ্বখ্যাতা॥

যে কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল নাম গান করে তাহার নিকট সংসারের ভয় আসিতে পারে না। তাল লয় বিনা কেবল কানে শুনিয়াই পরীক্ষিত উদ্ধার পাইয়াছে। বালক ধ্রুবকে তাহার ভক্তির গুণে ভগবান্ ধ্রুবলোক দান করিয়াছেন। অসুরকুল-জাত প্রহ্লাদের জন্ম জন্মান্তরে জড়তা

দূর করিয়া তাহাকে ভগবান্ রক্ষা করিয়াছেন। হে আদিদেব কৃষ্ণ, তোমার নাম লইলে অভয় পদ লাভ করা যায়। নরসী তোমার নাম লইতেছে। তুমি তাহাকে রক্ষা কর।

ভোরের আলোক তখনও ভূমিকে স্পর্শ করে নাই। কুঞ্জবনে জাগরণের প্রথম স্পন্দন মৃদুল পবন হিল্লোলের মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে। আন্দোলিত কুসুমের বক্ষে ভ্রমর গুঞ্জন করিয়া উঠিল। পক্ষীকুল একটু চঞ্চল হইয়া আবার স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। বিকশিত কুসুমের মধুময় গন্ধ বহন করিয়া মলয় পবন মন্দির দ্বারে আসিয়া আঘাত করিল। কি জানি কোন্ গোপন দরদী বান্ধবের কোমল স্পর্শে রুদ্ধদ্বার উন্মোচিত হইল। প্রভুর গলার মালা সকলের অগোচরে কেমন করিয়া আসিয়া নরসীর গলায় পড়িল। যাহারা ভজন-নিরত নরসীর অবস্থা কি হয় দেখিবার জন্য সারারাত্রি জাগিয়া কাটাইতেছিল তাহারা তখন তন্দ্রাতুর। তাহারা দেখিল না—বুঝিল না—কেমন করিয়া ভক্ত ও ভগবানের মিলন হয়!

নরসী প্রসাদিমালা গলায় পাইয়া গান ধরিয়াছে। তাহার গানে আর সকলের চমক ভাঙ্গিল—তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। তাহারা দেখে—নরসীর গলায় প্রভু রাধাদামোদরের প্রসাদিমালা। এ মালা কি করিয়া মন্দিরের বাহিরে আসিল? বড় আশ্চর্য্য। তখন শত্রু মিত্র সকলেই বুঝিল, নরসী সাধারণ লোক নয়। সাধুর সহিত বিরোধ করিয়া তাহারা অনুতপ্ত। সাধু গাহিতেছেন—

বৈষ্ণবজন তো তেনে কহিএ, জে পীড় পরাঈ ন জাণে রে।
পরদুঃখে উপকার করে তোয়, মন অভিমান ন আণে রে॥

যে কখনো কায়মনোবাক্যে পরের পীড়ন করিতে জানে না তাহাকেই বৈষ্ণব জানিবে। যে মনে কখনো অভিমান রাখে না, যে

পরদুঃখে কাতর হইয়া পরোপকার নিরত, সে বৈষ্ণব। যে সাধুগণের বন্দনা করে, অথচ কাহারো নিন্দা করে না, যে বাক্য শরীর ও মনকে শুদ্ধ রাখে, তাহার জননী ধন্য। যে সমদৃষ্টি, তৃষ্ণাত্যাগী এবং পরস্ত্রীকে মায়ের মত দেখে, যাহার রসনা মিথ্যা বলে না, যে পরধন অপহরণ করে না, যাহার মায়া মোহ নাই, দৃঢ় বৈরাগ্য, রাম নামে অনুরাগ, তাহারই দেহের মধ্যে সকল তীর্থ বাস করে। অকপট নির্জনবাসপ্রিয়, কামক্রোধ-জয়ী, এরূপ সাধুর দর্শনে নরসী বলেন---কুলও পবিত্র হইয়া যায়।

সকল লোকমা সহুনে বন্দে, নিন্দা ন করে কেনী রে।
বাচ কাছ মন নিশ্চল রাখে ধন ধন জননী তেনী রে॥
সমদৃষ্টি নে তৃষ্ণাত্যাগী, পরস্ত্রী জেনে মাত রে।
জিহ্বা থকী অসত্য ন বোলে পরধন নব ঝালে হাথ রে॥
মোহ মায়া ব্যাপে নহি জেনে, দৃঢ় বৈরাগ্য জেনা মনমা রে।
রাম নামশু তালী লাগী সকল তীরথ তেনা তনমা রে॥
বণলোভো নে কপট রহিত ছে, কামক্রোধ নিবার্যা রে।
ভণে নরসৈঁয়ো তেনু দরশন করতাঁ কুল একোতের তার্যা রে॥

নরসী প্রায় সহস্র পদ রচনা করিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি পদ ভক্তির উৎস। ইঁহাকে কেহ কেহ মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ রাজার অবতার বলিয়া মনে করেন। গুজরাটী ভাষায় তাঁহার পদগুলি সবদাই ভজন মণ্ডলীতে গান করা হয়। ভারতের সর্বত্রই এই সাধুর ভক্ত আছেন। নিজের পরিচয় দিয়া তিনি বলিয়াছেন--

গাম তলাজামা জন্ম মারো থয়ো, ভাভীএ মূরখ কহী
মেহেণু দীধু।
বচন বাগু্য এক অপূজ শিবলিঙ্গসু, বনমাঁহে জই পূজন কীধু॥

এই পদ অনুসারে জুনাগড়ের নিকটবর্ত্তি তলাজা গ্রামে ইহার জন্ম

হয়। ১৪১৩ খৃষ্টাব্দে ইহার আবির্ভাব বলিয়া অনুমান করা যায়। তিনি বনমধ্যে অপূজিত শিবলিঙ্গ পূজা করিতেন। যাহাকে ভ্রাতৃবধূ মূর্খ বলিয়া বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দেয়, সেই ব্যক্তি একদিন সহস্র সহস্র লোকের আদরের পাত্র হইয়াছিলেন।

তিনি বলেন—এই ধরণী ধন্য। এখানে যে ভক্তি আছে ব্রহ্মলোকে তাহা নাই। লোকে পুণ্য করিয়া স্বর্গে যায়, পুণ্যক্ষয়ে পুনরায় জন্ম। হরিভক্ত মুক্তি না চাহিয়া বার বার জন্ম গ্রহণ করিতে অভিলাষী। ইহাতে সে নিত্য সেবা, নিত্য কীর্তন, নিত্য উৎসবে নন্দকুমারকে দর্শন করিতে পারে। এই ধরণীতলে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া যে গোবিন্দ গুণগান করিল তাহার মাতাপিতা ধন্য। সে এই দেহকে সফল করিয়াছে। বৃন্দাবন ধন্য, লীলা ধন্য, ব্রজবাসী ধন্য, তাহাদের আঙ্গিনায় অষ্ট মহাসিদ্ধি দাঁড়াইয়া আছে। মুক্তি তাঁহাদের দাসী। এই অফুরন্ত ভক্তিরসের স্বাদ শঙ্কর জানেন, শুকদেব জানেন, আর জানেন বৃন্দাবনের গোপী। নরসী স্বাদ গ্রহণ করিয়াই একথা বলিতেছে।

ভূতল ভক্তি পদারথ মোটু, ব্রহ্মলোক মা ন াহী রে।
পুণ্য করী অমরাপুরী পাম্যা, অন্তে চৌরাসী মাঁহী রে॥
হরিনা জন তো মুক্তি ন মাগে, মাগে জন্মোজন্ম অবতার রে।
নিত্য সেবা নিত্য কীর্তন ওচ্ছব, নিরখবা নন্দকুমার রে॥
ভরতখণ্ড ভূতলমাঁ জনমী, জেণে গোবিন্দ না গুণ গায়া রে।
ধন ধন এনাঁ মাত পিতানে, সফল করী ঐনে কায়া রে॥
ধন বৃন্দাবন ধন এ লীলা, ধন এ ব্রজনা বাসী রে।
অষ্ট মহাসিদ্ধি আঁগণিয়ে রে উভী, মুক্তি ছে এমনী দাসী রে॥
কোঈ এক জাণে ব্রজনী গোপী ভণে নরসৈঁয়ো ভোগী রে॥

ভগবান্ প্রেমেই প্রকাশিত হইয়া পড়েন। তিনি এক হইয়াও

বহুরূপী, চক্ষুর খুব কাছে থাকিয়াও প্রেমহীনের অনেক দূরে। নরসী প্রেমনেত্রে তাঁহাকে যে ভাবে দেখিয়াছেন তাহা এই—

অখিল ব্রহ্মাণ্ডমা এক তুঁ শ্রীহরি, জুজবে রূপে অনন্ত ভাসে।
দেহমা দেব তুঁ তেজমাঁ তত্ত্বতুঁ শূন্যমাঁ শব্দ থঈ বেদ বাসে॥
পবন তুঁ পাণী তুঁ ভূমি তুঁ ভূধরা, বৃক্ষ থঈ ফূলী রহ্যো আকাশে॥
বিবিধ রচনা করী অনেক রস লেবানে, শিব থকী জীব থয়ো এজ আশে॥
বেদ তো এম বদে, শ্রুতিস্মৃতি সাখ দে, কনক কুণ্ডল বিষে ভেদ নৃহোয়ে।
ঘাট ঘড়ীয়া পছী নামরূপ জুজবাঁ, অন্তে তো হেমনুঁ হেম হোয়ে॥
গ্রন্থ গড়বড় করী, বাত ন করী খরী, জেহনে জে গমে তেনে পূজে।
মন কর্ম বচনথী আপ মানী লহে, সত্য ছে এজ মন এম সূজে॥
বৃক্ষমা বীজ তুঁ, বীজমা বৃক্ষ তুঁ, জোউ পটন্তরো এক পাসে।
ভণে নরসৈঁ য়ো এ মন তণী শোধনা, প্রীত করু প্রেমথী প্রগট থাশে॥

হে হরি, অখিল ব্রহ্মাণ্ডে তুমি এক। তবু তুমি বহুরূপে অনন্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছ। এই দেহে দেবতা তুমি, অগ্নির তেজ তুমি, তুমিই আকাশে শব্দ, বেদে তোমার প্রকাশ, তুমি বায়ু, জল, পৃথ্বী ও পর্বত। তুমিই আকাশে উন্নত-শির পুষ্পিত-বৃক্ষ। বিচিত্র সৃষ্টির ভিতর তুমি কত রস ভোগ করিতেছ। শিব হইয়াও তুমি জীব হইলে এই রস ভোগের জন্য। বেদ বলে, স্মৃতি সাক্ষ্য দেয়, কুণ্ডল ও স্বর্ণে শুধু গড়ার জন্য রূপের ও নামের ভেদ, স্বরূপের ভেদ নাই, দুই-ই স্বর্ণ।

শাস্ত্রের বাক্য বিরোধ লাগে, সত্যকথা বুঝিয়া উঠা যায় না। যাহার যেটি ভাল লাগে, সে সেইরূপ পূজা করে। কায়মনোবাক্যে পরমাত্মাকে জানিয়া তাহাকে লাভ করা ইহাই সকল কথার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্য কথা। বৃক্ষের বীজ তুমি। তুমিই বীজের মধ্যে বৃক্ষ। দেখিতেছি মাঝে একটু সূক্ষ্ম আড়াল। এই আড়াল দূর হইলে সত্য বস্তু শুধু প্রেমেই প্রকাশিত হয়।

বৃন্দাবনে গোপীদের এই প্রেম প্রকাশ হইয়াছিল। তাহারা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছু দেখিতেন না, কৃষ্ণ ভিন্ন কিছু শুনিতেন না, কৃষ্ণ ভিন্ন তাহারা অন্য কিছু ভাবিতেন না। কৃষ্ণ এই প্রেম-প্রতিমা গোপীদের প্রেমের আকর্ষণে লুকাইয়া থাকিতেও পারেন নাই।

গায়ে গোপী গোবিন্দনা গুণ, উলট অঙ্গ ন মাএ রে।
রাব মশে তে শামলিয়ানুঁ, মুখড়ুঁ জোবা জাএ রে॥
দুধ দহী আগল করী রাখে, মাখণ সাকর মাহে রে।
ঘরনা দবার উঘাড়া মূকে, জো আবে তে খাএ রে॥
ধন ধন গোকুল ধন ধন গোপী, কৃষ্ণনা গুণ ভাবে রে।
নিশদিন ধ্যান ধরে মন হরীনু, ইম জাণে ঘর আবে রে॥
জেনু ধ্যান ধরে মহা মুনীজন, তে স্বপনে না দেখে রে।
তে শামলিও প্রগট থইনে, প্রেমদা প্রেমে পেখে রে।
যজ্ঞ করে ত্যাঁহা প্রগট ন থাএ, তে গোপীনা ঘর মাহে রে।
ভণে নরসৈঁয়ো গোরস গমতুঁ, মাখণ চোরী খাএ রে॥

গোবিন্দের গুণগান করিতে করিতে অঙ্গে পুলক আর ধরিতেছে না। ঘোল রাখিয়া আসিবার ছলনায় গোপী শ্যাম সুন্দরকে দেখিবার জন্য যাইতেছে। (নন্দালয়ের নিকটেই ছাচ-কুণ্ড আছে। ছাচ শব্দের অর্থ ঘোল)। গৃহের দ্বার তাহারা খোলা ফেলিয়া রাখে। দুধ, দধি মাখন, মিছ্‌রি, চক্ষুর সাম্‌নেই ধরিয়া রাখে। তাহাদের ইচ্ছা—শ্যামল আসুক, খাইয়া যাউক। গোকুল ধন্য, গোপী ধন্য। তাহাদের নিকট কৃষ্ণগুণ ভাল লাগে। নিশিদিন তাহাদের শুধু এই ভাবনা—কৃষ্ণ যেন আমাদের ঘরে আসে। কত মহামুনি যে শ্যামরূপের ধ্যান করিয়া দর্শন করিতে পারিতেছেন না, সেই শ্যামসুন্দর আসিয়া গোপীদের প্রতি প্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যাইতেছেন। বৃহৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠানেও যিনি প্রকাশিত হন না,

তিনি এই গোপীদের গৃহে অবস্থান করেন। নরনী বলেন—প্রেম-দুগ্ধ তাঁহার অত্যন্ত প্রিয়, তাই তিনি গোপীর ঘন প্রেম--মাখন চুরি করিয়া খান।

নরনী গোপী-প্রেমের পরিচয় পাইয়া ধন্য। তাহারা যেভাবে শ্যামের মুরলী ধ্বনিতে আত্মহারা, নরনী তাহার প্রতিস্পন্দন নিজের অন্তরে অনুভব করেন। তাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়া যায়। মোহন মুরলীর গানে। মুরলী বাজানোর সময় অসময় নাই। মধ্য রাত্রেই উহা বাজিয়া উঠিয়াছে।

হে আজ সখী রে শ্রীবৃন্দাবনমা, মধরাতে মোরলী বাগী রে।
স্বণতাঁবে চীত হর্যা মারী সজনী, ভর নিদ্রামা থী হু জাগী রে॥
হে জাগ্রত স্বপন সষুপতি তুরীয়া, উনমীএ তালী লাগী রে।
ত্রিগুণ রহীত থয়ু মন মারূ, কাম বাসনা তাঁহা ভাগী রে॥
হৈ জয-জয দৃষ্ট পড়ে মারী সজনী, তম-তম তাণী মোহতী রে।
নরনৈ বাচা স্বামীনী লীলা, হরখে হীডুন্ড জোতী-জোতী রে॥

ওগো সখী, বৃন্দাবনে আজ মধ্যরাত্রিতে মুরলী বাজিয়া উঠিল। সেই ধ্বনি আমার চিত্ত চুরি করিল। আমার গাঢ় নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, তুরীয় সকল অবস্থা অতীত করিয়া আমাকে ত্রিগুণরহিত করিল। আমার কাম বাসনা দূর হইয়া গেল। যে দিকে আমার দৃষ্টি পড়ে, সেই মোহনীয়া আমাকে মোহিত করে। প্রভুর লীলা দর্শনে নরনীর হৃদয় আনন্দে ভরিয়া রহিল।

# তুলসীদাস

ছোট গ্রাম নাম রাজাপুর। তীর্থরাজ প্রয়াগ বেশী দূর নয়। যমুনার দক্ষিণ তীরে আত্মারাম ত্বুবের গৃহ। তিনি নিষ্ঠাবান সরযূপারী ব্রাহ্মণ। গ্রামের সকলেই তাহাকে সম্মান করে। তাহার পত্নী হুলসী আদর্শ রমণী। স্বামী-সেবা ও গৃহকর্মে তাহার দ্বিতীয় নাই। হরি সাধনায় নিষ্ঠাবতী এই নারী ভক্তশিরোমণি তুলসীদাসের জননী। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে শ্রাবণী শুক্লা-দ্বিতীয়ায় তুলসীদাসের জন্ম।

অনেকের বিশ্বাস তুলসী আদি কবি বাল্মীকির অবতার। রামচন্দ্রের সভায় সেই সুপ্রসিদ্ধ মুনি লবকুশের মুখে রামায়ণ শুনাইয়াছেন। রাম ধ্যানে সিদ্ধ মহামুনির অপূর্ব কাব্যরসে বনের পশুপাখীর চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছে। রামদাস মহাবীর হনুমান উহা পরমাগ্রহে শুনিয়াছেন। তাহার ইচ্ছা আপামর শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বসাধারণে এই রামলীলা-মাধুরী উপভোগ করে। রামায়ণ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত, সকলের নিকট গ্রহণীয় নয়। মহাবীর বাল্মীকির সমীপে আসিয়া বলেন—আপনার রামপ্রেম অখণ্ড। জন্মান্তরের ভয় আপনার নাই। কলিযুগে একবার আপনি জন্ম গ্রহণ করুন। সাধারণের বোধগম্য করিয়া রামলীলা বর্ণনা করুন। মহাবীরের অনুরোধে বাল্মীকি পুনর্জন্ম অঙ্গীকার করিলেন। মহামুনি বাল্মীকি ভক্তকবি তুলসীদাস হইলেন। মাতৃগর্ভেই তাহার দন্তোদ্গম হইয়াছিল। নাড়ীচ্ছেদের সময় অদ্ভুত শব্দ হইল। শিশুটি অস্বাভাবিক বৃহদাকার। এ সকল দেখিয়া লক্ষণজ্ঞ লোকেরা বলিল—এই শিশু তিন দিবস পর্যন্ত যদি জীবিত থাকে, তাহার পর যাহা হয় কর্তব্য স্থির করা হইবে। লক্ষণ বড় ভাল নয়। পিতা-মাতার মৃত্যু হইতে পারে। মূলা নক্ষত্রে জন্ম।

তিনটি দিন কাটিয়া গেল। অযত্নেও শিশুটি মরিল না। হুলসীর কিন্তু অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। সে বুঝিল, মৃত্যু সন্নিকট। সে তাহার দাসীর হাতে শিশুকে সমর্পণ করিয়া বলিল—ছ্যাখ্, তুই এই শিশুকে লইয়া চলিয়া যা—। এই বালক আমি তোকেই দিলাম। তুই ইহাকে রক্ষা করবি। ভগবান্ তোর মঙ্গল করবেন। সেই রাত্রিতেই শিশু লইয়া দাসী পলাইল। এই শিশু রামবোলা তুলসীদাস। হুলসী হরিবাসরের দিন দেহ ত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেল। হুলসী নামের অর্থ উল্লাসী। সত্যই উল্লাসী তুলসীদাসের মত রামবোলা শিশুকে রাখিয়া গিয়া হুলসী নামটিকে সার্থক করিল। অতি শৈশবেই এই অদ্ভুত শিশু রাম নাম উচ্চারণ করে বলিয়া তাহাকে লোকে রামবোলা বলে। পত্নীর মৃত্যুর পর আত্মারাম শিশুর সম্বন্ধে কোনো খোঁজই লইলেন না। দাসী প্রায় পাচ বৎসর পর্যন্ত রামবোলাকে লালন পালন করিল।

অল্পদিন হইল রাজাপুরে খবর আসিয়াছে—সেই দাসী ইহলোকে নাই। এখন শিশুকে কে পালন করে? কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার আগ্রহ দেখাইল না। সে এখন অনাথ। ভগবান্ ছাড়া আর কেহ তাহার রক্ষক নাই। রাস্তায় ঘুরিয়া রাম নাম বলিয়া কখনো কিছু পাইলে সে খায়, ধূলায় ধূসর শরীর বস্ত্রহীন, ইতি উতি ভ্রমণ করে। সে কোনো মন্দিরের সিড়িতে পড়িয়া থাকে, অথবা আশ্রমের ধারে গিয়া আশ্রয় লয়। এই ছেলেটির দুঃখে লোকের চক্ষে জল আসে। কিন্তু পাছে উহাকে বাড়ীতে স্থান দিলে দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, এই ভয়ে কেহ ডাকিয়া স্থান দেয় না।

কেহ কেহ দেখিয়াছে—কোনো অপরিচিতা ব্রাহ্মণী কোথা হইতে আসিয়া রামবোলাকে খাইতে দিয়া যায়। লোকে বলাবলি করে—সে

ব্রাহ্মণী আর কেহ নয়, স্বয়ং অন্নপূর্ণা। রামবোলার দিন এই ভাবে যায়। গ্রামে এক সাধু আসিয়াছেন, নাম নৃসিংহদাস। লোকটি বড় ভাল। একদিন তিনি রামবোলাকে কাছে ডাকিয়া তাহার পরিচয় লইলেন। সে অনাথ। রাস্তার বালকদের সঙ্গে সে খেলা করিতেছিল। সাধু দেখিলেন—বালকের মধ্যে সাধনার বীজ রহিয়াছে। রামবোলাকে তিনি সঙ্গে করিয়া লইলেন। মাতৃপিতৃহীন বালক নৃসিংহদাসের আশ্রমে অযোধ্যায় লালিত হইতে লাগিল। সাধুর সেবায় তাহার অবচেতন মনের শুদ্ধ ভাব বিকাশ হইতেছিল। রামায়ণ-কথায় রাম-বোলাব অতিশয় প্রীতি। নৃসিংহদাস রামায়ণ-কথায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত। বামায়ণ-গান আবম্ভ হইলে গুরু ও শিষ্যের ভেদ ঘুচিয়া যায়। উভয়ে প্রেমে ক্রন্দন করিতে থাকেন। বাহির হইতে যাহারা কথা শুনিতে আসেন আশ্রমবাসী এই বালকের রামায়ণ কথায় অদ্ভুত প্রেম দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইয়া থাকেন। এই রামবোলা একদিন তুলসীদাস হইবে এরূপ বৈশিষ্ট্য তাহার বাল্যেই ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

কাশীধামে শেষ-সনাতন বাস করেন। ইনি খুব পণ্ডিত এবং তপস্বী। নৃসিংহদাসের নবীন শিষ্য তুলসীকে দেখিয়া তিনি বুঝিলেন—ভবিষ্যতে ইহাদ্বারা অনেক কাজ হইবে। তিনি নৃসিংহকে বলিলেন—আপনার এই শিষ্যটিকে আমায় দিন। আমি ইহাকে বিদ্বান্ করিয়া দিব। আমার নিকট থাকিলে ইহার অনেক জ্ঞান লাভ হইবে। নৃসিংহদাস তুলসীকে শেষ-সনাতনের হাতে সমর্পণ করিলেন। কিছুদিন কাশীতে থাকার পর তুলসীকে লইয়া সনাতন চিত্রকূটে আসিলেন। এখানে প্রায় পঞ্চদশ বৎসর পযন্ত তুলসীদাসকে নানাবিদ্যা শিক্ষা দিয়া তিনি দেহত্যাগ করিলেন।

বিদ্যাগুরুর লোকান্তর হইলে তুলসীদাস জন্মভূমি দর্শনের জন্য রাজপুরে আসিলেন। তিনি শুনিলেন—কোনো সাধুর অভিশাপে রাজগুরু

আত্মারামের বংশে আর কেহ বাঁচিয়া নাই। গৃহ পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হইয়াছে। তুলসীদাস গ্রামবাসীর আগ্রহে একটি ক্ষুদ্র ঘর করিয়া রাজপুরে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার আদর্শ চরিত্রে সকলেই মুগ্ধ। তাঁহার ভজন, কীর্তন, রামলীলা কথা-প্রসঙ্গ, অপূর্ব অমৃত প্রবাহ। গ্রামবাসী যেন বৈকুণ্ঠের আনন্দ ভূলোকে পাইয়াছে। তাহারা সকলেই তুলসী-দাসের প্রতি অনুরক্ত।

কিছু দিন পরের কথা। মহাত্মা দীনবন্ধু পাঠকের কন্যার সহিত তুলসীদাসের শুভ পরিণয় হইয়া গেল। বিবাহের পর তুলসীদাসের ভাবান্তর দেখা দিল। প্রথম জীবনে সাধুসঙ্গে থাকিয়া তিনি রামভক্ত হইয়াছিলেন। রামের কথায় তাঁহার খুব আনন্দ হইত। সে কথা যেখানে হইত তিনি আগ্রহ করিয়া শুনিতেন। বিবাহের পর তাঁহার স্ত্রীর প্রতি আসক্তি দিন দিন বাড়িয়া চলিল। স্ত্রীকে কিছুতেই পিত্রালয়ে যাইতে দিবেন না। সর্বদা স্ত্রীর সঙ্গে বসিয়া থাকা, তাহার কাযের সহায়তা করা, তাহার বড় কাজ। বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা ছাড়িয়া দিয়া তিনি কেবল স্ত্রীর কাছে থাকাই পছন্দ করেন। একে একে সকলেই ছাড়িয়া গেল। এমন কি ইহাতে তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রী বুদ্ধিমতী বিরক্ত হইতেন। কয়েকবার পিত্রালয়ে যাইবার কথা বলিয়া তিনি পতির অনুমোদন পান নাই— যাইতে পারেন নাই। শ্বশুর দীনবন্ধু লোক পাঠাইলে নানা অছিলায় তাহাদের ফিরাইয়া দেওয়া হয়। একবার তিনি নিজের পুত্রকে পাঠাইলেন। তুলসীদাস তখন বাজারে গিয়াছেন। ভ্রাতা দেখিল, স্ত্রীর প্রতি আসক্ত তুলসীদাসের অনুমতি পাওয়া যাইবে না। সে ভগ্নীকে বলিল---তুমি আমার সঙ্গে চল। তারপর যাহা হয়, দেখা যাইবে। বহুদিন পিত্রালয়ে যাওয়া হয় নাই! বৃদ্ধ পিতাকে দেখিবার জন্য তাহারও প্রবল উৎকণ্ঠা। তিনি স্বামীর অনুপস্থিতিতেই ভ্রাতার সহিত রওনা হইলেন।

বাজার হইতে ফিরিয়া তুলসীদাস এঘর ওঘর করিয়া স্ত্রীকে খুঁজিতেছেন। একবার ঘাটের দিকে গেলেন। কোথাও যে তাহাকে পাওয়া যায় না?—পাড়ায় গেল কি?—কই?—তাহারও তো কোনো লক্ষণ দেখা যায় না! অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া নিকটস্থ গৃহস্থকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাই, জান কি? আমাদের বাড়ীর মেয়েরা কোথায় গেল?" সে বলিল—"তুলসী, তোমার সম্বন্ধী আসিয়া তাহাকে লইয়া গিয়াছে।" আর কোনো কথা জিজ্ঞাসার প্রয়োজন নাই। তুলসী বুঝিলেন, স্ত্রী পিত্রালয়ে গিয়াছে। বাজারের সামগ্রী যাহা আনা হইয়াছে, সকলই পড়িয়া রহিল। তিনি চলিলেন শ্বশুর বাড়ীতে। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অনাহারে বিষম কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি বুদ্ধিমতীর কাছে গিয়া হাজির। তখন রাত্রি হইয়াছে। সকলে নিদ্রিত ছিল। তুলসী ডাকিয়া তুলিয়াছেন।

অসময়ে অনিমন্ত্রণে এইভাবে স্বামীকে আসিতে দেখিয়া বুদ্ধিমতীর বড়ই লজ্জা—স্ত্রীর প্রতি আসক্তিতে এই ব্যক্তির সঙ্কোচ, মান, সম্ভ্রম, সকলই গিয়াছে। তাহার মনে বড়ই দুঃখ হইল। তুলসীদাস স্ত্রীর নিকটে অগ্রসর হইলে তিনি বলিলেন—

লাজ ন লাগত আপ্‌কো দৌরে আয়হু সাথ
ধিক্ ধিক্ ঐসে প্রেমকে, কহা কহহুঁ মৈঁ নাথ॥
হাড় মাংসকী দেহ মম, তা পর জিত্‌নী প্রীতি।
তিস্‌ আধী জো রাম প্রতি, অবসি মিটিহি ভবভীতি॥

আমার পিছনে পিছনে আসিয়াছেন—লজ্জা নাই—ধিক্ এই প্রেমকে! কাহাকে দুঃখের কথা বলি। আমার হাড় মাংসময় দেহের প্রতি যতখানি আসক্তি ইহার অর্ধেক প্রীতিও যদি রামচন্দ্রের প্রতি হইত তাহা হইলে আর কথা ছিলনা:—অবশ্যই ভবভয় দূর হইয়া যাইত।

স্ত্রীর মুখের এই নিষ্ঠুর সত্য কথাটি তুলসীদাসের অন্তর স্পর্শ করিল। একদিন চিন্তামণির বাক্য যেরূপ ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের সুপ্ত চেতনার প্রবোধন করিয়া তাহাকে প্রেম-ভক্তির সুখময় পথে বিচরণ করিবার নিমিত্ত দিব্য চক্ষুদান করিয়াছিল, ঠিক সেইরূপ তুলসীদাসেরও অবচেতন মনের অন্তরালে অনন্ত সুখসাগর সন্ধানের যে রুদ্ধ-চেতনা ধারা ছিল, উহার পাষাণ-চাপা মুহূর্তের মধ্যে সরিয়া গেল। প্রতিবাদ করিবার ইচ্ছা হইল না, কথা জুটিল না।

তুলসীদাস ছুটিলেন, রামচন্দ্রের সুখময় সঙ্গ স্মরণ করিয়া। প্রয়াগে আসিলেন—ভরদ্বাজ-আশ্রম দর্শন করিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের চরণ-স্পৃষ্ট ভূমি স্পর্শ করিয়া দেহ মন পুলকিত হইল। সেখান হইতে বৈরাগ্য-ব্রত গ্রহণ করিয়া তিনি পুরুষোত্তম ক্ষেত্র, রামেশ্বর, দ্বারকা, বদরীনারায়ণ ভ্রমণ করিলেন। ভারতের চারিটি প্রান্তস্থিত চারিটি ধাম দর্শনে বহির্গত হইয়া তুলসীদাস ভারতীয় জনগণের, সাধনা ও ধর্মের বিভিন্ন রীতি নীতির সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হইলেন। দীর্ঘ চতুর্দশ বর্ষ নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তিনি ধর্মশিক্ষা লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি নির্জনে ভজন করিবেন।

কাশীধাম জ্ঞানভূমি। এখানে বাস করিলে হৃদয়ে জ্ঞানের বিকাশ হয়। তুলসীদাস কাশীধামে আসিয়া ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। খোঁজ পাইয়া বুদ্ধিমতী একখানা পত্র পাঠাইলেন। তিনি লিখিয়াছেন—

কটিকী খীনী কনক সী, রহতি সখিন সঙ্গ সোই।
মোহি ফটেকো ডরু নহী, অনত কাট ভয় হোই॥

কোমরে সরু সোণার শিকল যেমন দেহের ক্ষতি করে না বরং বন্ধুর দেহের শোভা বর্ধন করে, তেমনি আমাকে কাছে রাখিলেও তোমার কোনো ভয়ের কারণ নাই। অপরের সঙ্গেই তোমার ভয় হইতে পারে। তুলসীদাস স্ত্রীর পত্রের উত্তর দিলেন—

কটে এক রঘুনাথ সঙ্গ বাঁধি জটা সির কেশ।
হম তো চাখা প্রেমরস পত্নীকে উপদেশ॥

আমি এক রঘুনাথের সঙ্গেই কাল কাটাইব। আমি মাথায় জটা ধারণ করিয়াছি। পত্নীরই উপদেশে আমি প্রেমরস আস্বাদ পাইয়াছি। আমার আর সংসারের আসক্তি নাই।

যে তুলসীদাস একদিন স্ত্রীর বিরহ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া স্ত্রীর অনুসরণে শ্বশুর গৃহে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন—তাহার এই পরিবর্তন। মগ্নচৈতন্যে যে তত্ত্বোধি আছে উহার তলায় তুলসী বসিয়াছেন। ভগবানের অনুগ্রহ জীবনে এই প্রকার অদ্ভুত বিপর্যয় আনিয়া দেয়। কোন্‌দিন কাহার এরূপ ভাব বিনিময় হইবে তাহা সহসা অনুমান করা অসম্ভব।

সাধুসঙ্গের গুণ বলিয়া শেষ করা যায় না। তুলসী নিজের জীবনে ইহা বিশেষরূপেই বুঝিয়াছেন। সাধুর মণ্ডলীকে তিনি বলিয়াছেন তীর্থরাজ প্রয়াগ। গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনে প্রয়াগ তীর্থ। সাধুর সমীপেও জ্ঞান-বৈরাগ্য-ভক্তির মিলনক্ষেত্র। প্রয়াগে সিদ্ধবট আছে। সাধুর কাছে বিশ্বাস সেই সিদ্ধবট। তীর্থরাজের সেবার ফল পরলোকে পাওয়া যায়। সাধু-সেবার ফল এই জীবনেই অনুভব করা যায়। কুতার্কিক, অভিমানী, দুশ্চরিত্র, সাধুসঙ্গে সদালাপে নিরভিমান এবং সাধনসম্পন্ন হইয়া যায়। বাল্মীকির পূর্ব জীবন স্মরণ কর। রত্নাকর দস্যু নারদের সঙ্গগুণে রামায়ণ রচয়িতা মুনি বাল্মীকি হইয়াছেন। দাসী গর্ভজাত পাঁচ বৎসরের বালক সাধুর কৃপায় দেবর্ষি নারদ হইয়াছেন। সাধুসঙ্গ ভিন্ন জ্ঞান হইতে পারে না। ভগবানের কৃপা ভিন্ন সাধুসঙ্গ পাওয়া যায় না। অকপটভাবে সাধু-সেবা না করিলে হৃদয় সাধুগণের গুণাক্রান্ত হয় না। সাধুগণ যদিও সকলের প্রতি সমভাব রক্ষা করিয়া

চলেন তথাপি অনেক সময় আমরা নিজেদের অভিমানে আবৃত থাকার ফলে সাধুসঙ্গের যথার্থ ফলের অনুভব হইতে বঞ্চিত থাকিয়া যাই।

তুলসীদাসের পত্নী সঙ্গে যাইতে চাহিলেন। তিনি তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়া আদর্শ বৈরাগ্যের পরিচয় প্রদান করিলেন। সাধুসঙ্গে তাহার মন অন্যরূপ হইয়া গিয়াছে।

তুলসীদাস গঙ্গার পরপারে শৌচে যান। অতি প্রত্যুষে প্রতিদিন এই নিয়ম। শৌচক্রিয়ার পর ঘটীতে যে জল অবশিষ্ট থাকে উহা তিনি একটা গাছের গোঁড়ায় ঢালিয়া দেন। এই গাছটিতে এক প্রেত থাকে। সে প্রতিদিন সাধুর হাতের জল পাইয়া সন্তুষ্ট। একদিন সে মুক্ত হইয়া গাছটি ছাড়িয়া চলিয়া যায়—। তখন সাধুকে দেখা দিয়া সে বলে—সাধু প্রবর, শৌচের শেষ আপনার হাতের জল পাইয়া আমার বড়ই সন্তোষ হইয়াছে। আমার প্রেতত্ব ঘুচিয়া গেল। বলুন, প্রতিদানে আমি আপনার কি উপকার করিতে পারি।

তুলসীদাস বলেন—ভাই, আমি আর কিছু চাই না। যদি রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার কোনো উপায় থাকে, তাহা বলিয়া দাও। সে বলে—সাধু সে ক্ষমতা আমার নাই। তবে শুনিয়াছি—কর্ণঘণ্টায় রামায়ণ কথা হয়। সেখানে প্রতিদিন রামভক্ত হনুমান্ আগমন করেন। তিনি বৃদ্ধ শীর্ণদেহ ব্রাহ্মণের বেশে সকলের আগে আসিয়া রামায়ণ-কথা শুনিবার আশায় বসিয়া থাকেন। কথা সমাপ্ত হইলে সকলের শেষে ভক্ত পদধূলি অঙ্গে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া যান। তাঁহাকে ধরিতে পারিলে তিনি উপায় বলিয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাকে ভিন্ন রাম-দর্শন হইবার নয়।

বহু জন সমাগম। মধুর কণ্ঠে রামায়ণ গান হইতেছে। সেই মধুর ধ্বনি যেন অমৃতের সুরধুনী। কেহ হাসিতেছে—কেহ কাঁদিতেছে। দেশ

স্ত্রীলোকেরা পুষ্পমাল্য আনিয়া উপহার দিতেছে। কেহ ফল দিতেছে, কেহ প্রণাম করিতেছে। কেহ ধূপ দীপ লইয়া আরতি করিতেছে 'জয় সীতা রামচন্দ্রকী জয়' বলিয়া ঐ দেখ সকলে মিলিতভাবে প্রণাম করিল। একে একে সাধুগণ আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। ধীর পদবিক্ষেপে তাঁহারা রামচন্দ্রের গুণ স্মরণ করিতে করিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। এক বৃদ্ধ সকলের পরে যাইতেছেন। সাধুগণের পদধূলি অঙ্গে ধারণ করিয়া তাঁহার কত আনন্দ! তিনি গড়াগড়ি দিলেন -যে পথে সাধুগণ যাইতেছেন সেই পথের উপর। কি অদ্ভুত প্রেম! সর্বঅঙ্গ তাঁহার পুলকিত। নেত্রে অশ্রুধারা প্রবাহিত।

তুলসীদাস দেখিলেন -দেখিয়া বুঝিলেন--এই ব্যক্তি ছদ্মবেশী মহাবীর হনুমান্। মনের বেগ হইতেও দ্রুতগামী, বাতাসের সমান বেগবান্, বালব্রহ্মচারী, শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান, পবনকুমার, বানরযূথ সেনাপতি রামচন্দ্রের প্রধান দূত অঞ্জনানন্দন এই হনুমান্। আমি ইঁহার শরণ গ্রহণ করি।

সপ্তচিরজীবী মধ্যে হনুমান্ অন্যতম। রামচন্দ্র লীলা সঙ্গোপন সময়ে হনুমান্ বলিয়াছিলেন -প্রভু, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে লইয়া যাও। তুমি চলিয়া গেলে আমি একাকী থাকিতে পারিব না। রামচন্দ্র বলিলেন--যেখানে আমার লীলাকথা হইবে সেইখানে তুমি থাকিও। তাহা হইলে কথাময় আমার স্বরূপের সঙ্গে নিত্যই তোমার যোগাযোগ থাকিবে। আমার বিরহ-দুঃখ তোমার কষ্টদায়ক হইবে না। প্রভুর আদেশ অনুসারে আজও মহাবীর উপস্থিত হইয়া রঘুনাথ-কথা শুনিয়া থাকেন। তাঁহার চক্ষুতে প্রেমাশ্রু, অঙ্গে আনন্দ পুলক। তুলসীদাস তাঁহার পদ চাপিয়া ধরিলেন।

তিনি বলেন--তুমি কে হে, আমার পায়ে হাত দিয়ো না ভাই। যাইতে দাও। তুলসী বলেন—আপনাকে আমি চিনিয়াছি। আমাকে

এক প্রেত উপদেশ করিয়াছে। আপনার কৃপা না হইলে যে আমি রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে পারিব না। বলুন, কি উপায়ে প্রভুর দেখা পাই ? তাঁহার দেখা না পাইলে যে আমার এই মনুষ্যদেহ ধারণ বৃথা।

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশ মহাবীর বলেন—তুলসী, তোমার আগ্রহ দেখিয়া আমি সুখী হইলাম। তুমি প্রভুর দর্শন পাইবে। তবে তাঁহার দর্শনেব মূল্য সাধু-সেবা। সাধুগণ তাঁহার পরম আত্মীয়। তিনি নিজের শরীর হইতেও সাধুগণের শরীর বেশী ভালবাসেন। তাহাদেব হৃদয় ভগবানের বিশ্রামের ঘর। সাধুদিগের সেবা করিলে তাঁহারই সেবা হয়। তুমি যাও, চিত্রকূটে সাধুগণের মণ্ডলী আছে। সেখানে তাহাদের কোনো একটি সেবা নিয়মমত করিতে থাক। রামচন্দ্র অবশ্য দর্শন দিবেন।

চিত্রকূট পর্বতে বহু সাধুর আশ্রম। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেখিবে সাধুগণের গমনাগমন। কেহ আসিতেছেন, কেহ যাইতেছেন। সকলের মুখেই তারকব্রহ্ম নাম। তাহারা চলন্ত মন্দিরের মত পবিত্রতা ছড়াইয়া এই স্থানটিকে সুতীর্থরূপে পরিণত করিয়াছেন। নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া তাহারা সমবেত ভাবে যখন ভজন গান করিতে বসেন, তখন এক অপূর্ব আনন্দ উৎসব। প্রতিদিন এই সাধুমণ্ডলী রামকথা রস আস্বাদ করেন। তুলসীদাস এখানে আসিয়াছেন। সাধুদের আজ্ঞায় তিনি একটি সেবা পাইয়াছেন। প্রতিদিন তিনি চন্দন ঘর্ষণ করিয়া দেন। রামায়ণ-কথার সময় সেই চন্দন বক্তা, শ্রোতা ও সাধুদের দেওয়া হয়। চন্দন ঘর্ষণের সময় তুলসীর নেত্রে জল আসে। সে ভাবে—আর কতদিন—আমার ভাগ্যে সেই কমললোচন রামের দর্শন হইবে কি ? আমার যে কোনোরূপ ভজনের যোগ্যতা নাই। তাঁহার করুণা ভিন্ন আমার গতি দেখি না।

চক্ষুর জল গড়াইয়া চন্দন শিলার উপর পড়ে ; চন্দনের সহিত তাঁহার প্রেম উৎকণ্ঠার অশ্রুধারা মিশ্রিত হয়। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। প্রেমময় ভগবান্ তুলসীদাসের উৎকণ্ঠার গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন। তাঁহার প্রেম চরম সীমায় পৌছিয়াছে। রামচন্দ্র আর ধৈর্য ধারণ করিতে পারিলেন না। সেবক যখন প্রভুর জন্য কাঁদিয়া আকুল হয়, তখন কি আর প্রভু তাহার প্রভুত্ব বজায় রাখিতে পারেন ? তিনি ভক্তের সঙ্গে সমবেদনা প্রকাশ করিতে আসিয়া সমান হইয়া যান।

রাম আসিলেন। তুলসী চন্দন ঘষিতেছেন। চক্ষু চাহিয়া দেখিলেন না। তাঁহার আবেশ সাধুসেবার চন্দনে। দৃষ্টি সেখানে নিবদ্ধ। রামচন্দ্র নিজের হাতে শিলা হইতে চন্দনপঙ্ক লইয়া তিলক করিতেছেন, গায়ে মাখিতেছেন। তুলসী, একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ! তোমার সাধনার ধন চিরাকাঙ্ক্ষিত মাণিক তোমার চক্ষুর সম্মুখে!

তুলসী এখনো বুঝেন নাই—দেখেন নাই। হঠাৎ একটি পাখীর শব্দে তাঁহার চমক ভাঙ্গিল। পাখীটি কি বলিতেছে ?--

চিত্রকূটকে ঘাটপর ভই সন্তনকী ভীর।
তুলসীদাস চন্দন ঘিসৈঁ তিলক দেত রঘুবীর॥

আরে তুলসীদাস, তুমি তো চন্দন ঘষিতেছ। চাহিয়া দেখ, তোমার শিলা হইতে চন্দন লইয়া রাম তিলক করিতেছেন! তুলসীদাস চাহিয়া দেখিলেন। কেহ কোথাও নাই। বুঝি রামচন্দ্র লুকাইয়া আসিয়া ভক্তের সঙ্গে এই খেলা খেলিয়া গেলেন। বৃক্ষ-শাখায় পাখীটি আর কেহ নয়। সাধকের চিরসঙ্গী গুরুমূর্তি রামভক্ত মহাবীর।

ছয় মাস অতীত হইয়া গেল। মহাবীর বলিয়াছেন, চিত্রকূট পর্বতে ছয় মাস ভজন করিলে রামের দর্শন হইবে। আকুল আগ্রহে তুলসীদাস ভজন করিতেছেন। রামচন্দ্র তো দর্শন দিতেছেন না। তিনি মন্ত্র

জপ করেন আর ভাবেন—বুঝি আমার কোনো দোষ আছে, তাহাতেই মন্ত্র সিদ্ধি হইতেছে না। হঠাৎ বনের মধ্যে তুলসী দেখিলেন—দুইটি যুবক ঘোড়ার পিঠে চাপিয়া ধনুর্বাণ হাতে ছুটিয়া যাইতেছে। তুলসী মনে করিলেন, সেই দেশের কোনো রাজপুত্র হইবে। এই ভাবিয়া তিনি আপন কাজে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে মহাবীর উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন—কি তুলসী দর্শন হইল? তখন তুলসীর ভ্রম ভাঙ্গিল। তিনি বলেন—তাইতো আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই। আমি বরং অন্যদিকে মুখ করিয়া চলিয়া আসিয়াছি। আহা, আমি এ কি করিলাম? আমার চক্ষু আমার শত্রুতা করিয়াছে। অলক্ষ্য ভগবান্ আমার নয়ন গোচর হইলেন। জাগ্রত অবস্থায়ও আমি নিদ্রিতের মত রহিলাম।

কর্মহীন নৈ পায় হীরা দয়ো পলমে খোয়।
দাস তুলসী রাম বিছুরে কহো কৈসী হোয়॥

আমার কর্ম মন্দ তাহাতে বহুমূল্য রত্ন পাইয়াও উহা পলকে হারাইয়া ফেলিলাম। বল, তুলসীদাস রামকে ছাড়িয়া কি করে, তাহার গতি কি হয়?

মহাবীর তাঁহার আকুলতা দর্শনে বিগলিত হইলেন। তিনি বলেন—তুমি ভাবিও না, আবার তুমি অচিরেই দর্শন লাভ করিবে।

কিছুদিন পর তুলসী দেখেন মহাসমারোহ। মধুর বাদ্যধ্বনি। জন-কোলাহল। বহুলোক সমবেত। তিনি অগ্রসর হইলেন। বিরাট্-সভা। দিব্য সিংহাসনে রামসীতা উপবিষ্ট। লক্ষ্মণ একপার্শ্বে অবস্থান করিতেছেন। রামলীলা অভিনয়। রাবণ বধ পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে। এখন বিভীষণের রাজ্যাভিষেক হইবে। রামচন্দ্র স্বয়ং তাহাকে রাজতিলক পরাইয়া দিলেন, তুলসী তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন। তাহার কুটিরে যাইবার সময় হইয়াছে। তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন, পথে এক

ব্রাহ্মণের সহিত সাক্ষাৎ। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করেন—তুলসীদাস, কোথা হইতে আসিলে? তুলসীদাস বলেন—আজ্ঞে, এই তো রামলীলার অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। ব্রাহ্মণ বলেন—সে কি, তুমি যে পাগলের মত কথা বলিতেছ। রামলীলা হয় আশ্বিন মাসে। এ সময় তুমি রামলীলা অভিনয় দেখিলে কোথায়? তুলসীদাস বলেন—আপনি কিছুই খবর রাখেন না। এই যে আমি দেখিয়া আসিলাম। আপনি যদি দেখিতে ইচ্ছা করেন আমার সঙ্গে চলুন। ব্রাহ্মণ বলেন—তবে চল সাধু, দেখাই যাক্।

তিনি ব্রাহ্মণকে লইয়া পূর্বদৃষ্ট স্থানে উপস্থিত। কোথাও কিছু নাই। শূন্য বন। একি, রামলীলা দল কোথায় গেল? অভিনয় কি শেষ হইয়া গেল? ব্রাহ্মণ বলিলেন—সাধুজী, এখনো তোমার ভ্রম দূর হয় নাই? তুলসীদাস বুঝিলেন, মহাবীর রামচন্দ্রের দর্শন হইবে বলিয়া যে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন সেই কথা সত্য হইল। রামচন্দ্র কৃপা করিয়া ঐ ভাবে দর্শন দিলেন। সেই ব্রাহ্মণ ছদ্মবেশী মহাবীর কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

অযোধ্যায় আসিয়া তুলসীদাস রামচন্দ্রের লীলা বর্ণনা করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। তিনি প্রথমতঃ সংস্কৃত ভাষায় শ্লোক রচনা করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য, পূর্বদিনে যে শ্লোক রচনা হয়, পরদিনে দেখা যায়, ঐগুলি পত্র হইতে নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। এই ভাবে কয়েকদিন তাহার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়াতে তিনি ঐ সঙ্কল্প ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইলেন। তিনি এই ঘটনাকে কোনো উপদেবতার কার্য বলিয়া মনে করিতেছিলেন। হঠাৎ এক রাত্রিতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, প্রভু রামচন্দ্র স্বয়ং আদেশ করেন—তুলসী, তোমার মাতৃভাষায় আমার লীলা বর্ণনা কর। ইহাতেই তুমি অমর কীর্তি লাভ করিবে।

স্বপ্নাদিষ্ট সাধু প্রাদেশিক ভাষায় 'রামচরিত মানস' লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

সম্বৎ সোলহসৌ ইকতীশা।
করৌ কথা হরিপদ ধরি শীসা॥
নৌমী ভৌমবার মধুমাসা।
অবধপুরী যহ চরিত প্রকাশা॥

কিছুদিন যাইতে না যাইতে সাধুজী কাশীধামে আগমন করিতে বাধ্য হইলেন। অসি ঘাটে—লোলার্ককুণ্ডের তীরে থাকিয়া তিনি ভজন করেন। তাঁহার আগমনের পর কাশীধামে সর্বত্র রামকথাব প্রসার হইতেছিল। সেখানকার অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতগণের উহা ভাল লাগিল না। তাহারা সাধুর সহিত শাস্ত্র বিচারের জন্য প্রস্তুত। তাহারা বলেন—বেদ প্রতিপাদ্য বিষয় প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত হইলে শাস্ত্রের মর্যাদা লঙ্ঘন হয়। প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ লিখিবার প্রমাণ নাই। সাধু ধৈর্য ধারণ করিয়া তাহাদের আপত্তি শুনিলেন। তিনি তাঁহার স্বভাব সুলভ মধুর ভাষায় বলিলেন—

হর হরি যশ সুর নর গিরা
বর্ণহিঁ সন্ত সুজান।
হাণ্ডী হাটক চারু চির
রান্ধে স্বাদ সমান॥

দেব ভাষায় হউক আর মানুষের ভাষায় হউক, সাধু-জ্ঞানীর বর্ণনায় ভাষার জন্য হর এবং হরির মহিমার তারতম্য হয় না। হাঁড়ি মাটির বা সোণার হউক পাককরা খাদ্যদ্রব্যের আস্বাদ এক প্রকারই হয়।

পণ্ডিতগণ মধুসূদন সরস্বতীর নিকট এই কথা উত্থাপন করিলেন। ইনি বাঙ্গালী। ফরিদপুর জেলায় কোটালীপাড়া গ্রামে ইহার জন্ম। ইহার পিতা প্রমোদন পুরন্দর। পূর্ব আশ্রমে মধুসূদনের নাম ছিল কমলজনয়ন। ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন কালে গদাধর ভট্টের সঙ্গে তিনি নবদ্বীপ

ধামে হরিরাম তর্কবাগীশের ছাত্র ছিলেন। সেখান হইতে কাশীধামে আগমন করিয়া দণ্ডিস্বামী বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর নিকট বেদান্ত পাঠ করিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি শাস্ত্রবিচারে বহু পণ্ডিতকে পরাজিত করিয়াছেন। 'অদ্বৈতসিদ্ধি' গ্রন্থে তাহার সূক্ষ্ম বিচারের পরিচয় পাওয়া যায়। একদা এক পরমহংস সাধু ইঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আগমন করেন। তিনি সরস্বতীর শাস্ত্রার্থ বিচারের আগ্রহ দেখিয়া বলেন— আপনি অসঙ্গ সন্ন্যাসী। সব ছাড়িয়াছেন কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় অপরকে তর্ক যুদ্ধে পরাজিত করিবার অভিমানটিকে ছাড়িতে পারেন নাই; মধুসূদন এই নিষ্কিঞ্চন সাধুর কথায় স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। অপর কেহ এই জাতীয় কথা বলিয়া তাহার নিকট পার পাইত না। কি জানি কোন্ সাধনার বলে সেই মধুসূদনের মন আকর্ষণ করিলেন। সরস্বতী তখন সাধুর শরণাপন্ন। তিনি কৃষ্ণ ভজনের নিমিত্ত দীক্ষা গ্রহণ করিলেন এবং কৃষ্ণ উপাসনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

তুলসীদাসের কথা লইয়া পণ্ডিতগণ বিবাদ করিতেছিলেন। মধুসূদন বলিলেন—আপনারা তুলসীদাসের মহিমা এখনো বুঝিতে পারেন নাই। ক্রমে উহা বুঝিতে পারিবেন। আমি তাঁহাকে জঙ্গম-তুলসী বলিয়াই মনে করি। তুলসী-মঞ্জরীর গন্ধে আকুল ভ্রমর যেমন আসিয়া উপস্থিত হয়, ভক্তকবি তুলসীর কবিতা-মঞ্জরীর মধুলোভে রামচন্দ্রও তেমন ছুটিয়া আসেন।

পরমানন্দ পত্রোঽয়ং জঙ্গমস্তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রামভ্রমর ভূষিত।॥

স্বয়ং মধুসূদন সরস্বতীর মুখে তুলসীদাসের গুণের কথা শুনিয়া আর কোনো পণ্ডিত তাঁহার বিরোধিতা করিতে সাহসী হইলেন না।

সেদিন একটি লোক ভিক্ষা করিতেছে আর রাম নাম কীর্তন করিতেছে। তুলসীদাস স্নান করিয়া আসিবার সময় লোকটিকে

দেখিলেন। স্বভাব-করুণ সাধুর প্রাণে দয়া হইল; তিনি লোকটিকে ডাকিয়া নিজের আশ্রমে আনিলেন। তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল —মহাত্মন, আমি মহাপাপী। আমি গো-হত্যার পাতকী! আমার বুঝি আর কোনো উপায় নাই? আমার দেশের লোকেরা আমাকে দেখিলে মুখ ফিরাইয়া লয়। মনের দুঃখে আমি দেশ ত্যাগ করিয়া কাশীবাসে আসিয়াছি। মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি করিয়া হইবে তাহাই আমি ভাবিতেছি।

সাধু বলিলেন —তুমি ভগবান্ রামচন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিয়াছ। তোমার আর কোনো পাপ নাই। তাঁহার নামের মহিমা অপার। মানুষ যত পাপ করুক না, সে যদি অনুতপ্ত হৃদয়ে ভগবানের নামকে আশ্রয় করে, তাহার সমস্ত পাপ দূর হইয়া যায়। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠে প্রবেশ করিয়া তাহাকে দগ্ধ করে, হরিনামও সেইরূপ পাপীর পাপকে দগ্ধ করে। নরসিংহদেব প্রহ্লাদকে সকল প্রকার বিপদে রক্ষা করেন। কলিকালজনিত সকল দোষের মূর্তি হিরণ্যকশিপুর আক্রমণ হইতে নাম জপকারী প্রহ্লাদকে রামনাম নরসিংহ রক্ষা করেন। রামনাম রূপ মণিময় দীপ রসনার দ্বারে ধারণ কর, তোমার অন্তর বাহির উজ্জ্বল হইয়া যাইবে। অপর সকল সাধনা শূন্য। রামনাম অঙ্ক। অঙ্কের সহিত প্রত্যেকটি শূন্য বৃদ্ধির সঙ্গে উহার মূল্য প্রতিবারে দশগুণ করিয়া বৃদ্ধি হয়। ভগবানের নামের সহিত সংযোগ রাখিয়া যত যত সাধন করিবে, তাহাতে দশগুণ অধিক অধিক ফললাভ হইবে। নামের যোগ না থাকিলে অপর সাধন নিস্ফল। তুমি সকল পাপহরণ রামনাম উচ্চারণ করিয়াছ, তুমি নিষ্পাপ। তুমি আমার আশ্রমে থাকিয়া ভজন কর।

পণ্ডিত ব্রাহ্মণগণ শুনিলেন গো-হত্যাকারী এক ব্যক্তি আশ্রমের সাধুদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করিতেছে। শুধু তাহাই নহে, তাহাদের

সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করিতেছে। তখন তাহারা এই বিষয়ে বিচার করিবার জন্য এক সভা আহ্বান করিলেন। তুলসী সেখানে আহুত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণ বলেন—সাধুজী, আপনি এই গো-হত্যাকারী মহাপাপী লোকটাকে কি ভাবে শুদ্ধ করিলেন? শাস্ত্র অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত না হইলে ইহাকে লইয়া যাহারা ব্যবহার করিবে তাহারাই যে পাপমলিন হইবে।

তুলসীদাস বলেন—আপনারা শাস্ত্র পাঠ করিয়া সেগুলি কি একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন? শাস্ত্রের উপদেশ যদি ব্যবহারে না আসিল ঐ গুলি শিখিবার কি প্রয়োজন ছিল? হরিনাম মহিমা আপনারা দেখেন নাই?

সুজাতি কুজাতি হয় যদি হরি নাহি ভজে।
কুজাতি সুজাতি হয় যদি হরিরসে মজে॥

ঋতম্ভর রাজা গো-সেবা করিতেন। একদিন তিনি অন্যমনস্ক হইয়া বনশোভা দেখিতেছেন সেই সময় একটি সিংহ অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিয়া তাহার গাভীটিকে মারিয়া ফেলে। জাবালি মুনির নিকট রাজা ঋতম্ভর ইহার প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি বলেন—রাজন্, জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপূর্বক গো-হত্যা করিলে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই। যে জানিয়া শুনিয়া ভগবানের নিন্দা করে তাহারও উদ্ধার নাই। ভগবানের নিন্দাকারী এবং গো-মাতার দুঃখদায়ক ইহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। অজ্ঞানকৃত গো-বধের প্রায়শ্চিত্ত আছে। রাজা ঋতুপর্ণ এ বিষয়ে তোমাকে উপদেশ দিবেন। তাহার কাছে যাও। জাবালির উপদেশে ঋতম্ভর ঋতুপর্ণের শরণাপন্ন হইলেন। তিনি বলেন—মহারাজ, কোথায় পণ্ডিত মুনিসমাজ আর কোথায় মূর্খ আমি। শাস্ত্রমর্ম আমি কি জানি তবু মনোযোগ করিয়া শুনুন—

ভজ শ্রীরঘুনাথং ত্বং কর্মণা মনসা গিরা।
নৈষ্কাপট্যেন লোকেশং তোষয়স্ব মহামতে॥

সন্তুষ্টো দাস্যতে সর্বং তব হৃৎস্থং মনোরথম্।
অজ্ঞানকৃত গোহত্যাপাপনাশং করিষ্যতি॥ ( পঃ পাঃ ১৯ অঃ )

কপটতা ত্যাগ করিয়া হে রাজন্, কায়মনোবাক্যে আপনি শ্রীরামচন্দ্রকে ভজন করুন। তাঁহারই সন্তোষ বিধান করুন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া আপনার সমস্ত কামনা পূর্ণ করিবেন এবং অজ্ঞানকৃত গোহত্যার পাপ দূর করিবেন।

এই ব্যক্তি রামনাম উচ্চারণ করিয়া সকল প্রকার পাপ-নির্মুক্ত হইয়াছে। এ বিষয়ে যদি এখনো আপনাদের সন্দেহ থাকে তবে বলুন কি করিলে আপনাদের বিশ্বাস হয়?

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—বেশ তো, আপনার কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার শরীরে তো আর পাপ নাই। বাবা বিশ্বেশ্বরের ষাঁড় যদি ইহার হাতের নৈবেদ্য গ্রহণ করে, তবেই পরিষ্কার প্রমাণ পাওয়া যাইবে এ ব্যক্তি নিষ্পাপ। বিচারে স্থির হইল সেই ব্যক্তি নৈবেদ্য লইয়া যাইবে। পাথরের ষাঁড় কি আর আহার করে? এতো একেবারে অসম্ভব।

তুলসীদাস ভগবানের ভোগ লাগাইয়া প্রসাদ নৈবেদ্য লোকটির হাতে দিয়া বলিলেন—রামনাম লইয়া নিঃসন্দেহে তুমি বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরদ্বারে যাও। দেখিবে ষাঁড় নিজেই এই প্রসাদ হাত হইতে কাড়িয়া খাইবে। সত্য সত্যই যখন বহুলোকের মাঝখানে এই ব্যাপার ঘটিল তখন দর্শক সকলেই "জয় জয় রামচন্দ্রকী জয়" বলিয়া স্থানটিকে মুখরিত করিয়া তুলিল। নাম সম্বন্ধে যাহার মনে যেটুকু সন্দেহ ছিল, দূর হইয়া গেল। ব্রাহ্মণগণ তুলসীদাসের মহিমায় চমৎকৃত হইয়া গেলেন।

কাশীধামে নানাশ্রেণীর সাধু আছেন। ক'দিন হইল একজন অলখিয়া আসিয়াছেন। ইহারা "অলখ্ নিরঞ্জন" নিরাকার ব্রহ্মোপাসক, পথে

রাস্তাতে যাইতে মাঝে মাঝে "অলখ্, অলখ্" বলিয়া চিৎকার করেন। তুলসীদাসের আশ্রম-দ্বারে আসিয়া সেই সাধুটি বার বার বলিতেছেন —বাবা, অলখ্ বল, অলখ্ বল। তুলসীদাস তাহার কথায় কানও দেন না। তিনি নিজের কাজ করিতেছেন। অলখিয়া সাধুটি তুলসীদাসের অমনোযোগিতা দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন। তিনি বলেন—তুমি তো সাধুর বেশ ধারণ করিয়া খুব লোক ঠকাইতেছ। অলখ্‌কে লক্ষ্য কর না, লোকের কাছে সাধু বলিয়া পরিচয় দাও। তোমার লজ্জা নাই?

তুলসীদাস গালি শুনিয়া বলেন—

হম লখ হমহি হমর লখ, হম হমার কে বীচ।
তুলসী অলখ হি কা লখৈ, রামনাম জপু নীচ॥

আমার মায়ার মধ্যে মূর্তিমান আমার নিজেকেই দেখিতেছি। অলক্ষ্য অদৃশ্যকে দেখিতে পাই কোথায়? অতএব সাকার ভগবান্ রামচন্দ্রের নামই জপ কর।

তুলসীদাসের আবির্ভাব কালে নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্ম উপাসকের অভাব ছিলনা। ভারতক্ষেত্রে কোনো কালেই এরূপ নিরঞ্জন উপাসকের অভাব নাই বা ছিল না। উপনিষদ্ জ্ঞানে প্রতিষ্ঠ সদাচার সম্পন্ন ব্রহ্মবাদীর সহিত সাকার উপাসক শ্রেণীর বাদানুবাদ,—যুক্তি তর্কের অবতারণা, বহু পূর্ব হইতেই চলিয়াছে। তাহা বলিয়া এক শ্রেণী অপর শ্রেণীকে কখনো হীন বলিয়া ঘৃণা করিয়াছে এরূপ প্রমাণ বিরল। রামচন্দ্রের একান্ত ভক্ত তুলসী অলখিয়াকে যে 'নীচ' বলিয়া গালি দিয়াছেন, তাহার যথার্থ তাৎপর্য কি তাহা বুঝিতে হইলে সেই সময়ের সামাজিক পরিস্থিতির দিকে একটু লক্ষ্য করা প্রয়োজন।

তিনি কলিকালের একটি বর্ণনা দিয়াছেন। উহা মহাভারতে উক্ত কলিযুগধর্ম বর্ণনার ছায়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তবে উহার মধ্যেও



৫—

সমসাময়িক ভাবধারার সহিত পরিচিত হইবার মত দুই চারিটি ইঙ্গিত আছে উহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। তিনি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছিলেন সর্বত্র সদাচার লঙ্ঘন করা হইতেছিল। এমন একদল সাধু তখন প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন—যাহাদের আচার ব্যবহার ঠিক্ ঠিক্ বর্ণাশ্রম ধর্মের মাপকাঠি দিয়া বিচার করিলে অনেক দিক্‌দিয়া অমিল ছিল। সর্বত্র ধর্মনীতি শ্রদ্ধার সহিত অনুসরণ না করার ফলে এবং শাস্ত্র সদাচার মানিয়া না চলায় ধর্মানুশীলনে আসিয়াছিল শিথিলতা। তুলসী তাই আচরণহীন জ্ঞান বৈরাগ্যের উপরে অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন। যাহারা কোনোদিন শাস্ত্র চর্চা করে নাই, তাহারা যদি সমাজের ধর্ম-প্রবর্তক হয়, শাস্ত্র সদাচার পালনকারীর অন্তরে স্বাভাবিক ক্ষোভের উদয় হয়। তখন তিনি প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধ ভাব দেখিলে তীব্র ভাবে আক্রমণ করেন। তাহাতেই দেখিতে পাই চিরবিনয়ী নিরভিমান একান্ত ভাবে রামের শরণাগত আদর্শ ভক্ত তুলসীদাসও সমাজ শাসনের সুরে বলিয়াছেন—যাহারা বেদাচার মানে না, তাহাদের লোকে বলে জ্ঞানী। যাহারা অপবিত্র তাহারা হইল সন্ন্যাসী। আরো দেখ, কত কত নব্যমত দেখা দিয়াছে। সকলেই সদ্‌গুরু হয়। অসৎ আর কেহ রহিল না। কেবল বলে সৎসঙ্গ। ব্রহ্ম জ্ঞান ভিন্ন নরনারীর মুখে আর কোনো কথাই শুনা যায় না। সকলেই বলে—যে ব্রহ্ম জানে, সে-ই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই কি ব্রাহ্মণ হয় ?

সত্য সত্যই রামানন্দ স্বামীর শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে এরূপ একটি দল ক্রমশঃ পুষ্ট হইতেছিল যাহারা প্রচলিত ধর্মমতকে একেবারে উপেক্ষা করিয়াই চলিতেছিলেন। কবীর, রুইদাস, দাদূ, সুন্দরদাস, কামাল, রহীম প্রভৃতি সন্তগণ কেহই দ্বিজকুলে জন্মগ্রহণ করেন নাই। কেহ জোলা কেহ ধুনকর, কেহ শূদ্র, কেহ মুসলমান। ইঁহারা

ভাবুক এবং যোগসম্পন্ন সাধক ছিলেন। সাকাররূপে উপসনায় তাহাদের আগ্রহ বা প্রীতি ছিল না। তাহারা তাহাদের প্রেমাস্পদকে কেবল ভাবনার মধ্যেই ধরিতে চেষ্টা করিতেন। অদ্বৈতবাদের প্রভাব তাহাদের উপর যথেষ্টই ছিল। আর ইঁহারাই নিরঞ্জন নিরাকার ব্রহ্ম উপাসক ছিলেন। তাহারা রাম, কৃষ্ণ, হরি নাম বলিবেন অথচ ভগবানের বিগ্রহ মানিবেন না। মূর্তি স্বীকার করিবেন অথচ নামীকে মানিবেন না। আত্মার মধ্যে প্রেমময়ের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করিবেন কিন্তু ভক্তের অর্চা বিগ্রহে তাঁহাকে দেখিবেন না। তাহাদের মতে সর্বত্র ভগবান্ থাকিতে পারেন—জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্র রাম কিন্তু অযোধ্যাপুরীতে বা মন্দিরের বিগ্রহে রাম নাই। এরূপ একটা ভাব তুলসীদাস সহ্য করিতে পারেন না।

নিরাকার এবং সাকারের বিরোধ তিনি দেখিয়াছেন। উপনিষদে উভয় প্রকার বাক্য আছে। উভয় প্রকার ব্রহ্মনিরূপণ দেখিয়াছেন। তিনি এই বিরোধের সমাধান করিতেও যত্ন করিয়াছেন। তাহার রাম-চরিত-মানস গ্রন্থে দেবী শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করেন—প্রভু, বল তো তুমি যে রাম নাম জপ কর, উহা কি ঐ অযোধ্যার দশরথনন্দন রাম, না অপর কোনো তত্ত্ববাচক রাম? শঙ্কর বলেন—দেবি, তুমি বৃথা আমার প্রভুর সম্বন্ধে সন্দেহ করিতেছ। বেদ যাহার স্বরূপ নির্ণয় করিতে 'নেতি নেতি' বলেন সেই সর্বব্যাপক মায়াধিপতি পরব্রহ্মই নিজ ভক্তগণের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি দেহধারণ করিলেও স্বতন্ত্র।

তুলসীদাস রাম নামের মহিমা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

**অগুণ সগুণ দোউ ব্রহ্মসরূপা।**
**অকথ অগাধ অনাদি অনূপা॥**

মোরে মত বড় নাম দুহূত।
কিয় জোহি যুগ নিজ বশ নিজধূতে ॥

সগুণ ও নির্গুণ উভয় ব্রহ্মস্বরূপ অনির্বচনীয়, অগাধ, আদিরহিত, অতুলনীয়। আমার মতে নাম এতদুভয়েরও বড়। এই নাম সগুণ নির্গুণ উভয়কে আপন প্রভাবে বশ করিয়াছেন।

এমন অনেক সাধক আছেন যাহারা মূর্তিকে একটা উপলক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। তাহাদের সেই মূর্তি পূজার কোনো সার্থকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। কেন না যাহার সঙ্গে অল্প সময়ের জন্য ঔপাধিক সম্বন্ধ যে নিত্যপ্রিয় নয়, এরূপ মূর্তিপূজার প্রয়োজন কি? আর একপ্রকার লোক আছেন তাহারা বলেন--মূর্তি যখনই আসিয়াছে তখনই সে উপাধিক, ভঙ্গুর এবং ক্ষয়িষ্ণু হইয়াছে। কালাতীত নিত্য অখণ্ডকে পাওয়া হয় নাই। ইহারা আত্মাকে সর্বত্র দেখেন, শুধু ভক্তের আরাধ্য ভগবানের মূর্তির মধ্যেই দেখিতে নারাজ। তুলসীদাস অন্য ধরণের সাধু। জল, স্থল, অনল, অনিল, সর্বত্র দেখিয়াও তাঁহার রামকে তিনি নামের মধ্যে এবং বিগ্রহের মধ্যে অখণ্ড আনন্দ, অভিন্ন সত্য স্বরূপে দর্শন করিবার মত প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। অলখিয়া সাধুর সমীপে তিনি নামমহিমা বলিলেন।

অলখ পন্থী বলেন—জ্ঞানই আমার গুরুর দেওয়া কাঁথা, শব্দ সঙ্গীতই গুরুর দেওয়া ভেখ। আমার আত্মা হইল সন্ন্যাসী, হে দাদূ, আমার পন্থ হইল অলেখ।

জ্ঞান গুরুকা গূদড়ী সবদ গুরুকা ভেখ।
অতীত হমারী আতমা দাদূর পংথ অলেখ ॥

প্রসিদ্ধ মরমিয়া দাদূ ছিলেন এই অলখিয়াদের অন্যতম। তুলসী-দাসের সহিত সাক্ষাৎভাবে দাদূর দেখা শুনা না হইলেও উভয়ে এক সময়েই জীবিত ছিলেন এবং নিজ নিজ সাধনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

কেহ বলেন—দাদূ মুসলমান, কেহ বলেন হিন্দু। তিনি ধুনকরের কুলের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ইহাও কেহ কেহ উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি নিম্নশ্রেণীর ঘরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন এই বিষয়ে সকলেই এক মত। তিনি রামানন্দ স্বামীর শিষ্য শ্রেণীর অন্তর্ভূ'ত ছিলেন ইহাও সর্বসম্মত। মুসলমান প্রভাব যে তাহার উপর বিশেষ রূপেই ছিল তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। রামানন্দের শিষ্যগণের মধ্যে এই শ্রেণীর মরমিয়াগণ মুসলমান হউক বা অন্য কারণেই হউক দেবতার বিগ্রহকে প্রত্যক্ষ ভাবে মানিতেন না। তাহারা নামজপ, নামকীর্তন, প্রেম, ভক্তি, সদাচার, মানস পূজা, ভগবানের সহিত প্রেমময় সম্বন্ধ, প্রেমসেবা এবং তাহার নিত্যধামে নিত্যস্থিতি বৈষ্ণবীয় সাধনার সকলই স্বীকার করিতেন। প্রিয়তমের বিশিষ্ট আকার বা বিগ্রহ স্বীকার করিতেই তাহারা পশ্চাৎপদ হইতেন। তিনি সুন্দর কিন্তু তাহার রূপ থাকিবে না, তিনি নিত্য পূজা গ্রহণ করিবেন কিন্তু বিগ্রহ থাকিবে না, তিনি প্রেম করিয়া আলিঙ্গন করিবেন কিন্তু হাত থাকিতে পারিবে না। এইরূপ মতবাদ তুলসীদাসের মত ভক্তগণের নিকট বড়ই বিসদৃশ ঠেকিত।

বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃত রূপের বিবেচনা করিয়া ভগবানের রূপ প্রাকৃত নয়—অপ্রাকৃত, এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উহাও অলখ নিরঞ্জন-বাদীর বোধগম্য হয় না। তাহারা সব কিছুর শেষ সেই অলখকেই নিরূপণ করেন। ইহা ভক্তগণের প্রেম সাধনার পথে প্রেম-সেবার প্রতিকূল সিদ্ধান্ত; তাই তুলসীদাসের সহিত অলখিয়াদের মিল হয় না। অলখিয়া সাধু তুলসীদাসের কথা শুনিলেন। তাঁহার সদাচার নিষ্ঠা, সদা সহাস্যবদন ও ভজনের প্রভাব অলখিয়ার প্রাণে বিগ্রহসেবার উপযোগি রসধারা প্রবাহিত করিয়া দিল। সে ভগবানের নাম-মহিমা শুনিয়া চমৎকৃত হইয়াছে। বিগ্রহ-সেবায় প্রীতি ব্যবহারের

পরিচয় পাইয়া ধন্য হইয়াছে। সে ভাবিল—মানুষের প্রাণে সরস ভাবের উদয়নে বিগ্রহ সেবা ভিন্ন আর কোনো সাধনা কার্যকরী হইতে পারে না। অব্যক্ত উপাসনায় অধিকতর ক্লেশ ভিন্ন আর কিছু নাই। পরম পুরুষ ভগবানের ব্যক্ত স্বরূপের আরাধনায় পরম আনন্দ ও ভজনের অনায়াসসিদ্ধতা।

কোনো কোনো সাধক যোগসিদ্ধির বলে ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়। এরূপ উন্নতি অল্পদিন স্থায়ী। কিছুদিন মধ্যে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য তাহারই দুঃখের কারণ হয়। কেহ কেহ রোগ সারাইবার ক্ষমতা পায়। ইহা কিছুদিন পর আর থাকে না। কর্ণপিশাচী সিদ্ধিবলে ভূত ভবিষ্যৎ বলা যায়। যক্ষ-সিদ্ধিতে অর্থপ্রাপ্তি হয়। বগলা-সিদ্ধি অপরের স্তম্ভনশক্তি দেয়। বশী কৌটায় অপরে বশ হয়। মাদুলীর বলে অসাধ্য সাধন হয়। কাশীতে এরূপ দ্রব্য ও মন্ত্রের সিদ্ধি অনেকের আছে।

তুলসী রামদাস। ঐশ্বর্যের কাঙ্গাল নহেন। রোগ সারাইবার বাহাদুরী লইতে তিনি নারাজ। ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া ভয় দেখানো তিনি ঘৃণা করেন। অর্থে তিনি নিস্পৃহ। অপরকে বাগ্‌যুদ্ধে পরাজিত করিবার আকাঙ্ক্ষা তাহার নাই। তিনি বশীকরণ জানেন না। তিনি আদর্শ বৈরাগী--সঙ্গত্যাগী।

অদ্ভুত কোনো ব্যাপার ঘটিতে দেখিলেই উহা যেন কেহ যোগ-সিদ্ধি বলিয়া ভুল না করেন। সিদ্ধি অনেক রকম হইতে পারে। জন্মসিদ্ধি অনায়াস লব্ধ। পশুপক্ষীর দূর দর্শন, শ্রবণ বা তীব্র ঘ্রাণ-শক্তি প্রভৃতি জন্মসিদ্ধি। একটি কাক ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা করিয়া দিতে পারে তাহার জন্মসিদ্ধির বলে। মানুষ পাণ্ডিত্য বলেও সেই ভবিষ্যৎ বিষয়ে সঠিক নির্ধারণ করিতে অসমর্থ। ভবিষ্যৎ বিপদের সূচনা করে বলিয়া কাককে কেহ সাধু বলে না। বিড়াল অন্ধকারে দেখিতে পায় বলিয়া

সাধু নয়। কুকুর দূর হইতে অপরিচিতের গায়ের গন্ধে তাহার প্রভুকে সন্ধান করে বলিয়া সাধু হইতে পারে না। রাসায়নিক পদার্থের সংযোগে অগ্নি প্রজ্বলিত করে বলিয়া বাজীকর যাজ্ঞিক সাধু নয়। গাছের শিকর হাতে রাখিয়া সাপের সঙ্গে খেলা করে বলিয়া বেদেকে কেহ সাধু বলিয়া আদর করে না। চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগে মুমূর্ষু রোগীকে সুস্থ করেন বরিয়া যোগসিদ্ধ নহেন। ইহাকে বলা হয় ঔষধের গুণ। অনেক সময় দেখা যায় সাধারণ কথার কতগুলি মন্ত্র আছে, তাহা দ্বারা অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটে। কর্ণপিশাচী আসিয়া কানের কাছে অজানা অতীতের কথা বলিয়া দেয়, মন্ত্রবলে একটি বৃক্ষকে মারিয়া ফেলে, মন্ত্রবলে শরীরের বিষ দূর করে, তাহা বলিয়া এই সব মলিন মন্ত্র প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে সাধু বলা উচিত হইবে না, এগুলি মন্ত্রসিদ্ধি। অসাধারণ মন্ত্রসিদ্ধির প্রক্রিয়া অসাধারণ। সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবে একজনের রোগ কিছুকালের জন্য সারানো যায়, কাহারও উপর নিজের ইচ্ছাকে চালিত করা যায়, একজনের সঙ্কল্পে আর একজন ইচ্ছামত স্বপ্ন দেখে। ইহা সঙ্কল্পসিদ্ধি যথার্থ সাধুতা নয়। ইহারা সাধু হইলে বাজীকরেরাও সাধু হইতেন। সাধুতা লোকের নিকট চমৎকার ঘটনা দেখানোর বহু উর্দ্ধে। সমাধির অসীম আনন্দে যখন সাধুর মন ডুবিয়া যায় তখন জাগতিক কোনো প্রকার সম্বন্ধ তাহার নিকট অভিলষিত থাকে না। কেবল ভগবানের সম্বন্ধই তাহার প্রধান হইয়া উঠে। দম্ভ, অভিমান, লাভ, পূজা, প্রাপ্তি, অপ্রাপ্তি, আদর, অনাদর, এই সকলের বহু দূরে তাহার মনের গতি হয়। প্রকৃত সাধু নির্ভিক, ভগবৎ অনুসন্ধান তৎপর। ঋতুরাজ বসন্তের মত সর্বপ্রকারে সুখদায়ক সাধুগণ সর্বদাই জনগণের মঙ্গল বিধান করিবার জন্য নিযুক্ত। তাহারা নিজেরা ভব সমুদ্রের পারে যাইয়া অপর জীবের জন্য পারের নৌকা রাখিয়া যান।

সাধুগণের সঙ্গে এই সকল যোগসিদ্ধিকামীদের কিছুদিন ধরিয়া বাদ প্রতিবাদ চলিয়াছে। শাস্ত্রবিচারে যোগীদের পরাজয় হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে এক গুরু স্থানীয় ব্যক্তি তিনি যোগিনী সিদ্ধ। রাজ-প্রতিনিধি এক উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইহাদের পরিচিত। যোগিনী সিদ্ধাই সেই লোকটিকে দিয়া সাধুদের অত্যাচার আরম্ভ করাইলেন। যোগিনীকে তাহাদের বিরুদ্ধে লাগাইলেন। তাহারা সাধুদের মালা ছিঁড়িয়া তিলক মুছিয়া যথেচ্ছ অত্যাচার করিতে লাগিল। সিদ্ধাই তাহার প্রবল পরাক্রমী শিষ্যটিকে লইয়া স্বয়ং তুলসীদাসের আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। তাহারা এই সাধুর মালা ছিঁড়িয়া তাহাকে অবমানিত করিবেন, এই পরিকল্পনা। আশ্রম দ্বারে আসিতেই তাহারা দেখিলেন ভয়ঙ্কর দর্শন দীর্ঘাকৃতি এক পুরুষ ত্রিশূল লইয়া আগন্তুকদের আক্রমণ করিতে আসিতেছে। ঐ মূর্তি দেখিয়া যোগী ও তাহার শিষ্য উভয়েই ভয় পাইয়া ত্রাহি ত্রাহি চিৎকার করিতে লাগিলেন।

তুলসীদাস আশ্রমের বাহিরে আসিয়া তাহাদিগকে দেখিলেন। তখন আর বিভীষিকা নাই। যোগী ও তাহার শিষ্য মহাত্মার অদ্ভুত প্রভাব দর্শনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তুলসীদাস তাহাদিগকে বলিলেন —সাবধান, নিরীহ সাধুদের বিরুদ্ধতা করিও না। যাহাদের মালা কাড়িয়া লইয়াছ, তাহাদিগকে উহা ফিরাইয়া দাও। ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাদিগকে সন্তুষ্ট কর। নতুবা উদ্ধারের আর উপায় নাই। সাধুগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান নিজ পার্ষদগণকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাদের সঙ্গে বিরোধ করা মূর্খতা।

মাঘমাস। সে বৎসর অত্যন্ত শীত পড়িয়াছে। গঙ্গা স্পর্শ করে কার সামর্থ্য। এই বিষম শীতের দিনে অতি প্রত্যুষে তুলসীদাস নিয়মিত গঙ্গাস্নান করেন। কটি-পর্যন্ত জলে ডুবাইয়া তিনি গঙ্গাতে দাঁড়াইয়াই

প্রাতঃসন্ধ্যা করেন। এক পতিতা নারী সেদিন ভোরের বেলা গঙ্গাস্নানের জন্য আসিয়াছে। সে দাঁড়াইয়া বলিতেছে— তাই তো, যে শীত কি করিয়া জলে নামি। এই সাধুটি তো বেশ নির্বিকার চিত্তে জলে দাঁড়াইয়া আছে। ধন্য এঁরা সব জীবন্মুক্ত। দেহের শীত গ্রীষ্ম বোধ এঁদের কিছুই নাই। যত শীত আমাদের জন্য। আমরা পাপী, তাই আমাদের অত সুখ দুঃখের চিন্তা।

পতিতার কথাগুলি তুলসীদাস শুনিয়াছেন। তিনি কার্য সমাধা করিয়া জল হইতে উঠিয়া আসিলেন। গঙ্গা ছিটা দিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিতে লাগিলেন। তাহার হাতের জলের ছিটা একটু সেই পতিতার গায়ে গিয়া পড়িল। মহাপ্রাণ সাধুর স্পর্শে সেই জলের এরূপ প্রভাব দেখা গেল যে, সেই পতিতার মন তৎক্ষণাৎ পবিত্র হইয়া গেল। সে যেন ক্ষণেকের মধ্যে তাহার জীবনের ভূত ভবিষ্যৎ দেখিয়া লইল, সংসারের পাপ মোহ তাহার দূর হইয়া গেল। সে ধীরে ধীরে আসিয়া সাধুজীকে প্রণাম করিল। সে বলিল—মহাত্মন্ আমি আপনার শরণাগত। সাধু বলিলেন—রাম নাম জপ কর। পতিতা সেই হইতে রাম নাম জপ করে। সে পরম সাধু হইয়াছে।

একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ নাম ইন্দ্রজিৎ। তিনি বিদ্যার গর্বে গর্বিত। তাহার ইচ্ছা সমস্ত পণ্ডিতকে তিনি বশীভূত করিয়া রাখেন। তিনি তান্ত্রিক অভিচার যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। তন্ত্রোক্ত এরূপ বহু অনুষ্ঠান, আছে, যাহাতে অপরকে বশীভূত করা যায়, এমন কি তাহার বিষম অনিষ্ট সাধন করা যায়। সাধুগণ এ সকল অনুষ্ঠান অনুমোদন করেন না। লোক হাতে রাখিবার কৌশলরূপে কপটাচারী এই সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। যজ্ঞের ফলে কেশবভট্ট বলিয়া এক পণ্ডিত মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাহার প্রেতত্ব লাভ হইল।

তিনি এক গ্রন্থ লিখিতেছিলেন নাম রামচন্দ্রিকা। গ্রন্থ শোধন কায বাকী ছিল। পণ্ডিত প্রেত হইয়া এক বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। পথের ধারে সেই বৃক্ষ। পথিক সেখান দিয়া যাইতে ভয় পায়। মাঝে মাঝে প্রেতের ধ্বনি শুনা যায়। সে বলে তুলসীদাস ছাড়া তাহার উদ্ধার হইবে না। একদিন লোকমুখে এই সংবাদ শুনিয়া তুলসীদাস বৃক্ষের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি মন্ত্রপূত জল সেই বৃক্ষে সেচন করিলেন। প্রেত অদৃশ্য থাকিয়াই বলিয়া উঠিল—সাধুজী, আপনি আসিয়াছেন, এইবার আমার মুক্তি হইবে। সাধু দর্শনে আমার আশা কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। এখন আপনাকে একটি কাজ করিতে হইবে। আমাব গ্রন্থ শোধন আপনার মত ভক্ত ভিন্ন আব কাহারও দ্বারা হইবে না। আমি শ্লোকগুলি বলিয়া যাই, আপনি উহা শুদ্ধ করিয়া লিখিয়া লউন। তুলসীদাস প্রেতের অনুরোধে শ্লোক শুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্রিকা শুদ্ধরূপে লিখিত হইল। সাধুর কৃপায় রামনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে পণ্ডিত কেশবের প্রেত জ্যোতির্ময় রূপ প্রকাশ করিয়া ঊর্দ্ধলোকে চলিয়া গেল।

একবার সাধুজীর ইচ্ছা হইল কিছু বৈষ্ণব-সেবা করাইবেন। সাধুর ইচ্ছা। কোথা হইতে নানারকম সামগ্রী আসিতে লাগিল। আশ্রমে বহু সামগ্রী আসিয়াছে। মূল্যবান সামগ্রী দেখিয়া কয়েকটি চোর যুক্তি করিল--আশ্রমে বেশী লোক থাকে না। সাধু সর্বদা এখন পূজনেই থাকেন। আমরা রাত্রিকালে কিছু লইয়া আসিব।

কেহ কোথাও নাই। অন্ধকার রাত্রিতে চোর ঢুকিল। তাহারা কতকগুলি সামগ্রী একত্র করিল লইয়া পলাইবে। একি, হঠাৎ তাহারা দেখিল দুটি সুন্দর যুবক ধনুর্বাণ হাতে লইয়া তাহাদের দিকে লক্ষ্য করিয়াছে। বাণ ছাড়িলেই বুকে বিদ্ধ হইবে। চোরেরা ঊর্দ্ধশ্বাসে

পলাইল। পরদিন সকালবেলা তাহারা সাধুর কাছে আসিল। তাহারা বলিল—আপনার এখানে দুই যুবা ধনুর্বাণ লইয়া রাত্রিকালে পাহারা দেয় তাহারা কে? তুলসীদাস বলিলেন—সে কি এখানে তো আমার রাম লক্ষ্মণ ছাড়া আর কেহ নাই। তোমরা তাহাদিকে দেখিলে কেমন করিয়া—তোমরা মহা ভাগ্যবান্। পূর্ব রাত্রির ঘটনা আমূল শুনিয়া তুলসীদাস আশ্রমে যাহা ছিল সব বিলাইয়া দিলেন। তিনি ভাবিলেন—আমি যদি মূল্যবান কিছু আশ্রমে রাখি তাহা হইলে আমার প্রিয় রামলক্ষ্মণের পাহারা দিবার কষ্ট সহ্য করিতে হয়। আশ্রমে মূল্যবান্ সামগ্রী আর কিছুই রাখিব না। সেই হইতে তিনি নিষ্কিঞ্চন ভাবে দিন কাটাইতে লাগিলেন। তাহার এই স্বভাব দেখিয়া বহু লোক তাহার শরণাগত হইল।

মোগলসম্রাট আক্‌বরের মন্ত্রী ও সেনাপতি নবাব আবদুল রহীম খানখানা বাদশাহের নবরত্নের অন্যতম রত্ন। তিনি প্রসিদ্ধ বৈরাম খাঁর পুত্র। তিনি আরবী, পারসী, সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন শ্রীকৃষ্ণে তাহার অনন্য ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণ প্রেম সম্বন্ধে তাহার যে সকল কবিতা আছে উহা অত্যন্ত রসাল। তিনি বলেন—

জিহি রহীম চিত আপনো, কীন্হো চতুর চকোর।
নিশি বাসর লাগী রহৈ, কৃষ্ণ চন্দ্রকী ওর।

হে রহীম, তুমি চিত্তটিকে চতুর চকোরের মত করিয়া রাখ। চকোরের চিত্ত চন্দ্রের দিকে তোমারও চিত্ত নিশিদিন কৃষ্ণচন্দ্রের দিকে লাগিয়া থাকুক্। তিনি ছিলেন সাধু তুলসীদাসের পরম মিত্র।

একদিন কন্যাদায়গ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ সাধুজীর নিকট আসিলেন। তিনি এক পত্র লিখিয়া ব্রাহ্মণকে দিয়া বলিলেন—আপনি আবদুল রহীম সাহেবের নিকট যান। তিনি পরোপকারী দাতা। আপনার কন্যাদানের

জন্য ভাবিতে হইবে না। ব্রাহ্মণ আসিয়া রহীমের সঙ্গে দেখা করিলেন। পত্রখানা তাহার নিকট দিয়া নিজের অভাবের কথা বলিলেন। তিনি পত্র খুলিয়া দেখিলেন উহাতে একটি দোহার মাত্র অর্ধাংশ লেখা রহিয়াছে। প্রাচীনকালে সমস্যাপূরণ কাব্যের একটি অংশ ছিল। এক কবি কিছু লিখিলেন অপূর্ণ অংশ অন্য কবি পূর্ণ করিয়া দিবেন। তুলসীদাস সেই ভাবেই লিখিয়াছেন।

"সুরতিয়, নরতিয়, নাগতিয়, যহ চাহত সব কোয়।"

সুরস্ত্রী, মানবী এবং নাগিনী সকলেই ইহা প্রার্থনা করে। রহীম ভাবিলেন—এই অর্দ্ধাংশের অপর অংশ আমাকে পূর্ণ করিতে হইবে ব্রাহ্মণের আশাও পূর্ণ করিতে হইবে। তিনি ব্রাহ্মণকে কন্যাদানের নিমিত্ত অর্থ দিয়া সমস্যা পূরণ করিলেন—

"গোদ লিয়ে হুলসী ফিরৈ তুলসী সে সুত হোয়॥"

তুলসীদাসের মত পুত্র লাভের জন্য কষ্ট হইলেও হুলসীর ন্যায় নারী আনন্দে গর্ভধারণ করিয়া থাকে। তুলসীদাসের মাতার নাম হুলসী ছিল।

সাধুজী পথিপার্শ্বে দণ্ডায়মান। সুন্দর বস্ত্র অলঙ্কার সুসজ্জিত এক রমণী আসিয়া সাধুকে প্রণাম করিল। সঙ্গে বহুলোক। সাধু আশীর্বাদ করিলেন—সৌভাগ্যবতী হও। একজন লোক বলিয়া উঠিল—মহারাজ এ কিরূপ আশীর্বাদ হইল। স্ত্রীলোকটি সদ্যবিধবা। সতী হইতে চলিয়াছে। ইহার আর সৌভাগ্য উদয়ের সম্ভাবনা কোথায়? সাধু বলেন—শুন, ইহার পতিকে অগ্নি সংস্কার করিও না। একটু অপেক্ষা কর। আমি একবার দেখিব। সেই স্ত্রীলোকটি সাধুর কথায় যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল। সে ভক্তিভরে পুনরায় সাধুকে প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

সাধু তাহাকে বলেন—দেখ, তুমি আমার দু'চারটি কথা শুন। তুমি যে পতির অনুগমন করিয়া এই শরীর ত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, জানো ইহার ফল কতদিন স্থায়ী হইবে? চতুর্দশ ভুবনে অনন্ত জীব সংসার চক্রে ভ্রমণ করে। তাহারা কর্মফল ভোগ করিয়া স্বর্গ বা নরক হইতে পুনরায় মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে। কর্ম-বন্ধন ছিন্ন করিতে না পারিয়া এই অবস্থা। কত ইন্দ্র, কত ব্রহ্মা গেল, কর্মবন্ধন গেল না। জন্মমরণ গেল না। এই চক্রের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া জীব পরিশ্রান্ত। সে চায় চির-বিশ্রাম। কোনো দিন কাহারও কাছে জিজ্ঞাসা করিয়াছ কি? যদি এ সম্বন্ধে তুমি আজও মনের মধ্যে কোনো স্থির নির্ণয় করিতে না পারিয়া থাক, তবে আমার কথা শুন। আমাদের মঙ্গলের জন্যই যুগ যুগান্তর ধরিয়া মহাজ্ঞানী সাধু সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ বলিয়াছেন—মানুষ যদি ভগবানের নাম সাধন করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে আর তাহাকে কর্মবন্ধন জালে জড়াইতে হয় না। শুভ বা অশুভ সকল কর্মবন্ধন নাম-সাধনায় ছিন্ন হইয়া যায়। তাহাকে পাপ বা পুণ্য, দুঃখ বা সুখ ভোগে লিপ্ত করে না। অপর সকল কর্ম এবং আশা ছাড়িয়া দিয়া যদি কেহ সরল প্রাণে শরণ গ্রহণ করে ভগবান্ তাহাকে নিজের নিত্য আনন্দ-পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই জীবের জন্মমৃত্যুর ভয় থাকে না। স্বামীর সহমরণে তাহার চিন্তায় তুমি মৃত্যুর ভয় হইতে আত্মরক্ষা করিতে পার না। ভগবানের চিন্তায় ইহ জীবনে নির্ভয় ও লোকান্তরে চিরন্তন শান্তি লাভ করিবে। তুমি ভগবানের আরাধনায় প্রবৃত্ত হও। তুমি তো একথা অনেকদিন শুনিয়াছ—আত্মার মৃত্যু নাই। এক দেহ ছাড়িয়া জীব অপর দেহে প্রবেশ করে।

সতী বলিল—সাধুপ্রবর, আপনার কথায় আমার জীবনে নূতন আলোক পাইলাম। আমি রামচন্দ্রের আরাধনা করিব। আপনি

আমাকে সাধনার ক্রম উপদেশ করুন। আমি বুঝিয়াছি—আত্মার মৃত্যু নাই। আমি শুনিয়াছি—কর্মবন্ধন নাম-সাধন ভিন্ন ছিন্ন হইবার নয়। আমার মন বলে—ভগবানের সেবায় শান্তি পাইব। তবু আমার চিত্তকে কিছুতেই শান্ত করিতে পারি না। তাহার উপায় কি বলুন?

সাধু বলিলেন—আমি যে নামমন্ত্র তোমাকে উপদেশ করিতেছি, ইহা স্মরণ করিলেই তোমার প্রাণের জড়তা দূর হইয়া যাইবে। ভয় নাই। গুরুকৃপায় অসম্ভব সম্ভব হইয়া যায়। চল দেখি, তোমার মৃত স্বামী কোথায় আছে।

শবের বস্ত্রাচ্ছাদন উন্মোচন করা হইল। সাধুর আদেশে তাহাকে গঙ্গাজলে স্নান করানো হইল। সাধু কাছে আসিয়া বসিলেন। শবের বুকের উপর হাত রাখিয়া একবার আকাশের দিকে চাহিলেন। কানের কাছে মুখ রাখিয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন। সেই মৃত ব্যক্তির প্রাণস্পন্দন আরম্ভ হইল। সে গভীর নিদ্রা ভঙ্গের পর মানুষ যেমন জাগিয়া উঠে সেই ভাবে ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিল। তাহার আত্মীয়গণ ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। মৃত মানুষ পুনর্জীবন লাভ করিল সাধু কৃপায় সংবাদটা সর্বত্র প্রচার হইয়া গেল।

আকবর বাদশাহ লোক পাঠাইলেন। তুলসীদাসকে একবার দিল্লীতে যাইতে হইবে। বাদশাহ তাহার অদ্ভুত ক্ষমতার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইতে ইচ্ছা করেন। সাধু বলেন—আমি কোনো সিদ্ধাই জানি না। আমি শুধু রামনাম জানি। রাম নামে কিছুই অসম্ভব নয়। বাদশাহের সমীপে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আমি দেখি না। হুকুম অবজ্ঞা করিয়া তুলসীদাস বন্দী হইলেন। তাহাকে কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখা হইল। তখন তিনি হনুমানের স্তব করিতে লাগিলেন। লক্ষ লক্ষ বানর আসিয়াছে। বড় বড় গৃহের দ্বার ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ছাদে আঙ্গিনায় ভিতরে বাহিরে সর্বত্র বানর। সহরে এরূপ উৎপাত

আরম্ভ হইয়াছে যে, আর কোনো কাজ করাই সম্ভব নয়। বানরেরা কারাগৃহের প্রাচীর পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কেহ তাড়াইলেও এই বানরগুলি ভয় করে না। যেন প্রবল ঝড় উপস্থিত হইয়াছে।

বাদশাহ মন্ত্রীদের ডাকাইয়া এই উৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহারা বলেন—জাহাঁপনা সাধু তুলসীদাসকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছে। তাহার ইষ্টদেব হনুমান। তাহাকে ছাড়িয়া না দিলে এই উৎপাত দূর হইবে না। বাদশাহ তৎক্ষণাৎ সাধুকে ছাড়িয়া দিবার জন্য আদেশ করিলেন। উৎপাতও দূর হইল।

বাদশাহ তুলসীদাসকে জিজ্ঞাসা করেন—সাধু বানরের উৎপাত করাইলে কেন?

তুলসীদাস বিনীতভাবে বলেন—আমার প্রভু রামচন্দ্র। তাঁহাকে আনিতে হইলে প্রথমতঃ তাঁহার সৈন্যগণকে পাঠাইয়া দেন। ইহারা যে আমার প্রভুর সেনাদল। বাদশাহ কথা শুনিয়া স্তব্ধ। সাধু বলেন—যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে। এখন আপনি যদি আপনার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে এই স্থান হইতে অন্যত্র গমন করুন। বাদশাহ দিল্লী সাহজাহানাবাদে নূতন রাজধানী করিয়া সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন।

অনেকে মনে করে সাধুরা বুঝি সময় সময় বুজরুকী দেখাইতে ভালবাসেন। একালে যেরূপ বুজরুকী দেখাইয়া কেহ কেহ লোক সংগ্রহ করে, সেকালেও বুঝি এরূপ ছিল। আসনের তলায় মাটির কলসীতে প্রদীপ জ্বালাইয়া ব্রহ্মজ্যোতি প্রদর্শনের কথা সাধুদের কাছে শুনা যায়। অন্ধকার ঘরে জ্যোতি দর্শন ব্যাপার অনেক স্থানেই ঘটে। আতর মাখাইয়া গন্ধ অনুভব করানো হয়। বিনা অগ্নিতে এসিড্ দিয়া যজ্ঞস্থলীর অগ্নি জ্বালাইবার কথাও শুনা গিয়াছে। দেবতার ঘটের তলায় বা বেদীর তলায় কোনো জীবন্ত প্রাণীকে রাখিয়া ঘটের স্পন্দন বা দেবীর স্পন্দন

প্রদর্শন হইয়াছে। আরো কত বুজরুকীতে গ্রাম, নগর ভরিয়া আছে। তুলসীদাসের মত সাধু কিন্তু এই সকল বুজরুকীর বহু ঊর্ধ্বে। বাদশাহকে মোহিত করিবার জন্য তিনি শক্তি প্রদর্শন করেন নাই। ভক্তের বিপদের সময়ে ভগবান্ প্রসন্ন হইয়াই এরূপ ঘটনা ঘটাইয়াছেন যে, তাহাতে সকলের চমক লাগিয়া গিয়াছে। তিনি কিরূপ অকপট ভাবের সাধক তাহা একটি দোহা আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। তিনি বলেন—যাহার বাক্য, বিচার, দেহ, মন বা কর্মের মধ্যে ছলনার ছুং লাগিয়াছে অন্তর্যামীকে ফাঁকি দিয়া সে কিরূপে শান্তি পাইবে। সর্বান্তর্যামীকে ফাঁকি দেওয়া যায় না।

বচন বিচার অচারতন, মন করতব ছল ছুতি।
তুলসী ক্যোঁ সুখ পাইয়ে, অন্তর্জামিহিঁ ধৃতি॥

চিত্রকূটে অবস্থান কালে সাধুজীর দর্শনে প্রতিদিন বহু দর্শকের আগমন হয়। ইহাতে তাহার ভজনের বড় অসুবিধা। তিনি এক গোফার মধ্যে আসন করিয়া বসিলেন। দর্শকের দল গোঁফার দ্বারের কাছে অপেক্ষা করে। কেহ বা দর্শনে বঞ্চিত হইয়া ফিরিয়া যায়। সাধুজী খুব শীঘ্র বাহির হন না। এক মহাত্মা সাধুজীর দর্শনের জন্য সকালবেলা হইতে আসন করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি সাধুজীর দর্শন না করিয়া যাইবেন না। সন্ধ্যার সময় তুলসীদাস গুহা হইতে বাহিরে আসিলেন। মহাত্মাজী তাহাকে বলিলেন—সাধুজী, আপনি যে এরূপভাবে দর্শনার্থীদিগকে বঞ্চিত করিয়া গুহার মধ্যে সর্বদা থাকেন, ইহা কিন্তু ভাল নয়। বহু সাধুমহাত্মার প্রাণে দর্শনের আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও আপনাকে দেখিতে না পাইয়াই তাহারা চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। আমার অনুরোধ যদি রক্ষা করেন, তবে আমি বলি—গুহার বাহিরেই এক আসন করিয়া ভজন করুন। তাহা হইলে দর্শনের জন্য যাহারা আসে, তাহাদের আর দুঃখ হইবে না।

মহাত্মা দরিয়ানন্দের কথা অনুসারে গুহার বাহিরেই আসন করা হইল। সাধু সেখানে বসিয়া ভজন করিতে লাগিলেন। হিতহরিবংশের শিষ্য প্রিয়াদাস, দক্ষিণ দেশের পিল্লেস্বামী, সুরদাস প্রভৃতি সাধুগণ ইঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন করেন। 'সুর সাগর' গ্রন্থের মাধুর্যে তুলসীদাস খুব সুখী হইয়াছিলেন। এ সময় বহু সৎসঙ্গ হইত।

অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সাধুকে কি ভাবে চেনা যায়'? প্রশ্নটি যত সহজ উত্তর তত সহজ নয়। সাধু চেনা ও তাহাকে পরীক্ষা করা খুব শক্ত। কোনো কোনো সাধু এরূপ ঘৃণিত ভাবে লোকের সাম্নে থাকেন যে, তাহাদিগকে কিছুতেই বুঝা যায় না। অথচ দেখা যায়, সহস্র সহস্র লোক তাহাদের প্রভাবে মুগ্ধ। তবে কি তাহারা কোনো মোহিনী-বিদ্যার অভ্যাস করেন? অনেকে মনে করিতে পারেন—কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের সাধকই সাধু হইবেন। যাহারা লোকোত্তর গুণসম্বলিত মহতের পরিচয় জীবনে লাভ করিবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত তাহারাই বলিতে পারেন, 'সাধু মোহিনী-বিদ্যা জানেন অথবা এক বিশেষ মণ্ডলীর সাধকই সাধু।' যাহারা নিরপেক্ষ, ভগবানে নিষ্ঠাবান, প্রশান্ত স্বভাব, সমদর্শী, মমতাহীন, অভিমানশূন্য, সুখদুঃখে সমভাব এবং কোনো কিছু গ্রহণ করিতে আগ্রহহীন এই সকল সদ্‌গুণ যাহাতে দেখা যায়, তিনি যে সম্প্রদায়ের হউন সাধু বলিয়া বুঝিতে হইবে।

মেবারের মহারাণী মীরাবাঈ সাধুজীর সমীপে একখানা পত্র পাঠাইয়াছেন। এক ব্রাহ্মণ পত্রের বাহক। পত্রখানা পড়া হইল। উহাতে লেখা আছে—

"স্বস্তিশ্রী তুলসী গুণভূষন দূশন হরন গুসাঈ।
বারহিবার প্রণাম করউ অব হরহু শোক সমুদাঈ॥
ঘরকে স্বজন হমারে জেতে সবনি উপাধি বঢ়াঈ।
সাধুসঙ্গ অরু ভজন করত মোহি, দেত কলেস মহাঈ॥

বালপনে তে মীরা কীন্হী গিরিধর লাল মিতাঈ।
সোতো অব ছুটত নহিঁ ক্যোহুঁ লগীলগন বরিয়াঈ॥
মেরে মাতপিতাকে সমহো, হরি ভগতিন সুখদাঈ।
হমকো কহা উচিত করিবেকো, সো লিখিয়ো সমুঝাঈ॥"

স্বস্তি শ্রীতুলসীদাস, আপনি গুণালঙ্কৃত, দোষ দূর করিতে সমর্থ প্রভু আপনাকে বার বার প্রণাম পূর্বক নিবেদন—আমার সকল দুঃখ দূর করুন। গৃহে আত্মীয়গণ আমার সাধুসঙ্গ এবং ভজনে বিরোধিতা করিয়া বড় ক্লেশ দিতেছে। বাল্যকাল হইতেই মীরা গিরিধারীর সহিত প্রণয় করিয়াছে; এখন আর উহা ছুটিবার নয়। আপনি আমার পিতামাতার মত। আমার যাহা কর্তব্য আমাকে বুঝাইয়া লিখিয়া উত্তর দিবেন।

পত্র শুনিয়া তুলসীদাসের চক্ষু ছল ছল করিয়া উঠিল। আহা, এই রাজরাণী গিরিধারীর সহিত প্রেম করিয়া কত ক্লেশ সহ্য করিতেছে। সে আমার উপদেশ চাহিতেছে। তাহাকে আমি কি উপদেশ দিব?

তিনি লিখিলেন—

"জাকে প্রিয় ন রাম বৈদেহী।
তজিয়ে তাহি কোটি বৈরীসম, জদ্যপি পরম সনেহী॥
তজ্যো পিতা প্রহ্লাদ, বিভীষণ বন্ধু, ভরত মহতারী।
বলি গুরু তজ্যো কন্ত ব্রজবনিতন হি ভে সব মঙ্গলকারী॥
জাতে হোই সনেহ রামতেঁ সুহৃদ সুসেব্য জহাঁ লৌঁ।
অঞ্জন কৌন আঁখি জো ফুটে কহিয়ত বহুত কহাঁ লৌঁ॥
তুলসী সো সব ভাতি মুদিত মন, পূজ্য-প্রাণতে প্যারো।
জাতে হোই সনেহ রামতেঁ সোঈ মতো হমারো॥"

পরম স্নেহের হইলেও যে সীতারামকে ভালবাসে না; তাহাকে শত্রুর মত জানিয়া ত্যাগ করিবে। প্রহ্লাদ বিষ্ণুদ্রোহী পিতা হিরণ্যকশিপুকে

বিভীষণ রামাবমুখ জ্যেষ্ঠভ্রাতা রাবণকে, ভরত রামবিমুখ মাতা কৈকেয়ীকে, দৈত্যরাজ বলি বামনদেবে বিমুখ গুরু শুক্রাচার্যকে, ব্রজবনিতা কৃষ্ণবিমুখ পতিকে ত্যাগ করিয়াছে। তাহাদের সকলেরই ইহাতে সু ই হইয়াছে—জগতের মঙ্গল হইয়াছে। ভগবানের সম্বন্ধ থাকিলেই সে আত্মীয় এবং প্রিয় হইতে পারে। যে অঞ্জন ব্যবহারে চক্ষু দৃষ্টিহীন হয়, তাহাতে কি প্রয়োজন? আর অধিক বলিব কি, তুমি ইঙ্গিতে বুঝিয়া লইও। তিনি সবদিক দিয়া পরমবান্ধব পূজ্য -প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়। যাহাতে রামে প্রীতি হয়, উহাই আমার অভিমত।

দিল্লী হইতে ফিরিবার সময় তুলসীদাস বৃন্দাবন ধামে আসিলেন। এখানে কেহ সীতারাম বলে না। সকলেই বলে রাধেশ্যাম। বহু সাধু বৈষ্ণব তুলসীদাসকে দেখিতে আসেন। সকলের মুখেই রাধাকৃষ্ণ নাম। তিনি মনেমনে ভাবেন—তাই তো এখানে কি সীতারামের সঙ্গে শত্রুতা। কেহই যে সীতারাম বলে না! একদিন এক বৈষ্ণব আসিয়া বলেন—সাধু, আমার সঙ্গে চলুন, বৃন্দাবনে সীতারামের মন্দির আছে দেখাইব। কথা শুনিয়া তুলসী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া চলিলেন। মদন মোহনের মন্দিরে আসিয়া বৈষ্ণবটি বলেন—এই মন্দিরে সীতারাম আছেন। ভিতরে দর্শন করুন। সাধুজী আগ্রহ সহকারে মন্দিরে ঢুকিলেন—কিন্তু কই? এই যে বংশীধারী? তখন তিনি বলিয়া উঠিলেন—

কহা কহো ছবি আজকী, ভলে বনে হো নাথ।
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুষবাণ লো হাথ॥

হে প্রভু, আজ তুমি যে মনোহর বেশ ধরিয়াছ তাহা আর কি বর্ণনা করিব। তুলসীদাস তখনই শির নত করিবে যখন তুমি ধনুর্বাণ হাতে ধরিবে। মদনমোহন ভক্তের আশা পূর্ণ করিলেন। বংশী লুকাইয়া

তিনি ধনুর্বাণ ধারণ করিলেন। নিজ বাঞ্ছিত রূপ দর্শন করিয়া তুলসী বলিলেন —

ক্রীট মুকুট মাথে ধরিয়ো ধনুষবাণ লিয় হাথ।
তুলসী নিজ জন কারনে নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥

সেকালে রাজার মহিমা বর্ণনা কবিদের একটা প্রধান কার্য ছিল। তুলসীদাস কিন্তু একটি কবিতায়ও কোনো রাজা মহারাজের গুণ বর্ণনা করেন নাই! শুধু কাশীধামে তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তবান্ধব টোডরমল নামে একব্যক্তি ছিলেন তাহারই বিরহে একটি কবিতা রচনা করেন।

চার গাবঁকো ঠাকুরো মনকো মহামহীপ।
তুলসী যা কলিকালমেঁ অথ যে টোডর দীপ॥

চারিটি গ্রামের পূজ্য মনের রাজা কলিকালে তুলসীর নিকট টোডরমল জ্ঞানে প্রদীপের মত ছিল। তিনি নিজের মনকে শিক্ষা দিয়া দোহা রচনা করেন।

তুলসী বহা যাও যাহা আদর ন করে কোয়।
মানঘাটে মন মরে হরিকো স্মরণ হোয়॥

ওরে তুলসী, যেখানে তুমি অনাদৃত হও সেখানে যাও। তাহাতে তোমার মানভঙ্গ হইবে, মনমরা হইয়া তুমি হরির স্মরণ করিতে পারিবে।

কাশীধামে বহু ধনী ব্যবসায়ী। প্রসিদ্ধ এক মিঠাইওয়ালা সাধুর অনুগত। সাধুকে অনুনয় করিয়া সে বলে—মহারাজ, আমার একটি নিবেদন —আপনি যতদিন কাশীধামে থাকিবেন অনুগ্রহ করিয়া আমার দোকানটিতে একবার করিয়া পদধূলি দিবেন। দোকানদারের ইচ্ছা সাধুর সেবা করা। তিনি স্বীকৃত হইলেন। তিনি দিনান্তে একবার সেই দোকানে নির্দিষ্ট সময়ে পদার্পণ করেন। মহাজন আগ্রহ সহকারে তাহাকে মিঠাই দেন। এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। একদিন

মহাজন অন্যত্র গিয়াছেন। দোকানে অপর একব্যক্তি। সে সাধু সন্তের উপর বড় সন্তুষ্ট নয়। তুলসীদাস নির্দিষ্ট সময়ে দোকানে আসিয়াছেন। সে লোকটি কট্‌মট করিয়া চাহিয়া বলিয়া উঠিল—এটা কি তোমার বাবার দোকান? রোজই মিঠাই খাইতে আস কেন? তুলসী কিছু বলিলেন না, ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে ভাবিলেন—রাম বিমুখ—আমি কখনও কোথাও কিছু চাহিতে যাইব না। যদি চাহিতে হয় রামের নিকট চাহিব।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। সাধু আর আশ্রমের বাহির হন না। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, রামকৃপা না পাইয়া বাহিরে আসিবেন না। আশ্রম দ্বারে রামকৃপা প্রাপ্ত সাধুকে দর্শন করিবার জন্য বহু ধনবান ব্যক্তির আগমন হইয়াছে। তাঁহারা সাধু-সেবার জন্য নানারূপ উপহার লইয়া আসিয়াছে। কে আগে সেই সামগ্রী সাধুর হাতে তুলিয়া দিবে তাহা লইয়া বিষম আগ্রহ। সাধুর শিক্ষা হইল। নিজের জীবনে যে মহান্ সত্য উপলব্ধি হইয়াছে উহা তিনি ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। উহাতে কোনো অলঙ্কার নাই, অথচ কি সুন্দর! তিনি বলেন,—

ঘর ঘর মাঁগে টূক পুনি ভূপনি পূজে পায়।
জে তুলসী তব রাম বিনু, তে অব রাম সহায়॥

একদিন রামভজনবিনা এই তুলসীদাস ঘরে ঘরে ভিক্ষা করিয়া খাইত। এখন রাম সহায় বলিয়া রাজাও পদপূজা করিতেছে। রাম ভজনে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্রকেও কত বড় করে!

কাশীধামে একবার প্লেগ রোগে মহামারী আরম্ভ হয়। বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। দলে দলে লোক আসিয়া সাধু তুলসীদাসকে প্রতিকার করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। সাধু বিশ্বনাথের চরণে জীব-কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করিলেন। তিনি বলিলেন—প্রভু,

তোমার আধিপত্য কালে ধ্বংস কার্যে তুমি নিজেই হাত দিয়াছ। আমরা আর কোন্ বিশ্বদেবের নিকট প্রার্থনা করি। তুমিই যে বিশ্বনাথ।

আপনী বীসী আপুহী পুরিহিঁ লগায়ে হাথ।

কেহি বিধি বিনতী বিশ্বকী, করৌ বিশ্বকে নাথ॥

প্রত্যেক ষাট্ বৎসর তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম কুড়ি বৎসর ব্রহ্মা, দ্বিতীয় কুড়ি বৎসর বিষ্ণু আর শেষ কুড়ি বৎসর রুদ্রের। রুদ্রের বিশ বৎসর ধ্বংস হয়। মহামারীর সময়ে বিশ্বনাথকে ধ্বংস নিরত দেখিয়া তুলসীদাস পূর্বোক্ত কথা বলিলেন। তাঁহার প্রার্থনার পর লোকক্ষয় থামিয়া গেল।

অমরকবি তুলসীদাস একনিষ্ঠ গুরুভক্ত ছিলেন। তাহার 'রামচরিত মানস' গ্রন্থে তিনি গুরুভক্তির পরম আদর্শ দেখাইয়াছেন। রাজনীতি ধর্মনীতি ও প্রেমভক্তি সম্বন্ধে যে অনবদ্য নির্দেশ তাহার কাব্যের মধ্যে পাওয়া যায় উহা অন্যত্র দুর্লভ। গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং সচেতন মনের জাগ্রত অনুভব ভিন্ন এ জাতীয় ভাষার মাধুর্য ও রসসৃষ্টি সম্ভব হয় না। "রামচরিত মানসে" কথা শ্রবণের আগ্রহ লইয়া অবগাহন করিলে মানস সরোবরে স্নান অপেক্ষাও যে অধিকতর লাভ হয়, ইহা নিঃসংশয়ে বলা চলে। "বিনয় পত্রিকার" পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে তুলসীদাস প্রাণের রসে তাহার প্রভুকে অভিষিক্ত করিয়াছেন। "দোহাবলী" অপূব কীর্তি। ভারতের সর্বত্র সর্বশ্রেণীর লোকের মুখে মুখে গভীরার্থ পরিপূর্ণ দোহা উচ্চারিত হইতে শুনা যায়। ইহাকে তুলসীদাসের অদ্ভুত রচনা কৌশল ছাড়া আর কি বলা যায়। এই দোহার মধ্যে সমাজের সকল প্রকার ব্যক্তিজীবনসমস্যার সমাধান রহিয়াছে। প্রত্যেক দোহা স্বতন্ত্র হইলেও তাহার মধ্যে বহু প্রকার প্রশ্নের মীমাংসা। তুলসীদাস বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে ভক্তমালরচয়িতা নাভাজীর সহিত ইঁহার দেখা হইয়াছিল। নাভাজী তুলসীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলেন। তিনি তুলসীকে অসঙ্কোচে বাল্মীকির অবতার বলেন। বাল্মীকি ত্রেতাযুগে রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। তাহার এক একটি অক্ষর ব্রহ্মহত্যাপাপ দূর করিতে সমর্থ। এখন তিনিই ভক্তগণের সুখের নিমিত্ত অভিনব রামলীলা বিস্তার করিয়াছেন। রামচরণ সেবা-রসে মত্ত হইয়া তিনি নিশিদিন সেই ব্রত পালন করিয়াছেন। অপার সংসার সমুদ্রের পারে যাইবার সুন্দর নৌকা তিনি আনিয়াছেন। কলিকালের কুটিল জীব নিস্তারের জন্য সেই বাল্মীকি অধুনা তুলসীদাস হইয়াছেন।

সংসার অপারকে পারকো সুগমরূপ নৌকা লয়ো।
কলি কুটিল জীবনিস্তার হিত, বাল্মীকি তুলসী ভয়ো॥

তুলসী একটি দোহায় বলিয়াছেন - "রে তুলসী, তুমি যখন ভূমিষ্ট হইয়াছ পুত্রজন্ম বলিয়া আত্মীয়গণ আনন্দে হাস্য করিয়াছে। তুমি কিন্তু অসহায় অবস্থায় ক্রন্দন করিয়াছ। তুমি তোমার কার্য সমাধা করিয়া সংসার হইতে এরূপভাবে বিদায় লও, যেন তুমি আনন্দে হাস্য করিয়া চলিয়া যাইতে পার। তোমার জন্য যেন লোকে ক্রন্দন করে। এই ভাবেই সকলকে কাঁদাইয়া সম্বৎ ১৬৮০ (১৬২৯ খৃষ্টাব্দে) শ্রাবণ শুক্ল সপ্তমী দিনে অসি ঘাটে গঙ্গাতীরে তুলসীদাস দেহত্যাগ করেন। তাহার শেষ কবিতা বলিয়া খ্যাত দোহাটি এই—

রামনাম যশ বর্ণিকৈ, ভয়ো চাহত মৌন।
তুলসীকে মুখ দীজিয়ে অবহী তুলসী সোন॥

রামনাম যশ বর্ণনাকারী এখন মৌন হইতে চলিতেছে। এখন তুলসীদাসের মুখ বিবরে তুলসীপত্র ও স্বর্ণখণ্ড প্রদান করুন। জয় জয় রামচন্দ্রকী জয়।

---

# মীরাবাঈ

শুভ বিবাহের শোভা যাত্রা। নানারূপ বাদ্যধ্বনিতে আকৃষ্ট নরনারী বন্ধু বান্ধব পরিবেষ্টিত বর কনে বিচিত্র ভূষণে সুসজ্জিত। একটি পাঁচ বৎসরের মেয়ে মনোযোগ করিয়া সেই শোভা দেখিতেছিল। সে মাকে জিজ্ঞাসা করিল—মা, আমার বর কোথায়? কন্যার অতর্কিত প্রশ্নে মাতা উত্তর দিলেন—তোর বর গিরিধারী লাল।

মন্দিরে ছোট্ট একটি কৃষ্ণমূর্তি। অতি সুন্দর এই বিগ্রহ যেন কোনো অদ্ভুত যাদু জানে। মীরা নিয়মিত ভাবে তাহার আসনটিকে পরিষ্কার করে। তাহাকে স্নান করায়, কাপড় পরায়, চন্দন মাখায়, ফুল দিয়া সাজায়। তাহারই আসনের নিকটে একটি হরিণের চর্ম। উহাই পাঁচ বৎসরের মেয়েটির শয্যা। এখানে সে গিরিধারী গোপালকে কাছে লইয়া শুইয়া থাকে। তাহার কথা কহিতে চক্ষু জলে ছলছল করে। সে গোপালের মুখের ভাব দেখিয়া কখনো অনেকক্ষণ ধরিয়া কাঁদে। আবার কখনো অনির্বচনীয় হাসির রেখা দেখিয়া মীরা আনন্দে উল্লসিত হয়। কখনো যোগীর মত স্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া থাকে। কখনো ললিত ছন্দে অঙ্গ দুলাইয়া গোপালের সম্মুখে তাহার প্রাণের হর্ষ আবেগ ব্যক্ত করে। সে নাচে, গায়, কত কিছু বলে। গোপাল তাহার সঙ্গে কথা বলে।

যাহারা মীরার প্রেম বুঝে না, তাহারা বলে—মীরার উন্মাদ রোগ আছে। যাহারা বুঝে, তাহারা বলে—এ রোগ সাধারণ উন্মাদ নয়, ইহাকে প্রেমোন্মাদ বলে। বয়সের সঙ্গে এ রোগ কিরূপ হয়, তাহা কে বলিবে?

মীরা বড় হইয়াছে। বিবাহের জন্য পাত্র স্থির। চিতোর দুর্গের ভাবী উত্তরাধিকারী ভোজরাজের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইয়াছে। সে

রাজার রাণী হইবে। ভোজরাজ রাণা সাঙ্গের জ্যেষ্ঠপুত্র। উদয়পুরের রাণা সাঙ্গ আদর্শ স্বাধীন-চেতা পুরুষ। রাজস্থানের ইতিহাসে তাহার নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। দুর্গম বনে ঘাসের রুটি খাইয়া, শিশুসন্তানের দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়াও তিনি স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছেন। মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়া তিনি রাজপুত নামে কলঙ্ক আরোপ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ভোজরাজ কুলোচিত গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি বীর, যোদ্ধা, সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

শুভদিনে মীরার বিবাহ হইয়া গেল। গোপালের সহিত মীরার প্রেম। উহা যে কত গভীর তাহা কেহ পরিমাপ করিবার অবসর পাইল না। মীরা শ্বশুর বাড়ীতে আসিল। মাড়োয়ারের রতনসিংহের নন্দিনী মীরা গোপালের প্রেমে আত্মহারা। শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া সে এক নূতন বেষ্টনীর মধ্যে ছটফট করিতে লাগিল। তাহার শাশুড়ী বলেন—বৌমা, দুর্গার নিকট পূজা দিয়া এস। প্রণাম কর। মীরা বলে—আমার গিরিধারী গোপাল ছাড়া আমি তো কাহাকেও পূজা দিই না। আমি আর কাহাকেও প্রণাম করি না। কথা শুনিয়া শাশুড়ী রাগ করে। আবার মনে ভাবে—হয়তো নূতন বউএর কোনো রোগ আছে। কিছুদিন চিকিৎসা হইলে সারিয়া যাইবে।

এদিকে গৃহের সমস্ত কার্য্য মীরা নিখুঁতভাবে সম্পাদন করে। কর্তব্য কার্যে কিছুমাত্র অবহেলা নাই। বাড়ীর কেহ মীরার স্নেহ দয়া হইতে বঞ্চিত নয়। যাচক, প্রার্থী, দীন, দুঃখীর একান্ত আপনার জন মীরা। ভোজরাজ বীর যোদ্ধা—প্রেমে কোমল প্রাণ মীরার সেবা-যত্ন তাহার নিকট অর্থ-হীন। তবু মীরার ব্যবহারে তিনি কোনোরূপ দোষ ধরিবার সুযোগ পান নাই। মীরা কিন্তু গিরিধারী গোপালকে

যেভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে সেইভাবে রাণাকে কোনদিনই গ্রহণ করিতে পারে না। সে তাহার নিজস্ব গৌরব রক্ষা করিয়া কায়মনোবাক্যে গিরিধারীর প্রিয়া। গৃহকার্য সারিয়া সে গিরিধারীর মন্দিরে যাইয়া বসে। সেখানে প্রাণের আকুলতা নিবেদনে প্রিয়তমের সহিত সে তন্ময় হইয়া থাকে। অনেক সময় সে ভক্তগণের সহিত নাচিয়া নাচিয়া কীর্তন করে এবং ভাবে বিভোর হইয়া গিরিধারীকে আলিঙ্গন করে। সে শ্যামল সুন্দরের মধুর বাঁশরীর গান শুনে-- তাহার সহিত দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রেমের আলাপ করে। তার প্রেম কে বুঝিবে ?

মীরা শাশুড়ীর নিষেধ শুনিল না। সে যে গিরিধারীর প্রিয়া। ভোজরাজ নিষেধ করিলেন। মীরা কর্ণপাত করিল না। সে যে শ্যামল সুন্দরের মধুর ডাক শুনিয়াছে। ভোজরাজের ভগ্নী উদা তাহার বিরোধিতা করিতে লাগিল। মীরার সুখ সে দেখিতে পারে না। সে ভ্রাতার নিকট অভিযোগ করিল -গভীর রাত্রে মীরার শয়নগৃহে তাহার উপপতি আসে। মীরা তাহার সহিত প্রেমালাপ করে। ভোজরাজ বিশ্বাস করে না।

গভীর নিদ্রায় অভিভূত ভোজরাজ,। হঠাৎ উদার ডাকে নিদ্রা ভঙ্গ হইল। "উদা, অতরাত্রে ?" উদা বলিল— "দেখবে এস !" ভোজরাজ ভগ্নীকে অনুসরণ করিয়া গিরিধারীর মন্দির দ্বারে। উদা বলে---ঐ শুন, মীরা তাহার প্রিয়তমের সহিত প্রেমালাপ করিতেছে। রাণা দ্বারে কানপাতিয়া শুনে—

অব তো নিভায়াঁ সরেগী,  
বাঁহ গহেকী লাজ।  
সমরথ সরণ তুমহারী সইয়াঁ,  
সরব সুধারণ কাজ।

হে নাথ, এখন আমাকে রক্ষা করিতে হইবে। তুমি যে আমাকে তোমার প্রিয়তমা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছ। হে সমর্থ প্রেমিক, আমি তোমার শরণাগত। আমার সকল কার্য তোমাকেই সমাধান করিতে হইবে।

কথা শেষ পর্যন্ত শুনিবার মত ধৈর্য রহিল না। ভোজরাজ দরজা ভাঙ্গিয়া গৃহের ভিতরে ঢুকিলেন। তিনি ক্রোধে আত্মহারা। মুক্ত তরবারি লইয়া ছুটিয়া গেলেন মীরার উপপতির উদ্দেশ্যে। এ কী? মন্দিরে যে আর কেহ নাই। তবে এই গভীর রাত্রে মীরা কাহার সহিত কথা কহিতেছিল? সম্মুখে তাহার স্তব্ধ গিরিধারী লাল। মায়ামুগ্ধ রাণার সমীপে সেই বিগ্রহ অস্পন্দ—প্রাণহীন—মূক। গর্জ্জন করিয়া রাণা মীরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—বল, তুমি এই গভীর রাত্রে এখানে একাকী কেন? কাহার সহিত প্রেমালাপ করিতেছ। সে সহাস্য বদনে উত্তর করিল—তুমিই দেখ না। রাণা বলে- সত্য বল, তোমার প্রেম-পিয়াসীটি কে? আমি তাহাকে হত্যা করিব। নির্ভীক মীরা বলিল—এই যে গিরিধারী গোপাল আমার প্রিয়তম। সে যে ব্রজগোপীর ঘরে ননীচোরা—বসন চোরা—মন চোরা। আমার মনটিকেও সে চুরি করিয়া নিয়াছে। এখন আর ফিরাইয়া দিবার কথাটি নাই। যা হয় হউক, আমারও আর বলিবার কিছু নাই—সে যাহা করিয়াছে ভালই করিয়াছে। আমার তাহাতে দুঃখ নাই। দেখ দেখ, সে কেমন হাসিতেছে। একি তুমি গম্ভীর হইলে কেন? মীরা গান করে—

ভবসাগর সংসার অপর বল,
জামেঁ তুম হো ঝ্যাজ॥
নিরধারা আধার জগত গুরু
তুম বিন হোয় অকাজ॥

জুগ জুগ ভীর হরী ভগতনকী,
দীনী মোক্ষ সমাজ ॥
মীরা সরণ গহী চরণনকী,
লাজ রখো মহারাজ ॥

এই ভবসাগরের পারে যাইতে তুমিই মীরার জাহাজ। তুমি জগতের গুরু তোমাকে ভিন্ন আর কোনো আশ্রয় নাই। যুগ যুগ ধরিয়া হরি ভক্ত তোমার কৃপায় মোক্ষলাভ করিয়াছে। হে প্রভু, মীরা তোমার শরণাগত তাহার লজ্জা রাখো।

হাস, হাস, যেমন তুমি হাসিতেছিলে হাস। গিরিধারী লাল, তুমি রাগ করিয়াছ? না না আমি তো রাণাকে মন দিই নাই। আমার সবখানি হৃদয় জুড়িয়া যে তুমিই আছ। আমি জানি তোমাকে যাহারা ভালবাসে তাহাদিগকে তুমি পাগল করিয়া দাও। কুঞ্জে কুঞ্জে বিহারশীল তোমাকে আমি বেশ ভাল ভাবেই চিনিয়াছি। চকোর যেরূপ চন্দ্রের জন্য আকুল—পতঙ্গ যেরূপ অগ্নির ডাকে পুড়িয়া মরে—মীন যেরূপ জল ভিন্ন বাঁচিতে পারে না, হে প্রিয়, তোমার নিমিত্ত আমার সেইরূপ প্রেম।

আলী! সাবরেকী দৃষ্টি মানো, প্রেমকী কটারী হৈ।
লাগত বেহাল ভঈ, তনকী সুধ বুধ গঈ ॥
তনমন সব ব্যাপী প্রেম মানো মতবারী হৈ।
সখিয়াঁ মিল দোয় চারী, বাবরীসী ভঈ ন্যারী।
হৌঁ তো বাকো নীকে জানোঁ কুঞ্জকো বিহারী হৈ ॥
চন্দকো চকোর চাহৈ, দীপক পতঙ্গ দাহৈ।
জল বিনা মীন জৈসে, তৈসে প্রীত প্যারী হৈ ॥
বিনতা কঁরু হে শ্যাম লাগূ মৈ তুম্‌হারে পাব।
মীরা প্রভু ঐসী জানো, দাসী তুম্‌হারী হৈ ॥

হে শ্যাম, তোমার পায়ে পড়িয়া মিনতি করি—মীরাকে তোমারই দাসী বলিয়া জানিও।

মিনতি করিতে করিতে মীরা সংজ্ঞা হারাইল। তাহার কোমল দেহলতা বিগ্রহের বেদীমূলে লুটাইয়া পড়িল। এরূপ দৃশ্য রাণা কখনও দেখেন নাই। তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। উদা ছুটিয়া গিয়া মীরাকে কোলে তুলিয়া লইবে ভাবিল কিন্তু তাহার পবিত্র দেহ স্পর্শ করিতে পারিল না। কে যেন তাহার কানে বলিয়া দিল—মীরার শরীর স্পর্শের অধিকার তোর নাই। মীরাকে তুই আজ বড় ব্যথা দিয়াছিস্। রাণা মাথা নত করিয়া চলিয়া গেলেন। কাহাকেও কিছু বলিলেন না। উদা তাহার মন বুঝিতে পারিল না। মীরা আনন্দময়ের সন্ধান পাইয়াছে।

কিছুদিন মীরার কোন কার্যে রাণা আর বাধা দেন না। তিনি ভাবিলেন—মীরা উন্মত্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার বিরোধিতা করা নিরর্থক। রাণা মীরার সম্বন্ধে বড় বেশী মন দেন না। সাধারণ লোক কিন্তু নানারূপ কুৎসা কলঙ্ক রটাইতে লাগিল। অনেকেই বলে—এখন মীরা বিদেশী সাধুদের সঙ্গে থাকে। যা খুশী তাই করে। কেহ বলিবার কহিবার নাই। বড়দের ঘরে সকলই শোভা পায়। গরীবের ঘরে এরূপ হইলে দেশে থাকিতে পারিত না। এ সকল কথা মীরা শুনিয়াছে। এখন তাহার ভয় সঙ্কোচ নাই। সে গিরিধারী প্রেমে সব কিছু ভুলিয়া গিয়াছে। সে বলে—মাতাপিতা ভাইবন্ধু আমি সকল ছাড়িয়াছি। আমি সাধুদের কাছে বসিয়া লোকলজ্জা হারাইয়াছি। সাধু দেখিলে আমি উল্লাসে ছুটিয়া কাছে যাই। সংসারী লোক কাছে আসিলে আমার কান্না পায়। আমার চক্ষের জলে অমর প্রেমলতাকে সিঞ্চিত করিয়াছি। পথের মাঝে আমি সাধু ও পবিত্র নামকে সহায়রূপে পাইয়াছি। সাধুগণ আমার মাথার মণি। প্রিয়তমের নাম আমার হৃদয়ে

রাখিয়াছি। মীরা গিরিধারী লালের দাসী। এখন লোকে যা বলে বলুক্।

মেরে তো গিরিধারী গোপাল দূসরো ন কোঈ।
মাতা ছোড়ী পিতা ছোড়ে ছোড়ে সগা সোঈ।
সাধাঁ সঁগ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোঈ॥
সন্ত দেখ দৌড়ি আঈ জগৎ দেখ রোঈ।
প্রেম আঁসূ ডার ডার অমর বেল বোঈ॥
মারগমে তারণ মিলে সন্ত নাম দোঈ।
সন্ত সদা সীসপর নাম হৃদৈ হোঈ॥
অব তো বাত ফৈল গঈ জানে সব কোঈ।
দাসী মীরা লাল গিরধর হোনী সো হোঈ॥

যেখানে যাও শুনিবে মীরার কথা। মেবারের রাণার গৃহে অপূর্ব ভক্তির স্রোত। কেহ কখনও ইহা কল্পনাও করিতে পারে না। দেশ দেশান্তর হইতে দলে দলে সাধু আসিতেছেন প্রেমমত্ত মীরার দর্শনের জন্য। মন্দিরের দ্বার অবারিত। নিশিদিন কীর্তন—আনন্দ-নর্তন। মীরার কণ্ঠে অমৃত নির্ঝর, তাহার দর্শনে পরম হর্ষ। গিরিধারীর মন্দিরে নিত্য নব-ভক্ত সমাগম। কে কাহার খবর রাখে? বহু দূর হইতে দুইজন অপূর্বদর্শন সাধু আসিয়াছেন। তাহাদের একজন প্রৌঢ় উন্নত ললাট, দীর্ঘ নয়ন, তেজোময় বপু, দীর্ঘাকৃতি, অবয়ব সুগঠিত, রাজ-জনোচিত ধীর মন্থরগতি। অন্য জন বৃদ্ধ, ইহারা মন্দিরের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। অন্যান্য সাধু সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া একপাশে দাঁড়াইতেছেন। মীরা বেদীর সমীপে আবিষ্ট ভাবে বসিয়া আছে। তাহার মুখে দিব্য জ্যোতিঃ। প্রফুল্ল কমলের শোভা বিস্তার করিয়া গিরিধারীর বেদীমূলে ভক্তি-প্রতিমা আগন্তুকদ্বয়কে হাস্যামৃত দিয়া অভিনন্দন করিল।

নবাগত সাধু দুইজন বিনা বাক্যব্যয়ে বসিয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে বহু সাধু আসিয়া মীরাকে মধ্যমণি করিয়া মণ্ডলীতে বসিয়া আছেন। ভজন আরম্ভ হইল। গান করিতে করিতে মীরার দেহ কম্পিত হইতে লাগিল, অশ্রুধারা প্রবাহিত, ক্রমে তাহার ভাবান্তর উপস্থিত। সে উঠিয়া দাঁড়াইল, ভঙ্গী করিয়া নাচিতে লাগিল. সেই নৃত্য ভাব-নৃত্য। তাহার প্রতিটি অঙ্গ ভাব-তরঙ্গে তরঙ্গায়িত-আন্দোলিত হইতেছিল। এরূপ নৃত্য কখনো কোনও নৃপতির সভায় হয় না। এরূপ সঙ্গীতের ঝরণা কোনো বিলাসীর কক্ষে প্রবাহিত হয় না। ভগবৎপ্রেম-মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত, ভাব বিলসিত অঙ্গের ললিত-ছন্দ-নৃত্য সমাগত জনমণ্ডলীকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তাহারা দেখিতেছে গিরিধারী গোপালের অঙ্গ হইতে জ্যোতিরেখা আসিয়া যেন মীরাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে – যেন তাহার অঙ্গের কান্তি বিচ্ছুরিত হইয়া গিরিধারীকে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। অভাবনীয় দৃশ্য, মধুময় গন্ধ, সুললিত ছন্দ আর অমৃতবর্ষি ধ্বনির ধারা মন্দিরের অভ্যন্তরে রাস-লীলার রস সৃষ্টি করিয়াছে।

ভজন সমাপ্ত একে একে সাধুগণ মন্দিরের বাহিরে যাইতে লাগিলেন। রাজতুল্য দেহধারী দীর্ঘাকৃতি প্রৌঢ় নবাগত সাধু করজোড়ে মীরার অতি নিকটে আসিয়াছেন। মীরা সসঙ্কোচে সরিয়া যায়। সেই ব্যক্তি বহুমূল্য এক মণিময় কণ্ঠহার মীরাকে উপহার দিবার জন্য বাহির করিলেন। মীরার উহাতে কোন প্রয়োজন নাই। নবাগত বলিলেন—এটি আপনার গিরিধারী গোপালের জন্য লইতেই হইবে। গিরিধারীর নামে দেওয়া সামগ্রী মীরা কেমন করিয়া অগ্রাহ্য করিবে? সে উহা গোপালের বেদীমূলে রাখিয়া দিতে ইঙ্গিত করে। ঐ যে মণিময় কণ্ঠহার বেদীমূলে ঝিক্‌মিক্ করিয়া উঠিল। সেই লোক মন্দির হইতে চলিয়া গিয়াছে।

এ কি কৃষ্ণ ভোজরাজ মন্দিরের দিকে ছুটিয়া আসিতেছেন কেন ? কে যেন বলিয়া উঠিল মন্দিরে নয়। ঐ উত্তর দিকের পথে যাইতেছে। ঐদিকে চলুন। ভোজরাজ ছুটিলেন। লোকে বলাবলি করিতে লাগিল। কি আশ্চর্য আকবর বাদশহ সঙ্গীতাচার্য তান্‌সেনকে লইয়া মীরার গান শুনিয়া গেল ! এ কথাটা কেহ পূর্বে রাজ সভায় জানাইল না। নিরুদ্দিষ্ট ব্যক্তির অনুসরণে ক্লান্ত ভোজরাজ মন্দিরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি দেখিলেন, সত্যই সেই মণিহার তপনও বেদীমূলে রহিয়াছে। তিনি মীরাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন—তোমার জন্য আজ চিতোরের কলঙ্ক হইল। এখানে মোগল সম্রাট আসিয়া অক্ষত দেহে ফিরিয়া যায়। ধিক্ তোমার জীবন ! নদীতে ডুবিয়া মরিলেই তোমার প্রায়শ্চিত্ত হয়।

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন আকবর এভাবে কেন আসিলেন ? আকবর সম্রাট হইয়াও ছিলেন একজন জ্ঞান পিপাসু। তাহার ধর্মমত উদার এবং প্রসারিত হইয়াছিল সুফী সমাজের প্রেমিক সাধকগণের সংস্পর্শে। তিনি ধর্মের রহস্য জানিবার জন্য কতদূর উৎসুক ছিলেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায় তাহার ইবাদতখানা বা পূজাবাড়ীর প্রতিষ্ঠায় এই গৃহে বিভিন্ন মতাবলম্বী সাধুগণ একত্র হইয়া বিচার বিতর্ক করিতেন। গভীর রাত্রি পর্যন্ত সম্রাট উপস্থিত থাকিয়া সেই কথা শুনিতেন। সেখানে হিন্দু, জৈন, খৃষ্টান, জরথুষ্ট্র প্রভৃতি ধর্মের রহস্য আলোচিত হইত। তিনি প্রাচীন পারসিক ধর্মের চৌদ্দটি ধর্মানুষ্ঠান ব্রত পালন করিতেন। অগ্নি ও সূর্যকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিতেন। তিনি ছিলেন অহিংস নীতির পরিপোষক। শিকার করিতে যাওয়া, মাছধরা ছাড়িয়া দিয়া তিনি হইলেন নিরামিষভোজী। সাধুসঙ্গ প্রভাবে দিল্লীর বাদশাহের এই পরিবর্তন। তিনি রাজাজ্ঞা দ্বারা তাহার রাজ্যে বৎসরের অর্ধেক সংখ্যক দিনে পশুবধ নিষেধ করিয়া

দিলেন। এই ভাবে ক্রমশঃ তাহার এরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল যে, অনেক বিষয়ে তিনি হিন্দুভাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। রামানুজ সম্প্রদায়ের তিলক ললাটে ধারণ করিয়া তিনি যে বৈষ্ণবভাবকে বিশেষ আদর করিতেন তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। সম্রাট্ আকবরের চিত্র "চিত্রিত অভিধানে" (Pictorial Dictionary Vo l. 1. Ed. by Arthur Zuce) দেখিতে পাওয়া যায়। সৌর জন্মতিথিতে সম্রাট্ আকবরকে নিম্নলিখিত দ্রব্যের দ্বারা ওজন করা হইত; যথা—স্বর্ণ, পারদ, রেশম, গন্ধদ্রব্য, ভেষজ ঔষধ, ঘৃত, লৌহ, পায়সান্ন, সাত প্রকার খাদ্য শস্য, লবণ, তুতিয়া ইত্যাদি। এই দিনে সম্রাটের যত বৎসর পূর্ণ হইত তত সংখ্যক ভেড়া, ছাগল ও পাখী, যাহারা এই সমস্ত প্রতিপালন করে তাহাদিগকে দান করা হইত এবং বহুসংখ্যক ছোট জানোয়ারকে বন্ধন-মুক্তি দেওয়া হইত। চান্দ্র জন্মতিথিতে সম্রাটকে রৌপ্য, বস্ত্র, বস্ত্র, সীসা, ফল, তরিতরকারী এবং সরিষার তৈল দ্বারা ওজন করা হইত। উভয় তিথিতে সাল-গিরা উৎসব হইত। অন্দর মহলে রক্ষিত একটি রজ্জুতে প্রতি বৎসর সৌর ও চান্দ্র বৎসর হিসাবে এক একটি গ্রন্থি যোগ করিয়া বয়সের হিসাব রাখা হইত। আকবরের সময় দান সামগ্রীর অধিকাংশ ব্রাহ্মণগণ পাইতেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বে ব্রাহ্মণের ভাগ ক্রমশঃ কম হইতে হইতে শাহজাহানের রাজত্বে শূন্যে পরিণত হইল।

(লাহো বাদশাহ নামা)

রাজপুত রমণী জহর-ব্রতের জন্য প্রসিদ্ধ। মর্য্যাদা রক্ষার জন্য দেহত্যাগ তাহাদের নিকট অতি তুচ্ছ ব্যাপার। পতির আদেশ পালন করাই নারীর কর্তব্য। রাণার আদেশে মীরা নদীতে ডুবিয়া মরিবে। সে সকলের চক্ষের আড়াল হইয়া রাজপুরী হইতে বাহির হইল। সঙ্গে তাহার গিরিধারী গোপাল। পথে যাইতে সে বিগ্রহটিকে বুকে

চাপিয়া ধরিতেছিল। অতি সন্তর্পণে সে নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

শূন্য মন্দির। দ্বারে কত ভক্তের সমাগম হইল। মীরা আর নাই। কোথায় গিয়াছে কেহ বলিতে পারে না। সেই গান, সেই নৃত্য, আর নাই। প্রতিদিন শতশত প্রাণী সেখানে আনন্দে আত্মহারা হইত। সেই উল্লাস, উৎসব, বন্ধ হইয়া গিয়াছে। রাজপুরী স্তব্ধ। কাহারও মুখে কোনো কথা নাই। মীরাকে হঠাৎ হারাইয়া সকলেই যেন কেমন হইয়া গিয়াছে। যেন একটা বিরাট্ অভাব-বেদনা রাজপুরীকে পাইয়া বসিয়াছে।

এদিকে নদীর ধারে মীরা। সে প্রেমরাজ্যের অখণ্ড আনন্দের সংবাদ পাইয়াছে। তাহার অন্তর গিরিধারীর পবিত্র প্রেমামৃতে পূর্ণ। মৃত্যু তাহার নিকট অতি সামান্য। দেহ-বন্ধন ছিন্ন করিয়া প্রেমরাজ্যের মুক্ত-জীবন ধারার সহিত পরিচিত হইবার জন্য সে উৎকণ্ঠিত। সন্ধ্যার অন্ধকার নামিয়া আসিল। অদূরে আরতির শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। মীরার মন চঞ্চল। এখন যে তার গিরিধারীর কাছে প্রার্থনার সময়। বসিবার জন্য একটু স্থান খুঁজিল, ভাবিল—আর নয়, ঐ নদীর জলে আমার গিরিধারীর শান্তিময় কোলেই আমার স্থান। তাহার চক্ষু প্রেমে জ্বলিয়া উঠিল। সে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। কে যেন কোমল করপল্লবে তাহাকে আলিঙ্গন করিল। তাহার অবশ অঙ্গ এলাইয়া পড়িল। পলকের মধ্যে সে এক সুখময় বাঞ্ছিত স্বপ্নের রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সে দেখিতেছে—গিরিধারীর ক্রোড়ে তাহার দেহ রহিয়াছে। সুন্দর গোপাল সুকোমল হস্ত তাহার মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন। মীরা স্পষ্ট শুনিতে পাইল গিরিধারী বলিতেছেন—তোমার স্বামীর ঘরকরা শেষ হইয়াছে। এখন তুমি আর কাহারও নও। তুমি আমার। যাও বৃন্দাবনে, সেখানেই নিত্য আমার সহিত তোমার মিলন হইবে।

মীরা চক্ষু বুজিয়াছিল, চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। চন্দ্রকিরণে নদীবক্ষে তরঙ্গগুলি নাচিতেছে। মীরার সুখে তাহাদেরও আনন্দ। নদীর তীরে তীরে সে চলিল। কোথায় কোন্ পথে বৃন্দাবন তাহা সে জানে না। তবু সে চলিল। মুখে গিরিধারীর মধুর নাম, হৃদয়ে সুখময় স্পর্শ-স্মৃতি, কর্ণে তাহার বচনামৃত মাধুরী, নয়নে উজ্জ্বল রূপ-রেখা। দিবারাত্রির ভেদ ভুলিয়া সে চলিয়াছে, আত্মহারা-প্রেম-পাগলিনী-সাধিকা। দূর পথের ক্লেশ—দুর্গম বনের বিভীষিকা—হিংস্রজন্তুর বিকটভঙ্গি—মরুর তপ্তবালুকা—স্রোতস্বিনীর ক্ষুব্ধ জলরাশি, তাহার পথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিল না। তাহার একান্ত মনের তীব্রতার নিকট ক্ষুধা তৃষ্ণা পরাজিত হইয়া বিদায় লইয়াছে।

চিত্তের উৎস্রাবকর একটা উল্লাস ছড়াইয়া চলিয়াছে মীরা। পথে যাহারা দেখিল, ছুটিয়া কাছে আসিল। যাহারা শুনিল, ছুটিয়া চলিল। কেহ বলিল—পাগল। কেহ বলিল—প্রেমিক। কেহ বলিল—ব্রজের গোপী। কেহ বলিল—রাধা। ছোটরা আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়ায়—মীরা নাচিয়া নাচিয়া গান করে। বড়রা আসিয়া প্রণত হয়, মীরা তাহাদের নিকট গিরিধারীর মাধুরী বর্ণনা করে। দরিদ্র পল্লীবাসী দুধ লইয়া আসে, মীরা তাহাদের উপহার হাসিমুখে গ্রহণ করে। ধনীরা অনুগ্রহ করিবার ভঙ্গিতে অগ্রসর হয়, মীরা দূরে সঙ্কোচের সহিত সরিয়া যায়। অভিমানের বিষে ভরা ধনীর অনুগ্রহ সে চায় না। তাহার প্রাণ দরিদ্রের কাতরতার মধ্যেই সমবেদনার পরশমাণ অনুসন্ধান করে। মাতৃহারা শিশু ছুটিয়া আসে মীরার পদতলে। তাহারা মা বলিয়া ডাকিয়া তাহার রুদ্ধ মাতৃহৃদয়ের গোপনদ্বার খুলিয়া স্নেহ-অমৃতের ঝরণা প্রবাহিত করে। গ্রামবাসী মনে করে—সুপ্রসন্ন ভগবান্ এই পৃথিবীর কল্যাণের জন্যই এই দেবীকে মর্ত্যজগতে পাঠাইয়াছেন। রাখাল বালকেরা

গোচারণ ফেলিয়া ছুটিয়া আসে তাহার গান শুনিতে। তাহারা বলে--- তুমি কি বৃন্দাবনের রাধারাণী? তুমি এমন করিয়া কাঁদ কেন? গিরিধারী কি তোমাকে কোনো দুঃখ দিয়াছে? সে বলে---হ্যাঁ রে সেই গিরিধারী বড় নিষ্ঠুর, তাঁহাকে যে ভালবাসে তাহার এমন করিয়াই কাঁদিতে হয়। স্বপ্নের মত সে আসিল, আমি কি জানি সে চলিয়া যাইবে! আমি অভাগিনী চক্ষু মেলিয়া দেখিলাম---সে চলিয়া গিয়াছে। আমি কাটারী লইয়া নিজের বুকে বসাইয়া দিব। আমি আত্মহত্যা করিব! ব্যাকুল বিরহিণী অসহায় শিশুর মত কাঁদিয়া মরিতেছে। সে গান গায়---

ম্‌হাঁ ম্‌হারী হরিজী ন বুঝী বাত।
পিণ্ড মাংসূঁ প্রাণ পাপী নিকস ক্যুঁ নহীঁ জাত॥

পট ন খোলা মুখাঁ ন বোল্যা সাঁঝ ভঈ পরভাত।
অবোলণা জুগ বীতণ লাগো তো কাহেকী কুশলাত॥

সাবণ আবণ হোয় রহ্যো রে নহিঁ আবণ কী বাত।
রৈণ অঁধেরী বীজ চমকৈ তারা গিণত নিশি জাত॥

স্বপনমে হরি দরস দীন্হোঁ মৈ ন জান্যুঁ হরি জাত।
নৈণ ম্‌হারা উঘড় আয়া রহী মন পছতাত॥

লেই কটারী কণ্ঠ চীরূঁ করূঁগী অপঘাত।
মীরা ব্যাকুল বিরহণী রে বাল জ্যুঁ বিললাত॥

কখনো মীরা কাঁদিয়া কাঁদিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়ে। রাখাল বালকেরা তাহার যত্ন করে। মুখে চক্ষে জল দিয়া তাহার চেতনা সম্পাদন করে। মীরা কখনো বৃক্ষের তলায় গিরিধারীকে বসাইয়া তাহার সম্মুখে নৃত্য করিতে থাকে। গ্রামের ছেলে বুড়ো ছুটিয়া আসে সেই প্রেমবিহ্বল নৃত্য দর্শন করিতে। এই ভাবে সে বৃন্দাবনে আসিল। ব্রজভূমি শ্রীরাধা গোবিন্দের প্রেমলীলা-রসে অভিষিক্ত। সেখানে মীরার বান্ধব সকলেই।

ভক্তগণ পূর্ব হইতেই মীরার প্রেমের কথা শুনিয়াছেন। তাহারা দলে দলে এই প্রেমমত্ত গিরিধারী-প্রিয়ার দর্শনে আসিতে লাগিল। যে আসে, তাহার ভক্তি, কারুণ্য ও সরলতায় বিমোহিত হইয়া যায়।

ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম বৈষ্ণবাচার্য শ্রীজীব গোস্বামী তখন বৃন্দাবনে। মীরা আসিয়াছে তাঁহাকে দর্শন করিতে। শ্রীজীব আকুমার ব্রহ্মচারী। নিষ্কিঞ্চন বৈরাগী। মীরার দৃষ্টিভঙ্গী কতদূর শুদ্ধ হইয়াছে তাহার অন্তরের ভাবটি কিরূপ, উহা পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি বলিয়া পাঠাইলেন—মীরার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মীরা জিজ্ঞাসা করিলেন—কি কারণে আমি দর্শনে বঞ্চিত থাকিব জানিতে পারি কি? সংবাদবাহক বলিলেন গোস্বামীজি স্ত্রীমুখ দর্শন করেন না। মীরা বলিলেন—আমরা জানি বৃন্দাবনে এক গিরিধারীলাল পুরুষ আর সকলেই প্রকৃতি। তবে কেন তিনি পুরুষ অভিমানে আমাকে দর্শন দিবেন না? শ্রীজীব বুঝিলেন—মীরার অন্তর শুদ্ধ, এক পুরুষোত্তম গিরিধারী ভিন্ন তিনি অপর পুরুষের অস্তিত্বই জানেন না। মীরার আগ্রহে গোস্বামীজি দর্শন দান করিলেন এবং তাহাকে রাধাদামোদরের মাধুর্য উপদেশ করিলেন।

গৈরিক বসন পরিহিত এক রমণীয় দর্শন যুবা মীরার কুটির দ্বারে উপস্থিত। বাহিরে আসিয়া সে দেখিল। সেই যুবা আর কেহ নয়, মীরার সহিত যাহার বিবাহ হইয়াছে, সেই রাণা ভোজরাজ। বৃন্দাবনে বৈরাগীর বেশে আসিবার প্রয়োজন বুঝিতে আর বেগ পাইতে হইল না। ভোজরাজ অগ্রসর হইয়া মিনতির স্বরে বলিলেন—আমি তোমার দ্বারে ভিখারী। আমাকে ভিক্ষা দাও।

মীরা—আমি যে কাঙালিনী। আমি আপনাকে কি ভিক্ষা দিতে পারি?

রাণা—আমি যাহা চাহিব তুমি তাহা দিতে পার।

মীরা—তবে বলুন। সাধ্য হয় দিব।

রাণা—তোমাকে দেশে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তোমার চলিয়া আসার পর রাজ্যের উপর বহু বিপদ্ যাইতেছে। কাহারও প্রাণে শান্তি নাই, তুমি চল। আমি তোমাকে লইয়া যাইব বলিয়াই আসিয়াছি।

মীরা—আপনার আদেশ কখনো লঙ্ঘন করি নাই। আজও করিব না। যাইব দেশে ফিরিয়া তবে বলুন,- আমি মনের মত গিরিধারীর সেবা করিব।

ভোজরাজ মীরার কথায় রাজী হইলেন। মীরা পুনরায় চিতোরে আসিয়া কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন। কত ভক্ত সমাগম। চিতোরের প্রাণ ফিরিয়া আসিয়াছেন। সকল লোকের আনন্দ। গিরিধারীর সেবা, আরতি, অফুরন্ত উচ্ছ্বাস।

সুখের দিনগুলি কেমন করিয়া অতি শীঘ্র চলিয়া গেল। ভোজরাজ পরলোক গমন করিলেন। তাহার ভ্রাতা রাণা রতনসিংহ এখন সর্বময় কর্তা। মীরার ভক্তি তাহার সহ্য হইল না। তিনি নানাভাবে তাহার বিরোধিতা করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করিয়া মীরার নির্যাতন চলিল। প্রাচীনকালে প্রহ্লাদের উপর হিরণ্যকশিপুর নির্যাতন হইয়াছিল। ইহা শুনিয়া প্রাণ শিহরিয়া উঠে। ভক্তির গুণে প্রহ্লাদ সকল বিপদে রক্ষা পাইয়াছে। ভগবান্ তাহাকে কোলে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন।

নির্যাতিতা মীরার গিরিধারী-প্রেম উত্তরোত্তর বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। ভয়বিভীষিকা তাহার নাই। সে তখন প্রেমোন্মত্ত। গিরিধারী তাহার নিদ্রা হরণ করিয়াছে। শয্যা শূলের মত বোধ হয়। সে বলে—

হে রী মৈ তো প্রেম দিবানী, মেরো দরদ ন জানৈ কোয়
সূলী উপর সেজ হমারী, কিস বিধ সোনা হোয় ॥
গগন মণ্ডলপর সেজ পিয়াকী, কিস বিধ মিলনা হোয়।
ঘায়লকী গত ঘায়ল জানৈ, কী জিন লাগী হোয় ॥
জোহরীকী গত জোহরী জানৈ, কী জিন জোহরী হোয়।
দরদকী মারী বনবন ডোলুঁ বৈদ মিল্যো নহীঁ কোয় ॥
মীরাঁকী প্রভু পীর মিটৈ জব বৈদ সাঁবলিয়ো হোয় ॥

গিরিধারী যে তাহার মান অপমান সকলই হরণ করিয়াছেন। রাণা প্রতিদিন নব নব নির্যাতনের সুযোগ এবং উপায় খুঁজিতেছিল। একদিন রাণা পেটারিকায় একটি কাল-সর্প বদ্ধ করিয়া মীরার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বাহক বলিল—ইহার মধ্যে গিরিধারীর জন্য রত্নহার আছে। ভজন করিয়া আবিষ্টভাবে মীরা সেই পেটারিকা উন্মোচন করিয়া দেখিল। কোথায় রত্নহার—এ যে সুন্দর এক শালগ্রাম শিলা! সর্প দংশনে মৃত্যু হইল না। রাণা চিন্তিত হইলেন। মীরা কোনো যাদু জানে? সর্প কি মন্ত্রে শালগ্রাম শিলা হইয়া যায়? অপর একদিন রাণা এক পেয়ালা বিষ পাঠাইয়া দিয়াছেন। মীরা ভজন করিতেছিল। আবিষ্টভাবে বিষের পাত্র দাসীর হস্ত হইতে লইয়া মীরা সেই বিষ অমৃত ভাবিয়া খাইয়া ফেলিল। মীরা যে প্রেম-পরশমণি পাইয়াছে। তাহার স্পর্শে বিষ অমৃত হইয়া গেল।

সাঁপ পিটারো রাণা ভেজ্যো, মীরা হাথ দিয়ো জায় ॥
ন্হায় ধোয় জব দেখণ লাগী, সালগরাম গঈ পায় ॥
জহরকো প্যালো রাণা ভেজ্যো, অমরিত দিয়ো বণায়।
ন্হায় ধোয় জব পীবণ লাগী অমর হো গঈ জায় ॥

ফুল সেজ রাণানে ভেজী, দীজো মীরাঁ সুবায়।
সাঝ ভঈ মীরাঁ সোবণ লাগী, মানো ফুল বিছায়॥
মীরাঁকে প্রভু সদা সহাঈ, রাখো বিঘন হটায়।
ভক্তি ভাবসে মস্ত ডোলতী, গিরধর পৈ বলি জায়॥

বিষ কেমন করিয়া অমৃত হয়? লোকে শুনিয়া হাসিবে। আরে এ সব ভাবুকের কথা। যাহারা মর্ত্যলোকে অমৃতের সন্ধান পাইয়াছে —যাহাদের অন্তর গুরু-কৃপায় অভিষিক্ত হইয়াছে, তাহারা কিন্তু বলিবেন—অসম্ভব নয়। বিষও অমৃত হইতে পারে।

গুরু-কৃপা! অনাদি অতীতে জীবন ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। কত বিভিন্ন রূপে তাহার অভিব্যক্তি। মানুষ, পশু, কীট, পতঙ্গ, স্থাবর, জঙ্গম, কতভাবে অনন্তের সন্ধান। বিরাট, বিভু, ভূমা, অমৃতকে না পাইয়া তাহার বিরাম নাই। এই পথে চলিতে চলিতে কখনো উন্মুক্তার আলোকে জীবন উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সেদিন জড় স্পন্দন মন্দীভূত হইয়া চিন্ময় আধ্যাত্মিক জীবনের স্পন্দন আরম্ভ হয়। ইহাকেই বলে গুরু-কৃপা। তখন এই সংসার স্বপ্নের মত নশ্বর বলিয়া বিচার হয়। জগন্নাথের সন্ধান জীবনের গতি পরিবর্তিত করিয়া দেয়। মীরা গুরুকৃপায় এই সত্য দর্শন করিয়াছে। সে গান করে—

মোহে লগী লটক গুরুচরননকী।
চরণ বিনা মোহে কছু ন ভাবে।
জগমায়া সব সপননকী।
ভব সাগর সব সুখগয়ো হৈ।
ফিকর নহী মোহে তরননকী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর।
উলট ভঈ মেরে নয়ননকী॥

আমার মন গুরুচরণেই মজিয়াছে। আমার আর কিছু ভাল লাগে না। সংসার মায়ার স্বপ্ন। সংসার সমুদ্র আমার জন্য শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। আমি পারের জন্য আর চিন্তা করি না। মীরার প্রভু গিরিধর নাগর। তাঁহার দর্শনের জন্য চক্ষুর গতি বিপরীত হইয়াছে।

প্রাকৃতদৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া অন্তরের দৃষ্টি লাভ করিতে হইলে সদ্‌গুরুর প্রয়োজন। মীরা বলেন—আমি দাঁড়াইয়া পথে অপেক্ষা করিতেছিলাম, পথের সন্ধান কেহ জানে না, আমার প্রাণের কথা কেহ বুঝে না। সদ্‌গুরু আসিয়া আমায় ঔষধ দিলেন, তাহার উপদেশে আমার প্রতি রোমকূপে শান্তি অনুভব করিলাম। বেদ পুরাণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ—সদ্‌গুরুর মত আর চিকিৎসক নাই। মীরার প্রভু গিরিধর নাগর। তিনি চিরকাল অমর লোকে বাস করেন।

গড়ী খড়ী রে পন্থ নিহারূঁ, মরম ন কোঈ জানা।
সতগুরু ওষধ ঐসী দীনী, রোম রোম ভয়ো চৈন।।
সতগুরু জৈসা বৈদ ন কোঈ, পূছো বেদ পুরানা।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, অমর লোকমে রহনা।।

মীরার আশা পূর্ণ হইয়াছে। তাহার সন্ধানের বস্তু মিলিয়াছে। যে তাহার রোগ দূর করিবে সেই চিকিৎসক পাওয়া গিয়াছে। এখন তাহার অন্তর নবভাব-প্রেরণায় নাচিয়া উঠিতেছে। অফুরন্ত উল্লাস—অবর্ণনীয় ব্যঞ্জনা।

জব জব সুরত লগী বা ঘরকী, পল পল নৈনাঁ পানী।
রাত দিবস মোহে নীদ ন আবত ভাবে অন্ন ন পানী।।

মীরা বলে—যখনই চিরসুখময় নিত্য-গোলোকে আনন্দ মন্দিরের কথা আমার মনে উঠে আমার চক্ষু জলে ভরিয়া যায়। আমার মনে বিরহ ব্যথা তীব্র হইতে তীব্রতর হয়। দিনে বা রাত্রিতে আমার ঘুম

নাই। আমার পিপাসা ক্ষুধা দূর হইয়া গিয়াছে। দুঃখের কথা কাহার কাছে বলিব? আমি নানাস্থানে শান্তির সন্ধান করিয়া বেড়াই। কেহ তো আমাকে সেই সন্ধান দেয় না। চিকিৎসক তো পাই না!

"রৈদাস সন্ত মিলে মোহে সদগুরু, দীনী সুরত সহদানী।"

সদ্‌গুরু রুইদাস সাধুকে পাইলাম। তিনি আমাকে নামরত্ন দান করিলেন। আমি সেই নাম স্মরণ করিতে করিতে সাধনার পথে অগ্রসর হইয়া আমার প্রিয়তমকে পাইলাম। তখনই আমার প্রাণের ব্যথা দূর হইল। আমি ঘর চিনিলাম।

মৈ মিলী জায়, পায় পিয়া অপনে, তব মেরী পীর বুঝানী।

হে গুরুদেব, তোমার কৃপায় আমি ঘর চিনিলাম। এখন তুমি আমাকে একা ফেলিয়া যাইও না। আমি অবলা। আমার কিছু সামর্থ্য নাই। একমাত্র তুমি আমার উদ্ধারকর্তা। আমার কোনো গুণ নাই। তুমি সকল গুণের আশ্রয়। তুমি সমর্থ। তোমাকে ভিন্ন আমি এখন কোথায় যাই? এস মীরার প্রভু, আর যে কেহ নাই। এখন তাহার সম্ভ্রম রক্ষা করো। মীরার আশা সেই সদ্‌গুরুর কৃপা।

ছোড় মত জাজ্যো জী মহারাজ।
মৈ অবলা, বল নাহিঁ, গুসাঁঈ! থে হো ম্হারা সিরতাজ॥
মৈ গুণহীন, গুণ নাহিঁ গুসাঁঈ! থে সিমরথ মহরাজ।
রাবরী হোয়কে কিণরে জাউঁ ছো মহারে হিবড়েরো সাজ।
মীরাকে প্রভু ঔর না কোঈ, রাখো অবকী লাজ॥

হে গুরুদেব, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইও না। আমি অবলা, তুমি সমর্থ প্রভু। আমি গুণহীনা, তুমি গুণবান। আমি উন্মাদ হইয়াছি। আমি কোন্ পথে যাইব উহা তুমিই নির্দেশ করিবে। মীরার প্রভু তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই। এখন তুমি আমার লজ্জা রক্ষা কর।

মীরার পথপ্রদর্শক রুইদাস প্রসিদ্ধ সাধু। ভক্তির স্পর্শমাত্র অপবিত্র কি ভাবে পবিত্র হইয়া যায়, তাহার আদর্শ এই সাধু। ভারতবর্ষ বর্ণাশ্রম ধর্মের জন্য প্রসিদ্ধ। বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, বর্ণাশ্রম ধর্মের মহিমা বর্ণনা করেন। এই সকল নিয়ম-তান্ত্রিক ধর্মশিক্ষার মধ্যেও কিরূপ এক উদার সর্বব্যাপক ভক্তির শিক্ষা রহিয়াছে, উহা আলোচনা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। শুদ্ধাভক্তি অতি হীনজনকেও সমাজের শীর্ষস্থানে উপবেশন করাইয়া পূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছে। দীনদয়াল প্রভুর কৃপায় ছোট বড হয়, অতি হীনব্যক্তি ভক্তি করিয়া মহাজন হয়।

জাতি ভী ওছী, করম ভী ওছা,  
ওছা কিসব হমারা।  
নীচেসে প্রভু উঁচ কিয়ো হৈ,  
কহ রৈদাস চমারা॥

চামার রুইদাস বলেন—আমার জাতি মন্দ, কর্মও মন্দ, তথাপি আমার মত হীনের প্রভু কেশব। আমি নীচ হইলেও তিনি আমাকে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন।

রুইদাস কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। কবীর স্বামীর সহিত তাহার সংসঙ্গ হইয়াছে। কথিত আছে, রামানন্দ স্বামীর অভিশাপে তিনি ব্রাহ্মণ কুল হইতে চামার কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ছেলেবেলা হইতেই রুইদাস সাধুসেবা করিতে ভালবাসিতেন। এই জন্য তাহার পিতা রঘু রাগ করিয়া তাহাকে বাডীর বাহির করিয়া দেয়। রুইদাস একটি ঝোপের ভিতর থাকিয়া জুতা সেলাই করিতেন। তাহার কৃষ্ণনাম জপের বিরাম ছিল না। তিনি দিনের শেষে নিজের কর্ম দ্বারা যাহা কিছু উপার্জন করিতেন, উহা সাধু ও দেবতার সেবায় ব্যয় করিতেন। রুইদাস ও তাহার স্ত্রী সাধু ও দেবতার প্রসাদ ভোজন করিতেন। তাহারা ছিলেন যথালাভে সন্তুষ্ট। আদর্শ সাধু। সম্মুখে এক মন্দিরে ছিল

ভগবানের বিগ্রহ। সেই বিগ্রহের প্রতি তাহার অত্যন্ত প্রীতি ছিল। প্রেমময় প্রভুর স্মরণ করিয়া তিনি আপন মনে গান করিতেন। সেই গানের সুর আজও মরমীর অন্তরে বাজিতে থাকে।

প্রভুজী, তুম চন্দন হম পানী। জাকী অঙ্গ অঙ্গ বাস সমানী॥
প্রভুজী তুম ঘন বন হম মোরা। জৈসে চিতবত চন্দ চকোরা॥
প্রভুজী তুম দীপক হম বাতী। জাকী জোতি বরৈ দিন রাতী॥
প্রভুজী তুম মোতী হম ধাগা। জৈসে সোনহি মিলত সোহাগা॥
প্রভুজী তুম স্বামী হম দাসা। ঐসী ভক্তি করৈ রৈদাসা॥

ভগবান্ এই দরিদ্র ভক্তের অভাব দূর করিবার জন্য এক সাধুর বেশে আসিলেন। রুইদাস বলেন—আপনি কে? আমাকে অনুগ্রহ করিতে আসিয়াছেন।

আগন্তুক বলেন—রুইদাস, আমার কাছে স্পর্শমণি আছে। উহা তোমাকে দিতে আসিয়াছি। উহার স্পর্শে লোহা সোনা হইয়া যায়।

রুইদাস বলেন—উহাতে আমার প্রয়োজন নাই।

আগন্তুক সাধু উহা দিয়া বলেন—এই দেখ লোহার যন্ত্রটি সোণার হইয়া গেল। ইহা ঘরে থাকিলে সময়ে অসময়ে কাজে লাগিবে।

রুইদাস বলেন—একান্ত আগ্রহ হয়—রাখিয়া যান। বৎসর অতীত—আবার সেই সাধু আসিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করেন—রুইদাস, স্পর্শ-মণি কোনো কাজে লাগিল?

রুইদাস বলেন—উহা আপনি যেখানে রাখিয়াছিলেন সেখানেই আছে। লইয়া যাইতে পারেন। আমি নাম-স্পর্শমণি পাইয়াছি। অপর কোনো স্পর্শমণিতে আমার প্রয়োজন নাই।

কাশীবাসী এক ব্রাহ্মণ জমিদারের মঙ্গলের জন্য প্রতিদিন গঙ্গাকে তাম্বুল পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেন। একদিন সেই ব্রাহ্মণ রুইদাসের

সমীপে আসিয়াছেন জুতা ক্রয় করিবেন। কথা প্রসঙ্গে গঙ্গাপূজার কথা উঠিল। রুইদাস বলেন – আপনি জুতা লইয়া যান, মূল্য দিতে হইবে না। তবে যদি ঘৃণা না করেন, আমার নামে একটি সুপারি গঙ্গাকে দিলে আমি কৃতার্থ হই। ব্রাহ্মণ সুপারি লইয়া নিজের নিকট রাখিলেন। পরদিন গঙ্গাপূজার সময় সেই সুপারি গঙ্গাকে অর্পণ করিতেছেন। তিনি দেখেন—অতি আশ্চর্য ঘটনা। কোনোদিন এরূপ অপূর্ব দৃশ্য দৃষ্টিগোচর হয় নাই। সত্যই গঙ্গাদেবী হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রসন্ন বদনে রুইদাসের উপহার সুপারি গ্রহণ করিলেন। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন – জাতির বড়াই কিছু নয়। দেবতার নিকট ভক্তিরই মূল্য।

তাহার স্বাভাবিক সরল উদার প্রাণের ভক্তি-স্পর্শে অগণিত হৃদয় পবিত্র হইয়াছে। তিনি বলেন – হে নরহরি, আমার মন যে বড়ই চঞ্চল। আমি কেমন করিয়া ভক্তি করি ? তুমি আমাকে দেখ, আমিও যদি তোমাকে দেখি তবে তো পরস্পর প্রীতি হইবে। তুমিই আমাকে দেখিবে, আর আমি তোমার মুখ দেখিব না, এরূপ বিচারে বুদ্ধি নষ্ট হয়। তুমি তো সকলের শরীরেই আছ। আমি তো তোমাকে দেখিতে শিখিলাম না। তোমার অনন্ত গুণ, আমি কেবল দোষের খনি। তোমার উপকার আমি মানি না। আমি তোমার সমীপে যত দোষই করি না কেন তুমি নিস্তার করিবে। হে করুণাময়, জগতের আধার তোমার জয় হোক।

তীর্থ যাত্রায় আসিয়া কাশীধামে রুইদাসের নিকট মীরা তাহার শুদ্ধ-ভক্তির শিক্ষা লাভ করিলেন। তাহার সদ্‌গুরু লাভ হইল।

অনেকে সদ্‌গুরু অন্বেষণ করেন। কেহ কেহ মনে করেন, এক-মহাপুরুষ পাইলেই হইল। সাধন ভজনের পরিশ্রম স্বীকারের প্রয়োজন নাই। গুরু সব ঠিক করিয়া লইবেন। কথাটির মধ্যে কিছু রহস্য আছে। সদ্‌গুরুকে যথার্থ শরণ্য বলিয়া ক'জন গ্রহণ করিতে পারে ?

গর্ভিণীই গর্ভবেদনা জানে অপরে নয়। অসহ্য অসহায় অবস্থার মধ্যদিয়া গুরুকৃপা লাভ হয়। মীরা জানে গুরুকৃপা ভিন্ন গোবিন্দের মাধুরী অনুভব করা সম্ভব হয় না। গোবিন্দ গুরুরূপে সাধকের নিকট নিজের মাধুরীকে প্রকাশ করেন। গুরু সম্বন্ধে জাগতিক সম্বন্ধ তুচ্ছ হইয়া যায়। মীরার এই অবস্থা হইয়াছে। সে বলে—আমি শ্বশুর, শাশুড়ী বা প্রিয়পতি কাহারই নই। আমার প্রেম অন্যত্র নাই। মীরা গুরু রুইদাসকে পাইয়াছে। তাঁহার কৃপায় গোবিন্দের সহিত মিলন হইয়াছে।

নহী মৈ পীহর সাসরেরে, নহীঁ পিয়া পাস।

মীরা নে গোবিন্দ মিলিয়ারে, গুরু মিলিয়া রৈদাস॥

সদ্‌গুরু আমাকে বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন। উহা আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া রহিল। বিরহ শূল আমার বুকে আমাকে যে ব্যাকুল করিয়া তুলিল। আমার মন আর কোনো বিষয়ে যায় না। প্রেমের ফাঁসে মন বাঁধা পড়িয়াছে। আমার প্রাণপ্রিয় ভিন্ন এই ব্যথার সাথী আর কেহ নাই। আমি যে নিরুপায়। কি করি? দুই চক্ষুতে যে অবিরল ধারা। মীরা বলে—হে প্রভু, তোমার সহিত মিলন বিনা যে আর প্রাণ ধারণ করা যায় না।

রী মেরে পার নিকস গয়া সতগুরু মারয়া তীর।

বিরহ ভাল লগী উর অংদর ব্যাকুল ভয়া শরীর॥

ইত উত চিত্ত চলৈ নহি কবহুঁ ডারী প্রেম জঁজীর।

কৈ জাণৈ মেরো প্রীতম প্যারো ঔর ন জাণৈ পীর

কহা করূঁ মেরো বস নহিঁ সজনী নৈন ঝরত দোউ নীর।

মীরা কহৈ প্রভু তুম মিলিয়াঁ বিন প্রাণ ধরত নহিঁ ধীর॥

মীরার প্রিয় গিরিধারী লালের নিমিত্ত আকুলতার অবধি নাই। বৃন্দাবনে বৃষভানুদুলালীর প্রেম আকুলতা নবরূপ পাইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে

তাহার কাতর-কণ্ঠের প্রিয়-সম্ভাষণে। দর্শনের নিমিত্ত অফুরন্ত কামনা লইয়া তিনি বলিতেছেন,—হে প্রিয়তম, এস দেখা দাও। তোমার বিরহে মীরা কেমন করিয়া প্রাণ ধারণ করিবে? কমল কি কখনো জল ছাড়িয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে? সে শুকাইয়া যায়। চন্দ্রভিন্ন রজনীর সার্থকতা নাই। মীরার জীবন তোমার বিরহে—অদর্শনে সেইরূপ হইয়াছে। নিশিদিন এই আকুলতার বিরাম নাই। তোমার বিরহ অন্তরে পীড়া দিতেছে। দিনে ক্ষুধার অন্ন পড়িয়া থাকে, মুখে তুলিয়া দিবার আগ্রহ নাই। রাত্রিতে বিরহ-জাগরণ নিদ্রা হরণ করিয়াছে। মুখে কথা নাই। কি বলিব, কণ্ঠে বাণী নিঃসরণ হয় না। তুমি একবার দর্শন দিয়া তাহার সন্তাপ দূর কর। হে অন্তরের দেবতা, তুমি তো প্রাণের কথা জানো। কেন তাহার তৃষ্ণা বাড়াইতেছ? এস তোমার জন্ম জন্মান্তরের দাসী মীরা তোমার চরণ প্রান্তে লুটাইবে।

প্যারে দরশন দীজ্যো আয়, তুম বিন রহ্যো ন জায়।
জল বিন কমল চন্দ বিন রজনী, ঐসে তুম দেখ্যাঁ বিন সজনী॥
আকুল ব্যাকুল ফিরূঁ রৈণ দিন, বিরহ কলেজো খায়।
দিবস ন ভূখ নীঁদ নহিঁ রৈনা, মুখসূঁ কথত ন আবৈ বৈনা॥
কহা কহূঁ কছু কহত ন আবৈ, মিলকর তপত বুঝায়।
কূঁ্য তরসাবো অন্তরজামী, আয় মিলো কিরপা কর স্বামী।
মীরা দাসী জনম জনমকী, পড়ী তুম্হারে পায়॥

আমি যে তোমার প্রেমে বৈরাগিনী হইয়াছি। আমার ব্যথার কথা কি কেহ বুঝিতে পারে না? শূলের উপর আমার শয্যা। কেমন করিয়া নিদ্রা যাইব? আমার প্রিয়ের সহিত মিলন হইবে। সে যে দূর দূরান্তরে। যাহার অন্তর ব্যথা সে জানে উহার তীব্রতা কতখানি। যাহার মোটে ব্যথা লাগে নাই সে কি করিয়া ব্যথার ব্যথী হইবে?

আমি আমার ব্যথার চিকিৎসক খুঁজিয়া সকল দ্বারেই ফিরিয়া আসিয়াছি। যোগ্য চিকিৎসক পাই না। মীরার প্রভু কি বুঝিতেছে না—শ্যামলসুন্দর গিরিধারী লাল ভিন্ন এই ব্যথা দূর করিবার আর চিকিৎসক নাই! হে সুন্দর শ্যাম, তুমি কি জানন।—

তুম্ বিচ্ হম্ বিচ্ অন্তর নাহি
জৈসে সূরজ ধাম।।
মীরাকে মন অওর ন মানে
চাহে সুন্দর শ্যাম।।

তোমার ও আমার মধ্যে কোনো অন্তরাল নাই। সূর্য ও তাহার কিরণকে কেহ কি পৃথক্ করিতে পারে? মীরার মন কেবল সেই সুন্দর শ্যামলকে চাহিতেছে আর কিছুই সে চাহে না।

অক্রূর আসিয়া কৃষ্ণকে মথুরায় লইয়া গেল। গোপী বিরহ-সমুদ্রে পার কূল দেখিতেছে না। কৃষ্ণ নাম লইয়া তাহারা নিশিদিন চক্ষুর জলে ভাসিয়া যাইতেছে। কৃষ্ণ মিলনে যেমন গভীরতম আনন্দ-উচ্ছ্বাস, বিরহে—কৃষ্ণ অদর্শনে তেমনি গভীরতম অকূরন্ত দুঃখ তাহাদিগকে অভিভূত করিয়াছে। মীরা মাঝে মাঝে সেই মহিমাময়ী ব্রজগোপীর মত তাহার প্রিয়তম যেন দূরে চলিয়া গিয়াছে, এই ভাবিয়া কাতর। সে বলে—

আমার প্রাণের কথাগুলি কেহ কি প্রিয়তমের নিকট বলিয়া আসিবে? আমার চিত্ত চুরি করিয়া প্রিয়তম অপর কাহার আনন্দবর্ধন করিতেছে। সে কি জানে না তাহাকে ভিন্ন আমার আর কেহ নাই। মীরা তাহার শরণাগত। 'এই আসিতেছি' বলিয়া প্রিয় চলিয়া গেল; বহুদিন অতীত হইল। আমার জীবনের দিনগুলি ফুরাইয়া গেল। আর বেশীদিন অবশিষ্ট নাই। মীরা করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছে—প্রিয়তম, মীরার সহিত আসিয়া মিলিত হও। এস প্রিয়, আমার গৃহে এস। তুমি যে আমার।

তোমার পথ চাহিয়া বসিয়া আছি। তুমি কি অপর প্রেমিকার প্রেম-ফাঁদে ধরা পড়িয়াছ? তোমার দর্শনভিন্ন দিন যে আর কাটে না।

কৃষ্ণ ভাবনায় মীরা রাত্রিজাগরণ করে। যাহার অন্তরে প্রেম জাগরূক তাহার নিদ্রা হয় না। নিদ্রা তমোধর্ম। প্রেম গুণাতীত। জড়তা দূর করিয়া মনের রাজ্য আনন্দ-আলোকে পূর্ণ করিয়া দেয় প্রেম। বাহিরের অন্ধকারে প্রেমিকের মন অন্ধকার হয় না। অন্ধকারে অন্য সকল পথ অদৃশ্য হইয়া গেলে প্রেম পথের যাত্রী অভিসার করে। প্রেমিক আত্মগোপন করিয়া প্রেমময়ের সন্ধান করে। আর সকলে ঘুমাইয়া পড়ে তখন তাহার প্রেম-সাধনা চলিতে থাকে। সকলে যখন জাগিয়া থাকে প্রেমিক তখন নিদ্রা যায়। প্রেমিকের বিপরীত গতি। সহচারিণীকে সম্বোধন করিয়া সে বলে—

সখি, আর সকলে ঘুমাইয়া পড়িল। শুধু বিরহিণী আমার চক্ষুতে ঘুম নাই। আমি চক্ষের জলে মালা গাঁথিব? আকাশের নক্ষত্র গণনা করিয়াই আমার রাত্রি প্রভাত হইবে? আমার সুখের সময় কি আসিবে না? মীরার প্রভু গিরিধর নাগর আসিলে যেন আর ছাড়িয়া না যায়।

মৈ বিরহিন বৈঠী জাগূঁ, জগত সব সোবে রী আলী।
বিরহিন বৈঠী রঙ্গমহলমেঁ মোতিয়নকী লড় পোবে।
এক বিরহিন হম ঐসী দেখী, অঁসুবন মালা পোবে॥
তারা গিন-গিন রৈন বিহানী, সুখকী ঘড়ী কব আবে।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, মিলকে বিছুড় ন জাবে॥

প্রিয়তম আমার নিদ্রাসুখ হরণ করিয়াছে। তাহার পথ চাহিয়া রাত্রি শেষ হইয়া গেল। সখী কত প্রবোধ দিল। আমার মন যে কোনো কথাই শুনে না। তাহার অদর্শনে কাল কাটে না। অঙ্গ অবশ হইল। কণ্ঠে শুধু প্রিয়-নাম। বিরহের ব্যথা প্রিয়তম জানে না। চাতক

আকুল প্রাণে মেঘের আহ্বান করে। প্রিয়ের নিমিত্ত আমারও সেই দশা। বিরহে আমি আত্মহারা হইয়াছি। ভালমন্দ কিছুই বুঝি না।

সখী মেরী নীঁদ নসানী হো।
পিবকো পন্থ নিহারত সিগরী রৈন বিহানী হো।
সব সখিয়ন মিল সীখ দঈ, মৈ এক ন মানী হো।
বিন দেখে কল নহীঁ পরত, জিয় ঐসী ঠানী হো॥

মীরা প্রেম-পত্র লিখিবে বলিয়া মনে করিতেছে। আমি পত্র লিখিয়া পাঠাইব। শ্যামসুন্দর জানিয়া শুনিয়াই কি আমাকে এরূপ দুঃখভাগী করিতেছে? আমি উচ্চ অট্টালিকার ছাদে উঠিয়া দূরে পথের দিকে চাহিয়া থাকি। কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমার চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করে। অদর্শনে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইয়াছে। পূর্ব জন্মের সাথী প্রিয়তম প্রভুর সহিত আর কবে মিলিত হইব?

ব্রজ গোপীর কৃষ্ণ বিরহ-কথা শুনিয়াছি। তাহাদের সংবাদ বহন করিয়া মথুরায় দূতী আসিয়াছে। তাহার মুখে ব্রজের কথা শুনিয়া কৃষ্ণের ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। মীরার দূতী নাই। সে প্রিয়তমের নিকট প্রেম-পত্র লিখিয়া পাঠাইবে। তাহার অন্তরের তীব্র বেদনায় ভরা পত্র শ্যামল সুন্দরের হৃদয় বিগলিত করিবে। কিন্তু পত্র লিখিতে বসিয়াও মীরা স্থির থাকিতে পারে না। সে বলে—

মেরে প্রীতম প্যারে রামনে লিখ ভেজ্ রী পাতী।
শ্যাম সনেসো কবহুঁন দীন্হে জান বুঝ বাতী॥
ঊঁচী চঢ় চঢ় পংথ নিহারূঁ রোয় রোয় অঁখিয়াঁ রাতী।
তুম দেখ্যা বিন কল ন পরত হৈ হিয়ো ফটত মোরী ছাতী।
মীরাকে প্রভু কবরে মিলোগে পূরব জনমকে সাথী॥

আমি কেমন করিয়া পত্র লিখি? লিখিতে বসিয়া হাতের কলম

যে কাঁপিতে লাগিল। হৃদয়-বৃত্তি স্থগিত হইয়া রহিল। কি লিখিব, কোনো কথাই যে মনে আসে না। আমার চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। কিছুই যে দেখিতে পাই না। আমি কেমন করিয়া তাহার চরণ ধরিব, সর্বঅঙ্গ অবশ হইল। মীরার প্রভু গিরিধর নাগর সকলই ভুলাইয়া দিল।

মীরা গিরিধরের জন্য সব কিছু করিতে স্বীকার। তাহার প্রাণ বলে—আমি তাদৃশ ভাগ্যশালিনী নই বলিয়া গিরিধারী আমার সহিত মিলিত হইতেছেন না। তিনি তো প্রেমপিপাসু। তবে কেন এখনো আমি তাহার হৃদয় জয় করিতে পারিলাম না? আমার প্রেমে তো কোনো দাগ নাই।

পতিয়া মৈ কৈসে লিখুঁ লিখিহী ন জাঈ।
কলম ধরত মেরে কর কংপত হিরদো রহো ঘরাঈ॥
বাত কহুঁ মোহি বাত ন আবৈ নৈন রহে ভরাঈ॥
কিস বিধ চরণ কমল মৈ গহি হো সবহি অংগ থরাঈ॥
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর সবহী দুখ বিসরাঈ॥

প্রিয় গিরিধরকে যে ভাবে পাওয়া যায় আমি তাহাই করিব। যাহারা ভাগ্যবান্ তাহারাই তাহার মন অধিকার করিয়া লয়। আমি তাহার গৃহে যাইব। আমার সত্য প্রেমের রূপে তাহাকে লুব্ধ করিব। গভীর রাত্রিতে অভিসারিণী হইব। ভোর বেলা কাহাকেও জানিতে না দিয়া উঠিয়া ঘরে আসিব। তাহার সঙ্গ পাইলে নিশিদিন তাহার সঙ্গে খেলা করিব। আমাকে যে বস্ত্র পরিতে দিবে তাহাই পরিধান করিব। যাহা খাইতে দিবে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। তাহার সহিত আমার পুরানো প্রেম। তাহাকে ভিন্ন এক নিমিষের জন্যও কাল কাটে না। যেখানে বসিতে দিবে আমি সেখানেই বসিব। প্রভু গিরিধর নাগর যদি মীরাকে বিক্রয় করিয়া ফেলে মীরা বিক্রীত হইয়াই যাইবে।

মৈঁ গিরিধরকে ঘর জাউঁ।
গিরিধর ম্হঁয়রো সাঁচো প্রীতম, দেখত রূপ লুভাউঁ॥
রৈণ পড়ৈ তবহী উঠ জাউঁ ভোর ভয়ে উঠি আউঁ।
রৈণ দিনা বাকে সঁগ খেলূঁ জ্যুঁ ত্যূঁ রিঝাউঁ॥
জো পহিরাবৈ সোঈ পহিরূ জো দে সোঈ খাউঁ।
মেরী উণকী প্রীতি পুরাণী উন বিন পল ন রহাউঁ॥
জহা বৈঠাবে তিতহী বৈঠূঁ বেচৈ তো বিক জাউঁ।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর বার বার বলি জাউ॥

শ্যামের প্রেমে ভিখারিণী মীরা বিহ্বল হইয়াছে। সে বলে—আমি কেবল গোবিন্দের গুণ গান করিব। রাজা যদি মহল হইতে তাড়াইয়া দেয় নগরে ভিক্ষা করিয়া দিন যাপন করিব। প্রাণের হরি যদি আমার উপর রাগ করেন আমার যে আর যাইবার কোনো স্থান নাই। রাজা বিষের পেয়ালা পাঠাইয়াছিল আমি উহা অমৃত বলিয়া পান করিয়াছি। পেটারিকার মধ্যে বিষধর সর্প পাঠাইয়াছিল উহাকে আমি শালগ্রাম-শিলা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আমার আর ভয় নাই। শ্যামের বর পাইয়া মীরা ধন্য হইয়াছে।

মৈ গোবিন্দ গুণ গানা।
রাজা রূঠে নগরী রাখৈ হরি রূঠ্যা কহঁ জানা।
রাণা ভেজ্যা জহর পিয়ালা ইমিরত করি পী জানা॥
ডবিয়ামে ভেজ্যা জ ভূজংগম সালিগরাম কর জানা।
মীরা তো অব প্রেম দিবানী সাঁবলিয়া বর পানা॥

ভক্ত ও ভগবানের প্রেমময় নিত্য সম্বন্ধটিকে মীরা যে ভাবে অনুভব করিয়াছেন উহা বড়ই সুন্দর! তিনি বলেন—সে সম্বন্ধ ছিন্ন করিলেও ছিন্ন হইবার নয়।

জো তুম্ তোড়ো পিয়া মৈঁ নহিঁ তোড়ুঁ।
তোরী প্রীত তোড়ি প্রভু কোন সংগ জোড়ুঁ॥

হে প্রিয়, তুমি ছিন্ন করিলেও তোমার প্রীতির বন্ধন আমি ছিন্ন করিব না। তোমার বন্ধন ছিন্ন করিয়া আর কাহার সহিত আবদ্ধ হইব? তোমার সঙ্গে আমার অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তুমি বৃক্ষ, আমি আশ্রিত পক্ষী। তুমি সরোবর, আমি বিহারকারী মীন। তুমি গিরিবর, আমি ক্ষুদ্র অঙ্কুর। তুমি চন্দ্র, আমি সুধাপিয়াসী চকোর। তুমি মুক্তা মণি, আমি উহার মধ্যস্থিত সূত্র। তুমি স্বর্ণ, আমি উহা বিগলিত করিবার নিমিত্ত সোহাগা। তুমি ব্রজবাসী, মীরার তুমি প্রভু, তুমি ঠাকুর, আমি তোমার দাসী।

তুম ভয়ে তরুবর মৈঁ ভঈ পঁখিয়া।
তুম ভয়ে সরোবর মৈঁ তেরী মছীয়াঁ॥
তুম ভয়ে গিরিবর মৈঁ ভঈ চারা।
তুম ভয়ে চংদা হম ভয়ে চকোরা॥
তুম ভয়ে মোতী প্রভু হম ভয়ে ধাগা॥
তুম ভয়ে সোনা হম ভয়ে সোহাগা॥
বাঈ মীরাকে প্রভু ব্রজকে বাসী।
তুম্ মেরে ঠকোর মৈঁ তেরী দাসী॥

বিশুদ্ধ প্রেমের পরিচয় হয় সেবার নিমিত্ত লালসার মধ্য দিয়া! সেবা-লালসা দাস্যভাবের অনুকূল হইলে উহা হয় সর্বপ্রকার আত্মসুখ গন্ধহীন। এই জাতীয় প্রেমের মধ্যেই পাওয়া যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব পণ্ডিতগণের মঞ্জরী ভাবের গৌরব। মীরা ভোগ-আকাঙ্ক্ষা রহিত। স্বতন্ত্র নায়িকার ভাবটি তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন। মধুর রসের মধ্য দিয়া প্রেমসেবা করিবার নিমিত্ত আকুলতা তাহার গানের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। মীরা বলেন—প্রভু তুমি আমাকে সত্যকার দাসী করিয়া লও। মিথ্যা-সন্মানের বন্ধন ছিন্ন কর। আমার বুদ্ধির গৃহ লুণ্ঠিত

হইল। আমার বিচার বল কোনো কাজেই লাগিল না। হে প্রভু, আমার কোনো সামর্থ্য নাই ; তুমি শীঘ্র আসিয়া আমার সহায় হও। আমি নিত্য ধর্ম উপদেশ শুনি, মন আমার অসৎকর্মকে ভয় করে, সাধুসেবাও করি, তোমার ধ্যানে-চিন্তায় মন স্থির করি, কিন্তু প্রভু, তোমার সাহায্য বিনা কিছুই হইবার নয়। এই দাসী মীরাকে ভক্তির পথ দেখাইয়া সত্যকার দাসী করিয়া লও।

মীরাকে প্রভু সাচী দাসী বানাও
ঝুটে ধংধোঁ সে মেরা ফংদা ছুড়াও
লুটে হী লেত বিবেককা ডেরা বুধি বল যদপি করূ বহুতেরা
হায় রাম নহি কছু বস মেরা মরতহূঁ বিরস প্রভু ধাও সবেরা
ধরম উপদেশ নিত প্রতি সুনতীহূঁ মন কুচালসেভী ডরতীহূঁ
সদা সাধু সেবা করতীহূঁ সুমিরণ ধ্যানমেঁ চিত ধরতী হূঁ
ভক্তিমার্গ দাসীকো দিখাও মীরাকো প্রভু সাচী দাসী বনাও ॥

হে শ্যামল, আমাকে চাকর রাখ। বার বার মিনতি করিয়া বলি--- আমাকে চাকর রাখ। আমি তোমার চাকর হইয়া বাগান করিব। প্রতিদিন প্রাতঃকালে তোমার দেখা পাইব। বৃন্দাবনের প্রতিটি গলিতে তোমার গুণ গাহিয়া বেড়াইব। চাকরীর মূল্য দর্শন, হাতখরচ তোমার স্মরণ, আর প্রেমভক্তি জায়গীর এই তিনটিই ভাল রকম লাভ হইবে তোমার সেবায়। বাগান করিয়া মাঝে মাঝে স্থান রাখিব। হে শ্যামল সেই শোভার মধ্যে আমি তোমার দর্শন-সুখে নিমগ্ন হইয়া থাকিব। যোগী যোগ সাধনার জন্য আসিয়াছে—তপস্বী তপস্যার জন্য আসিয়াছে হরি ভজনের নিমিত্ত বৃন্দাবনবাসী সাধু আসিয়াছে—মীরার প্রভু গভীর হৃদয়ের অন্তরতম হইয়া থাকিও। তুমি অর্ধরাত্রে প্রেম নদীর তীরে দেখা দিয়াছ।

ম্হানে চাকর রাখোজী সাবরিয়া ম্হনে চাকর রাখোজী
চাকর রহস্যূঁ বাগ লগাস্যূঁ নিত উঠ দরসণ পাস্যূঁ
বৃন্দাবনকী কুংজ গলিনমে তেরী লীলা গাস্যূঁ
চাকরীমেঁ দরসণ পাউঁ স্মিরণ পাউঁ খরচী
ভাব ভগতি জাগীরী পাউঁ তিনো বাতাঁ সরসী
হরে হরে সব বন বনাউঁ পহি কুসুম্ভী সারী
জোগী আয়া জোগ করনকূঁ তপ করনে সন্ন্যাসী
হরি ভজনকু সাধু আয়ো বৃন্দাবনকে বাসী
মীরাকে প্রভু গহির গঁভীরা হৃদে রহোজী ধীরা
আধী রাতে দরসন দীন্হে প্রেম নদীকে তীরা ॥

আর সকলে মদ খাইয়া মাতাল হয়। আমি মদ না খাইয়াই মাতাল হইয়া নিশিদিন যাপন করিতেছি। আমি যে মদ খাইয়াছি উহা প্রেম-ভাটির মদ। এই নেশা আর কখনো ছুটে না।

"অওর সখী মদ পী পী মাতী মৈঁ বিন পীয়া মদ মাতী।
প্রেম ভটীকা মৈঁ মদ পিয়ো ছকী ফিরূঁ দিন রাতী ॥

তুমি যে সমর্থ প্রভু, তুমি তো তোমার শরণাগতকে পরিত্যাগ করিতে পার না। তুমি এই ভবসাগর পারে যাইবার একমাত্র অবলম্বন জাহাজ। তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়। তুমি জগৎগুরু। তোমাকে ভিন্ন সকলই বৃথা। যুগে যুগে ভক্ত সাধককে তুমি মোক্ষ ও সদ্‌গতি দান করিয়াছ। মীরা তোমার চরণে শরণাগত। তাহার লজ্জা রাখিও।

কত যুগ যুগান্তরের পর গিরিধর নাগর মীরাকে সৎগুরুর সন্ধান দিয়াছে। কতদিনের পর গৃহহারা মীরা পুনরায় গৃহে ফিরিয়াছে ভগবানের কৃপায় সদ্‌গুরুলাভ। সদ্‌গুরু কৃপায় ভগবান্। মীরার প্রভু গিরিধর নাগর—

সতগুরু দই বতায়।
জুগন জুগনসে বিছড়ী মীরা
ঘরমে লীনী লায়।

প্রেম মত্ত মীরা যে ভাবে গানের সুরে প্রিয় গিরিধারীর মাধুরী আস্বাদন করিয়াছেন, উহা সত্য সত্যই বিস্ময়জনক। কবির কাব্য রচনা কৌশল—দার্শনিকের চিন্তার গাম্ভীর্য সকলই মীরার ভজনের সমীপে ম্লান হইয়া যায়। তাহার ভজন গানের সুর আজ পর্যন্ত সাধকের অন্তরে অবিশ্রান্ত প্রেমের ধারা প্রবাহিত করিয়া রাখিয়াছে।

ভারতের মরমী কবিদের মধ্যে মীরা অন্যতম। সাধারণতঃ একদল লোক আছেন যাহারা মনে করেন মরমীরা যেন স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিচ্ছবি। দেবতার মন্দির তাহাদের কাছে পাথরের দুর্গ, মূর্তিপূজা পরমাত্মার অপমান। মীরা এ জাতীয় মরমী ছিলেন না। তিনি যেমন প্রাণের গোপন স্তরে প্রিয়তমের কোমল স্পর্শ অনুভব করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন, তেমনই দেবতার মন্দিরে পাষাণ প্রতিমাও তাহার সমীপে নবনীত-কোমল হইয়া সেই অখণ্ড অনন্তের আনন্দ পুলক দিয়া তাহাকে অন্তরে বাহিরে ধন্য করিয়াছেন। রূপ অরূপ সকলের ভেদ বিবাদ মিটাইয়া রস-জাগরণে জাগ্রত করাই ছিল মীরার জীবনের প্রধান ভাবধারা। মুখোমুখি প্রিয়ের সান্নিধ্য-পুলকে নন্দিতা মীরা তাহার আনন্দের ধারায় প্লাবিত করিয়াছিলেন বাঁধাধরা জীবনের কর্তব্যকর্ম-পরতন্ত্রতা। এই অনাবিল আনন্দের ভিতর তিনি পাইয়াছিলেন সেই প্রেমের পরিচয়, যাহা জাতি, বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম, সকল নিষেধের গণ্ডী পার হইয়া একান্তভাবে মহামিলন ঘটাইয়া দেয় এই মাটির মানুষের ভঙ্গুর দেহে চিরন্তনের সঙ্গে

মীরা দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দিরে কিছুদিন ছিলেন। সে সময়া তাহার যে অবস্থা তাহা বর্ণনাতীত। তিনি গানের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা

প্রকাশ করিয়া যাহা গাহিয়াছেন, উহা বাস্তব জীবনে ঘটিয়াছে এই রণছোড়জীর মন্দিরে। তিনি গাহিয়াছেন—

চিত নন্দন আগে নাচুংগী।
নাচ নাচ প্রিয়তম রিঝাউ প্রেমী জনকো জাচুংগী।
প্রেম প্রীতকা বাঁধ ঘুংঘরা সুরতকী কছনী কাছুংগী॥
লোক লাজ কুলকী মরজাদা যা মৈ এক ন রাখুংগী।
পিয়াকে পলংগাজা পৌঢ়ুঁগী মীরা হরিরঙ্গ বাচুংগী॥

আমি চিত্ত-বিনোদন শ্রীহরির সম্মুখে নৃত্য করিব। আমি নাচিয়া নাচিয়া প্রিয়কে মোহিত করিব। তাহাকে প্রেম দান করিব। প্রেম প্রীতির ঘুংঘরা বাঁধিয়া রূপের শাড়ী পরিধান করিব। লোক লজ্জা কুলের মর্যাদা প্রভৃতি কিছুই আর রাখিব না। আমি প্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাহার রঙ্গে রঙ্গীন হইয়া যাইব।

মীরা ঠিক এই ভাবেই রণছোড়জীর মন্দিরে নৃত্য করিয়াছেন। তাহার প্রার্থনা অনুসারে প্রিয়ের সঙ্গলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

তুমরে কারণ সব সুখ ছোড়্যা অব মোহি
কুঁ্য তরসাবৌ হৌ।
বিরহ বিথা লাগী উর অন্তর
সো তুম আয় বুঝাবৌ হৌ॥
অব ছোড়ত নহি বণৈ প্রভুজী
হঁসকর তুরত বুলাবৌ হৌ।
মীরা দাসী জনম জনমকী
অঙ্গসে অঙ্গ লগাবৌ হৌ॥

তোমার জন্য সকল সুখ ত্যাগ করিয়াছি। তুমি আর আমাকে তৃষ্ণায় কাতর করিও না! আমার অন্তরের ব্যথা দূর করিয়া দাও। হে প্রভু, এখন আর আমাকে ছাড়িয়া দেওয়া তোমার উচিত নয়—হাসিয়া অনতিবিলম্বে আমাকে ডাকিয়া লও। জন্ম-জন্মান্তরের দাসী মীরা তোমার অঙ্গে অঙ্গ লাগাইয়া থাকুক।

রণছোড় লালজী হৃদয় কবাট খুলিয়া চিরদাসী মীরাকে সত্যই তাহার প্রেমময় বুকে স্থান দিয়া অঙ্গে অঙ্গ লাগাইয়া রহিয়াছেন। ভক্তগণ আজও সেই কথা বলিয়া গর্ব করে।

মীরা ১৫২২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। নরসীজীকা মায়রা, গীতগোবিন্দ টীকা, রাগ গোবিন্দ, রাগ-সোরঠ এই গ্রন্থ চতুষ্টয় মীরার রচিত বলিয়া জানা যায়।

প্রেমের ঠাকুর কলিযুগাবতার গৌরাঙ্গ কি ভাবে মীরার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন তাহা একটি গানে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

অবতো হরিনাম লও লাগি
সব জগকো ভঙ্গ মাখন চোরা
নাম ধরে ও বৈরাগী।
কিৎ ছোড়ে উহ মোহন মুরলী, কিৎ ছোড়ে সব গোপী।
মুড় মুড়ায় ডোরি কটি বাঁধি, মাথে মোহন টোপী॥
মাত যশোমতী মাখন কারণ, বাঁধে যাকে পাব।
শ্যাম কিশোর ভয়ে নবগোরা, চৈতন্য তাঁকো নাব॥
পীতাম্বরকো ভাব দেওয়াও, কটি কৌপীন কসে।
গৌর কৃষ্ণকী দাসী মীরা, রসনা কৃষ্ণরসে॥

নিখিল ভুবনের জীবগণকে হরিনাম লওয়াইবার জন্য ব্রজের মাখনচোরা বৈরাগী হইয়াছে। কোথায় বাঁশী আর কোথায় গোপী। মুণ্ডিতশির—কটিতে কৌপীন। মাথার সুন্দর চূড়া নাই। যশোমতী-মাতা যাঁহাকে মাখন চুরির জন্য বাঁধিয়া রাখেন, সেই দামোদর শ্যাম-কিশোর নব গৌরাঙ্গ। তাহার নাম হইল চৈতন্য। কৌপীন ধারণ করিয়াও যিনি ব্রজকিশোরের প্রেমদান করেন মীরা সেই গৌরকৃষ্ণের দাসী; সে সদা হরিগুণ গান করে।

# তুকারাম

হে দৈন্য-দেবতা, তোমাকে নমস্কার করি। তোমার বাহিরের রূপ ভয়াবহ হইলেও অন্তরের রূপ ভিন্ন প্রকার। সংসারী লোক তোমার নাম শুনিয়াই ভীত এবং তোমার আগমনে একেবারেই অধীর হইয়া অবসাদ গ্রস্ত হয়। তাহারা অনতিবিলম্বে তোমার কঠোর কবল হইতে নিস্তার পাইতে চায়। একপ্রকার লোক আছে যাহারা তোমার আগমনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তোমার স্বরূপ জানিয়া শুনিয়াও পরমাদরে তোমার স্বাগত অভিনন্দন করিয়া থাকে। এই জাতীয় লোকের কাছে তুমি বেশীদিন থাকিতে না পারিয়া দূরে যাও। যে তোমাকে ভয় পায় তাহাকে আরও ভাল করিরা পাইয়া বস। দৃঢ়চেতা পুরুষকে অতি অল্পদিন পরীক্ষা করিয়া তুমি তাহাকে জয়টীকা পরাইয়া দাও। তোমার প্রসাদে সে এই সংসারে কীর্তিমান হইয়া থাকে। হরিশ্চন্দ্র, ময়ূরধ্বজ, পঞ্চপাণ্ডব, স্থদামা প্রভৃতি মহাত্মগণ তোমার স্পর্শে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তোমার দৃষ্টিপাত না হইলে ইহারাও অন্যান্য অসংখ্য নৃপতি ও মনুষ্যবর্গের মত কাল-সমুদ্রের বিস্মৃতিময় অতল তলে ডুবিয়া যাইতেন। হে দেব, তুমিই ইহাদিগকে অমর করিয়া দিয়াছ। মহারাষ্ট্রদেশের পরমভক্ত ও শ্রেষ্ঠ কবি তুকারামও তোমার প্রসাদে বঞ্চিত হয় নাই। দৈন্য দুঃখের ভীষণতম অবস্থায় পড়িয়াও তুকারাম কিছুমাত্র ভীত অথবা আকুল হয় নাই। হে দেব, পরিশেষে তুমি তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছিলে—ফলে মহারাষ্ট্রে ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে অতি শ্রদ্ধার সহিত এই মহাত্মার পবিত্র নাম কীর্তিত হইয়া থাকে।

পুণার প্রায় নয় ক্রোশ দূরে বোম্বাইএর প্রান্তে দেহু বলিয়া একটী গ্রাম আছে। সাধু তুকারাম ইন্দ্রাণী নদীর তীরে এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ

করেন। ইহার পিতা বল্‌হবাজী ও মাতা কনকবাই। তুকারামের শান্তজী ও কানাইয়া বলিয়া আরও দুইটী ভাই ছিল। বল্‌হবাজী জাতিতে শূদ্র ও ব্যবসায়ী ছিলেন এবং তুকারামকে তাহার যোগ্যতানুসারে ব্যবসায় উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন! বৃদ্ধাবস্থায় তিনি পুত্রের উপর আপন কর্মভার অর্পণ করেন। তখন তুকার বয়স মাত্র ত্রয়োদশ বৎসর। অল্প বয়স হইলেও তুকা ব্যবসায়বুদ্ধি ও কার্য নৈপুণ্যে জন-সাধারণের নিকট প্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং ব্যবসায়েও যথেষ্ট লাভবান্ হইলেন।

চিরকাল কাহারও সমান যায় না। সাধুজীর সুখের দিনও বেশী দিন রহিল না। সতেরো বৎসর বয়সে পিতামাতা উভয়েই পরলোক গমন করিলেন—সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায় ক্ষতি হইতে লাগিল। ইনি দুই বিবাহ করেন। প্রথমা রুক্মীবাঈ ও দ্বিতীয়া জীজাবাঈ। পরিবারে অনেকগুলি লোক ছিল। ক্রমাগত ব্যবসায়ে লোকসান হওয়ায় তুকারাম অর্থকষ্টে পড়িলেন। পিতামাতার অকাল মৃত্যু ও অর্থাভাব প্রভৃতি তাঁহাকে সংসার বিষয়ে উদাসীন করিয়া তুলিল। কর্তা অন্যমনস্ক হইতেই নিযুক্ত কর্মচারীরা চুরি করিতে লাগিল এবং নানাদিক্ দিয়া তাঁহাকে ঠকাইতে লাগিল। ক্রমে তিনি দেউলিয়া হইলেন। অন্যান্য ব্যবসায়ীরা তাঁহার সহিত কারবার বন্ধ করিয়া দিল। এই দুরবস্থার সময় তাঁহার প্রথমা পত্নী লোকান্তর গমন করেন। তাহার কতগুলি গয়না ছিল। সেইগুলি বিক্রয় করিয়া তুকারাম পুনরায় চাল ডালের ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। একবার যাহার অন্তরে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহার কি আর কারবার করা চলে? শত চেষ্টা করিয়াও তিনি আর লাভবান্ হইতে পারিলেন না। তাঁহার নিকট যাচকের আর অভাব নাই। কাঙ্গাল, দরিদ্র, ভিক্ষুক ও সাধু সর্বদাই তুকারামের দোকানে প্রার্থী। তাঁহার নিষেধ

নাই। অবারিত দান। এদিকে অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয়কেও তাঁহার লোকঠকানো বলিয়া বিবেচনা হইল। যাহারা বাকী মূল্যে চাল প্রভৃতি লইয়া যায় তাহারাও যথাসময়ে মূল্য দিয়া যায় না। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যেই সেই কারবার বন্ধ করিয়া দিতে হইল।

দ্বিতীয়া পত্নী জীজাবাই বড়ই রুক্ষ প্রকৃতির। পতির সংসার সম্বন্ধে এইরূপ ঔদাসীন্য দেখিয়া দিবারাত্রি তিনি তুকারামকে গালি দিতেন। 'দরিদ্রের বহুসন্তান হয়' এই উক্তি তুকার জীবনে খুবই সত্য। তিন কন্যা ও দুই পুত্র এবং অন্যান্য আত্মীয়গণকে ভরণ পোষণ করা এই উদাসীন প্রকৃতির অভাবগ্রস্ত গৃহস্থের নিকট একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল। মৃত ভ্রাতার পত্নী ও সন্তানগুলি তাঁহারই সংসারে প্রতিপালিত হইত। এদিকে কন্যা বিবাহের উপযুক্ত হইয়া উঠিল। পত্নীর উৎপীড়ন আরও বাড়িয়া চলিল। অবশেষে পত্নীর পরামর্শে তুকারাম স্থিরমনে আবার ব্যবসা করিতে স্বীকৃত হইলে জীজা কিছু অর্থ ধার করিয়া লইয়া তাঁহার হাতে দিয়া বিদেশে পাঠাইয়া দিল। দেশ ছাড়িয়া স্থিরভাবে ব্যবসা করিয়া তুকারাম এবার সত্যই লাভবান্ হইলেন এবং কন্যা- বিবাহের জন্য সঞ্চিত অর্থ লইয়া গ্রামের দিকে রওনা হইলেন। দৈবাৎ পথে এক অভাবগ্রস্ত ব্রাহ্মণের সহিত দেখা। তিনি কাঁদিয়া তুকারামের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দেশের পাওনাদারের দায়ে তাহার সর্বস্ব গিয়াছে এমন কি তাহার গ্রাম হইতে তাহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। ব্রাহ্মণের অভাব ও দুরবস্থার কথায় সাধু তুকারামের অন্তর গলিয়া গেল। অমনি তিনি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া নিজের সঞ্চিত অর্থ ব্রাহ্মণকে দান করিয়া শূন্য হস্তে গৃহে ফিরিলেন। জীজা পতির এই দানের কথা আগেই শুনিয়াছেন। তুকারাম গৃহে ঢুকিতেই তিনি ছুটিয়া আসিয়া সহস্র তিরস্কারে তাহাকে জর্জরিত করিতে লাগিলেন; তাহার আচরিত

সাধুতাকে ও আরাধ্য দেবতাকে পর্যন্ত গালি দিতে বাকী রাখিলেন না। তুকারাম চুপ করিয়া সকলই সহ্য করিলেন, কিছুমাত্র ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না।

তুকারামের অন্তর দয়া ও প্রেমের আধার ছিল। শিশুদের প্রতি ইঁহার প্রগাঢ় স্নেহ ছিল। শিশুমুখের মধুর হাসি দর্শন করিয়া ইনি পরম আনন্দিত হইতেন। কথিত আছে, একবার কতগুলি ইক্ষু লইয়া যখন তিনি বাড়ীর দিকে আসিতেছেন। পথে এক বালক আসিয়া তাঁহার নিকট একখণ্ড ইক্ষু চাহিয়া লইল। উহা দেখিয়া অন্যান্য কতগুলি বালক---যাহারা নিকটেই খেলা করিতেছিল, একে একে আসিয়া ইক্ষু চাহিয়া লইল। মাত্র একখণ্ড ইক্ষু লইয়া তুকারাম বাড়ী ফিরিলে জীজা উহা তুকারামের হস্ত হইতে ছিনাইয়া লইয়া ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহার পিঠে উহা দিয়া আঘাত করিতে লাগিলেন। আঘাতের ফলে ইক্ষুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দুই টুকরা হইয়া গেল। তখন তুকারাম হাসিয়া বলিলেন,—এইরূপ ব্যবহারের জন্যই স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলা হয়। সহধর্মিণীর ধর্ম তুমি বেশ রক্ষা করিয়াছ। আমি একখণ্ড ইক্ষু দিয়াছি তুমি উহা দুই খণ্ড করিয়া এক অংশ আমাকেও দিয়াছ। বেশ হইয়াছে।

কোনো সময়ে অর্ধ মণ শস্য পারিশ্রমিক নির্ধারণ করিয়া এক গৃহস্থ আপন ক্ষেত্রের রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্য তুকারামকে নিযুক্ত করিল। ক্ষেত রক্ষার জন্য ইনি উচ্চ মাচা করিয়া উহার উপর বসিয়া থাকেন। যাহার মন ভগবান্ চুরি করিয়াছেন তিনি অন্য বিষয়ে মন লাগাইবেন কেমন করিয়া? মাচার উপর বসিয়া আনমনে ইনি হরিনাম করিতে থাকেন, এদিকে বহুপক্ষী ক্ষেতের ফসলের উপড় পড়িয়া উহা নষ্ট করিতে থাকে। এক দিন ক্ষেতের মালিক আসিয়া এই দৃশ্য দেখিয়া বড়ই চটিয়া গেল এবং তুকারামকে বলিল—"তোমাকে কি এই পাখী দিয়া ক্ষেতের ফসল খাওয়াইবার জন্যই চাকর রাখা

হইয়াছে ?" তুকা বলিলেন,—"ভাই মালিক, পাখীগুলি ক্ষুধার তাড়নায় ক্ষেতে পড়িয়াছে উহাদিগকে কেমন করিয়া তাড়াইয়া দিই ?" ক্ষেতের মালিক কোন দিনই এইরূপ জবাবে সন্তুষ্ট হইতে পারে না। সে তুকারামকে ধরিয়া লইয়া পঞ্চায়েৎ সমীপে হাজির করিল। গ্রামের পাঁচজন মাতব্বর বিচার করিয়া এই নির্দেশ করিল যে, অন্য বৎসর হইতে উক্ত জমিতে যে পরিমাণে ফসল কম হইবে উহা নিযুক্ত তুকারামের জরিমানা স্বরূপ দিতে হইবে। ভগবানের কৃপায় উক্ত ক্ষেত্রে পূর্ব পূর্ব বৎসর হইতে অধিক পরিমাণে ফসল হইল কিন্তু ক্ষেতের মালিক সে কথা কাহাকেও জানাইল না। তুকার এক বন্ধু এই সংবাদ জানিতে পারিয়া পঞ্চায়েতের নিকট আবেদন করিলে সদয় হইয়া পঞ্চায়েৎ ক্ষেতে যে পরিমাণে বেশী ফসল হইয়াছে উহা তুকাকে দেওয়াইয়া দিল। "ভক্তের দায় ভগবান্ বহন করেন" তুকারামের জীবনে এই মহান্ সত্য প্রত্যক্ষ হইল সঙ্গে সঙ্গে তাহার মহিমা বাড়িয়া গেল।

বহু কষ্ট ভোগ করিয়া তুকারাম বুঝিয়াছেন সংসারে সুখ নাই। পিতামাতার মৃত্যু, প্রথমা স্ত্রী ও জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যু প্রভৃতি একে একে তাঁহার সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে চক্ষু খুলিয়া দিয়াছিল। তিনি বুঝিলেন, সংসারের সুখ প্রকৃত সুখ নয়, উহা সুখের আভাস। সকল সুখের মূল শ্রীভগবানের চরণে। সংসার সুখে মানবের তৃপ্তি হয় না। শ্রান্ত পথিক সহস্র চেষ্টাতেও মৃগ-তৃষ্ণিকা হইতে পিপাসার জল সংগ্রহ করিতে পারে না। শ্রীহরির চরণ ভিন্ন অন্যত্র শান্তি পাওয়ার আশা নিরর্থক। এই চিন্তা করিয়া এক দিন ভগবদারাধনার জন্য তিনি বাহির হইয়া গেলেন। তিনি একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর নির্জনে বসিয়া ভজন, ধ্যান ও মনন করিতে লাগিলেন। একদা মাঘী শুক্লা দশমী বৃহস্পতিবার শ্রীভগবান্ ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া ইঁহাকে "রাম কৃষ্ণ হরি" মহামন্ত্রে দীক্ষা প্রদান করিয়া

যান। এইরূপে মন্ত্র পাইয়া তিনি পণ্ডরপুরে পাণ্ডুরঙ্গজীর শরণ গ্রহণ করেন। সেখানে থাকিয়াই শাস্ত্র চিন্তা, বিদ্যাভ্যাস এবং হরিনাম কীর্তন করিতে থাকেন। মন্দিরে আসিয়া অল্পদিনেই ইনি পারমার্থিক বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইলেন। ইনি পূর্ব মহাজন নামদেব প্রভৃতির অভঙ্গ গান করিতেন এখন নিজেই অভঙ্গ রচনা করিয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। ইনি শূদ্রজাতি হইলেও জাতিবর্ণ নির্বিশেষে ব্রাহ্মণাদি সকলেই তাঁহার কীর্তন শুনিতে বসিত ও তাঁহার সহিত গান করিত। ইনি ভাবাবিষ্ট হইয়া গান করিতে থাকিলে সে গান শুনিয়া লোক মুগ্ধ হইয়া যাইত। ধীরে ধীরে তাঁহার অভঙ্গ-মাধুরী ও তাঁহার মহিমা সমগ্র মহারাষ্ট্রে ছড়াইয়া পড়িল। বিদ্বৎজনামোদী গুণগ্রাহী ভগবদ্ভক্ত ছত্রপতি শিবাজী ইঁহার গুণের কথা শুনিয়া রাজসভায় তাঁহাকে আনয়ন করিবার জন্য বিশ্বস্ত কর্মচারী ও ঘোড়া পাঠাইয়া দিলেন। তুকারাম এই রাজ-সম্মানও অঙ্গীকার করিলেন না এবং শিবাজীর নিকট এক পত্র পাঠাইলেন। উহার মর্ম এই—"মহারাজ, আপনি আমাকে কেন এই দারুণ পরীক্ষায় ফেলিতেছেন? নিঃসঙ্গ হইয়া সংসার হইতে দূরে থাকি, নির্জনে থাকিয়া মৌনভাবে ঐশ্বর্য, মান সম্ভ্রমকে বমনোদ্গীর্ণ খাদ্যপদার্থের মত ঘৃণ্য বলিয়া মনে করি, এইরূপই আমার ইচ্ছা। হে পণ্ডারিনাথ, আমার ইচ্ছায় কি হয়, সবই আপনার অধীন। হে রাজন্, আপনার সমীপে আসিলে আমার কি লাভ হইবে? আমার খাদ্যের অভাব হইলে ভিক্ষার প্রশস্ত পথ রহিয়াছে; বস্ত্রের অভাব হইলে রাজপথে পরিত্যক্ত ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ করিয়া লওয়া যায়। রাজন্, ভোগবাসনা জীবনকে নষ্ট করিয়া দেয়। আমি নতশিরে এই নিবেদন করিলাম বিচার করিয়া ব্যবস্থা করিবেন।"

তুকারামের পত্রে শিবাজী বুঝিলেন—যিনি ভগবৎ কৃপালাভ করিয়া সেই পরমানন্দের অনুভব করিয়াছেন তাহার নিকট অতি প্রভাবশালী নৃপতির

সম্মান, সর্বজন-পূজিত পুরুষের প্রতিষ্ঠা এবং পরম উপাদেয় বিষয়ের উপভোগ, সকলই তুচ্ছ। ভগবৎকৃপার নিকট ঐহিক সকল প্রকার ঐশ্বর্য ও মান অতি হীন বলিয়া প্রতীতি হয়। সাধুজী রাজ-কৃপা বিনয়ের সহিত প্রত্যাখ্যান করিলেন।

ইনি অভঙ্গ রচনা করিয়া গান করিতেন; ইহাতে অভিজাত পণ্ডিত ব্রাহ্মণের অসম্মান বোধ হইতে লাগিল। রামেশ্বর ভট্ট নামক এক ব্রাহ্মণ একদিন সাধুকে বলিলেন, তুমি শূদ্র বেদার্থ প্রকাশ করিয়া অভঙ্গ গান রচনা করিতেছ, ইহা তোমার অনধিকার চর্চা। আর কখনও অভঙ্গ রচনা করিও না, যে গুলি লিখিয়াছ জলে ফেলিয়া দাও। তুকারাম ভগবানের প্রেরণায় অভঙ্গ লিখিয়াছেন, তবু ব্রাহ্মণের আদেশ না মানিলে পাপ হইবে ভাবিয়া তাহার নির্দেশমত অভঙ্গগুলি বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া এবং একখণ্ড শিলা চাপাইয়া ইন্দ্রায়ণী নদীতে বিসর্জন দিলেন। কথিত আছে, ত্রয়োদশ দিবসে ঐগুলি জলের উপর ভাসিয়া উঠিল। দৈব-প্রেরিত হইয়া এক গ্রামবাসী ভক্ত উহা জল হইতে তুলিয়া সাধুজীর হাতে দিয়া আসেন।

এক দিবস কীর্তন করিতেছেন এমন সময় এক শোকাতুরা জননী তাহার মৃতপুত্র লইয়া সাধুজীর শরণাগত হন। স্ত্রীলোকটি সাধুজীকে বলিলেন, আপনি যদি সত্যই বিষ্ণুভক্ত হইয়া থাকেন তবে আমার এই পুত্রের প্রাণদান করুন, তাহা না করিলে জানিব আপনি ভণ্ড কপটাচারী। সাধু চিন্তা করিলেন—আমার মধ্যে মৃতকে পুনর্জীবন দিবার ক্ষমতা নাই, তবে এই স্ত্রীলোকের বিষ্ণুভক্তি ও কীর্তনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস দেখা যাইতেছে। তাহার বিশ্বাস বিষ্ণুভক্ত ভগবন্নাম কীর্তনে মৃতকেও প্রাণ দিতে পারে। ভাল, আমি অকপট হৃদয়ে শ্রীহরি কৃষ্ণ রাম বলিয়া ডাকিয়া যাই, যাহা বিচার করিবার ভগবানই

করিবেন। শুনাযায়, নাম-কীর্তনে জননী মৃত পুত্রকেও পুনর্জীবিত করিয়া লইয়াছিলেন।

তুকারাম শ্রীভগবানের একান্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি বলিতেন—শ্রীহরিনামে সকল পাপ দূর হইয়া যায়। হরিনামই তপস্যা, জপ, যোগ, সাধন, সদাচার ও যজ্ঞ। রামনাম মুখে উচ্চারণ করিলেই দেহের সকল পাপ চলিয়া যায়। শ্রীহরি স্মরণ করিয়া যিনি পথ চলেন পদে পদে তাহার যজ্ঞের ফল লাভ হয়। হরিনামের গুণে অসম্ভবও সম্ভব হয়। প্রারব্ধকর্মও নাশ হইয়া যায়। ভবসাগর পার হইতে হরিনাম ভিন্ন অন্য উপায় নাই। চুপি চুপি তিনি ভগবান্‌কে বলিতেন—হরি দয়াময়, আমার সু এবং কু কর্মের বিচার করিয়াই যদি আমাকে সুখ দুঃখ ভোগ করাও তবে তোমার দয়াময় নাম সার্থক হয় কেমন করিয়া? তাহাতে তোমার কি ইষ্ট সাধনই বা হয়? আমি তোমার কৃপার ভিখারী। তিনি বলিতেন—শ্রীহরি আমাকে যেমন প্রেরণা দেন আমি সেরূপ করি আমার নিজের কিছুই সামর্থ্য নাই। স্বরচিত অভঙ্গ সম্বন্ধে বলিতেন, এগুলি সাধুগণের উচ্ছিষ্ট উহার অর্থ আমিও ঠিক্ বুঝি না। আমি অজ্ঞানী।

তুকারামের মত সাধু-চরিত্র নিরভিমান মহাপুরুষ অতিশয় দুর্লভ। শুনা যায়, তিনি লক্ষ অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন।

কবিকুলের উজ্জ্বল রত্ন তুকারাম। বিট্‌ঠল নাথের প্রতি তাহার গাঢ় অনুরাগের পরিচয় বহু অভঙ্গের মধ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

বিট্‌ঠল আম্‌চে জীবন। আগমনিগমাচে স্থান॥ বিট্‌ঠল সিদ্ধিচে সাধন। বিট্‌ঠল ধ্যান বিসাবা॥ বিট্‌ঠল কুলীচে দেবতা। বিট্‌ঠল চিত্ত গোত বিত্ত॥ বিট্‌ঠল পুণ্য পুরুষার্থ। আব্‌ড়ে মাত বিট্‌ঠলাচী॥ বিট্‌ঠল বিস্তারলা জনীং। সপ্তহি পাতালে ভরুনি॥ বিট্‌ঠল ব্যাপক ত্রিভুবনীং।

বিট্‌ঠল মুণী মানসীং ॥ বিট্‌ঠল জীবিচা জিবহালা। বিট্‌ঠল কৃপেচা কোংবলা ॥ বিট্‌ঠল প্রেমচা পুতলা। লাচিয়েলা চালা বিশ্ব বিট্‌ঠলে। বিট্‌ঠল মায় বাপ্ চুলতা। বিট্‌ঠল ভগিনী আনি ভ্রাতা ॥ বিটঠলাবীণ চাড় নাহি গোতা। তুকাম্হনে আতাং নাহীং দুস্‌রে ॥

বিট্‌ঠল নাথ কেমন করিয়া তুকার জীবন, মরণ, আগম, নিগম, ইহকাল, পরকাল, বাহিরে, অন্তরে, প্রাণের প্রাণ, প্রেমের পুতুল, পিতা, মাতা, ভাই, ভগিনী হইয়া অগতির গতিরূপে অনুভূত হইতেছেন তাহাই এই অভঙ্গে সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। তুকারাম পরম দেবতার সমীপে আপন জীবনের অপরাধ বিজ্ঞাপন করিয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করিয়া যে প্রার্থনা করিয়াছেন, উহা পাঠ করিলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবি নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা ও বিজ্ঞপ্তির কথা সততই মনে পড়ে।

তুকা গাহিয়াছেন—মী তব অনাথ অপরাধী। কর্মহীন মতিমন্দবুদ্ধি॥ তুজ ম্যা আঠবিলেং নাহী কধীং ॥ বাচে কৃপা নিধি মায় বাপা ॥ নাহীং ঐকিলে গায়িলেং গীত। ধরিলী লাজ সাংডিলেং হিত ॥ নাবড়ে পুরাণ বৈসলে সন্ত। কলি বহুত পরনিন্দা ॥ কেলা করবিলা নাহীং পর উপকার ॥ নাহিং দয়া আলী পীড়িতাপর ॥ করুনয়ে তো কেলা ব্যাপার বাহিলা ভার কুটুম্বাচা ॥ নাহীং কেলে তীর্থাচেং ভ্রমণ। পালিলা পিণ্ড কর চরণ ॥ নাহীং সন্তসেবা ঘডলে দান। পূজা অবলোকন মূর্ত্তিচেং অসঙ্গ সঙ্গে ঘড়লে অন্যায়। বহুত অধর্ম উপায় ॥ ন কলে হিত করাবেং তেং কায় নয় বোলে আঠবুতেং। আপ আপস্থা ঘাতকর ॥ শত্রু ঝালোং মী দাবেদার ॥ তুং তংব কৃপেচা সাগর। উতরী পার তুকাম্হনে ॥

আমি অনাথ অপরাধী, সৎকর্মহীন এবং দুষ্টমতি। তুমিই পিতা মাতা; তবুও তোমাকে বাক্যদ্বারাও একবার স্মরণ করি না। তোমার মহিমা গীত শ্রবণ করি না। আমি নিজের মঙ্গল কি তাহাও জানি না।

পুরাণ কথা না শুনিয়া সৎসঙ্গ পরিহার করিয়া দানধর্ম না করিয়া পীড়িতের সেবা-বঞ্চিত হইয়া অকর্মে দিন কাটাইতেছি। কুটুম্ব-ভরণ আমার ব্রত। তীর্থ-ভ্রমণ উপেক্ষা করিয়া করচরণের ভার বহন করিতেছি। শ্রীবিগ্রহ দর্শন না করিয়া আমি অসৎসঙ্গে অন্যায় অধর্মে রত হইয়া কর্তব্য ভুলিয়াছি। আমি নিজেই নিজের সর্বনাশ করিলাম। হে কৃপাসিন্ধু, তুমি আমাকে পারে লইয়া যাও। তাঁহার অভঙ্গে যে আকুলতা ধ্বনিত হইয়াছে, উহা সত্য সত্যই অতুলনীয় এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব-অনুরাগ-গন্ধ-আমোদিত। সাধু তুকারামের মত বিষয় বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত বিরল। কথিত আছে, তিনি ভাম্বনাথ পাহাড়ে থাকিয়া তপস্যা করিতেন। সাধুর ভ্রাতা তাহাকে সে স্থান হইতে বাড়ী আনিয়া বিষয় সম্পত্তি বিভাগ করিয়া তাহাকে দলিল পত্র বুঝাইয়া দিলে তিনি আপন অংশে প্রাপ্ত বিষয়ের দলিল পত্রগুলি কিছু মাত্র দ্বিধা না করিয়া ইন্দ্রায়ণী নদীর জলে ফেলিয়া দেন।

সাধুজীর পিতামাতা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি ভক্তির বীজ পাইয়াছিলেন। ইঁহার পূর্বতন অষ্টম পুরুষ বিশ্বম্ভর পণ্ডরপুরে শ্রীবিঠোবার শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করেন। এই বিগ্রহ স্বয়ং ভূমিগর্ভ হইতে ভক্তের প্রতি কৃপা করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তুকারাম এই বিট্ঠল বা বিঠোবার কিরূপ একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন তাহার পরিচয় সহস্র সহস্র অভঙ্গেই রহিয়াছে। বহু পূর্ব হইতেই আষাঢ়ী একাদশী ও কার্তিকী একাদশীতে দেহু হইতে রওনা হইয়া সম্মিলিত ভক্তবৃন্দ বিঠোবার দর্শনের নিমিত্ত পণ্ডরপুরে উপস্থিত হইতেন। তুকারাম জীবিত কালে এই অনুষ্ঠান, পূর্বপুরুষ প্রবর্তিত কীর্তি এবং ভক্ত্যঙ্গ বলিয়া উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। শুনিয়াছি বৃন্দাবন বনযাত্রার মত এখনও বিট্ঠল দর্শনের জন্য জ্ঞানেশ্বর মহারাজ ও

সাধু তুকারামের চিত্রপট দোলায় বহন করিয়া সাধুভক্ত গৃহস্থ নির্বিশেষে পণ্ডরপুরে গমন করেন। এই সময় সে স্থানে কয়েক দিন বিশেষ উৎসবাদি হইয়া থাকে।

যে অভঙ্গে তুকা মন্ত্রপ্রাপ্তির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন উহা এই—

"রাঘব চৈতন্য কেশব চৈতন্য।
সাঙ্গিতলি খুণ মালিকেচিং ॥
বাবাজী আপলে সাঙ্গিতলে নাম।
মন্ত্র নিলা রাম কৃষ্ণ হরি ॥
মাঘ শুদ্ধ দশমী পাহুনি গুরুবার।
কেলা অঙ্গীকার তুকাম্‌হণে ॥ (অভঙ্গ ৩৮৭১)

ভুবনপাবন শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দর দক্ষিণদেশ ভ্রমণকালে পণ্ডরপুরে পাণ্ডুরঙ্গজী বিঠোবা বিগ্রহের শোভা দর্শন করিয়া পরমানন্দ লাভ করিয়াছিলেন এবং আপন হৃদয়ের অফুরন্ত প্রেমভাণ্ডার হইতে কৃষ্ণভক্তি মহামূল্যধন বিতরণ করিয়া সেই দেশবাসীগণকে ধনী করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

তথা হৈতে পাণ্ডুপুর আইলা গৌরচন্দ্র।
বিট্‌ঠল ঠাকুর দেখি পাইলা আনন্দ ॥
প্রেমাবেশে কৈল বহু নর্তন কীর্তন।
প্রভুর প্রেম দেখি সবার চমৎকার মন ॥

পাণ্ডুপুর বা পণ্ডরপুরে বিঠোবা বা বিট্‌ঠল স্বয়ং প্রকাশ বিগ্রহ। এই বিগ্রহ আবির্ভূত হইলে তাঁহাকে বেদীর উপর স্থাপন করা হয়, সেই হইতে তিনি বিট্‌ঠল নামে অভিহিত হন। বিট্‌ঠল, বিঠোবা, বিঠু, বিঠো ইত্যাদি বহু প্রেমময় সম্ভাষণে ভক্তগণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া থাকেন। বিট্‌ঠল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, ভক্তগণের এইরূপই

বিশ্বাস, তবে তাঁহার এই নামের একটী ব্যাখ্যা করা হইয়া থাকে এই যে, তিনি অজ্ঞানী ও অবোধের একমাত্র প্রভু। বি = বিৎ = জ্ঞান, ঠ = শূন্য, ল = গ্রহীতা ; অতএব বিট্‌ঠল = জ্ঞানশূন্যগণের গ্রহীতা প্রভু। বিট্‌ঠল দর্শনে প্রতি বর্ষে বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু ভক্ত সমাগম হইয়া থাকে। সাধুমাত্রেই এই তীর্থে শুভাগমন করিয়া বিঠোবার মাধুর্যরস আস্বাদন করিয়া প্রেমে ডুবিয়া থাকেন। পূর্বাচার্যগণও এই বিঠোবার রূপে মুগ্ধ হইয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এই প্রেমের প্রতিমা বিঠোবার দর্শনে প্রেমাবেশে বহু নর্তন কীর্তন করিয়াছেন। প্রভুর নর্তন কীর্তনের বৈশিষ্ট্য এই—পণ্ডরপুরবাসী প্রতিদিনই বহু ভক্তের প্রেম, প্রার্থনা, স্তবস্তুতি, নর্তন ও কীর্তন দেখেন, তাহাতে তাহারা চমকিত হন না ; উহা তাহাদের অভ্যস্ত ব্যাপার হইয়া গিয়াছে কিন্তু এই অচেনা দেশে—অচেনা নবীন সন্ন্যাসীর অভূতপূর্ব—অদৃষ্টপূ প্রেমের আবেগ ও ভাব-বিকার প্রভৃতি দর্শনে তাহারা সকলেই চমৎকৃত হইলেন। শ্রীগৌরসুন্দর যে বিগ্রহের মাধুর্য দর্শনে এইরূপ প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন সেই বিঠোবার রূপের কথা সাধু তুকারাম বর্ণনা করিয়াছেন—

সুন্দর তেং ধ্যান উভেং বিটেবরী।
কর কঠাবরী ঠেবুনিয়াং ॥
তুলসী হার গলাং কাসে পীতাম্বর।
আবড়ে নিরন্তর হেংচি ধ্যান ॥

বেদীর উপর কটিদেশে হস্তযুগল স্থাপন করিয়া সুন্দর শোভা পাইতেছেন—পরিধানে পীতবসন গলায় তুলসীর হার ; নিরন্তর সেইরূপ আনন্দে ধ্যান কর। আবার বলিতেছেন—

মকর কুণ্ডলেং তলপতী শ্রবণীং। কণ্ঠীং কৌস্তভমণি বিরাজিত ॥
তুকা মহ্‌নে মাঝেং হেংচি সর্ব সুখ। পাহীন শ্রীমুখ আবড়ীনেং ॥

শ্রবণ যুগলে মকরকুণ্ডল, কণ্ঠে কৌস্তুভমণি বিরাজিত ; তুকা বলেন সেইরূপই আমার সকল সুখ ; শ্রীমুখ দর্শনেই আমার পরমানন্দ।

ধনীনপুরে গুণ গাতাং। রূপ দৃষ্টী ন্যাহালিতাং ॥
বরবা বরবা পাণ্ডুরঙ্গ। কান্তি সাংবলী সুরঙ্গ ॥
সর্ব্ব মঙ্গলাচেং সার। মুখ সিদ্ধিচেং ভাণ্ডার ॥
তুকা মহ্নে সুখ। অন্তপার নাহি লেখা ॥

মুখে গুণ গাহিয়া, নয়নে রূপ দর্শন করিয়া সাধ মিটে না। সুন্দর! সুন্দর!! পাণ্ডুরঙ্গ শ্যামল সুকান্তিধর, তুমি সকল মঙ্গলের সার, তোমার শ্রীমুখ সর্ব সিদ্ধির ভাণ্ডার এবং উহা অনন্ত সুখময়, ইহাই তুকা বলিতেছেন।

তুকারাম গৃহত্যাগ করিয়া বিঠোবার মন্দিরেই আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি বিঠোবার গুণকীর্তন করিয়াই দিন কাটাইতেন। বিঠোবা তাঁহার জীবন মরণের সাথী হইয়া গিয়াছিলেন। দয়ালু বিঠোবার চরণে আশ্রয় লইয়া তিনি বলিয়াছেন "তুজঐসা কোণী ন দেখেং উদার। "অভয়দানশূর পাণ্ডুরঙ্গা", হে পাণ্ডুরঙ্গ তুমি অভয়দাতাগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তোমার ন্যায় উদার চরিত্র আমি আর কাহাকেও দেখি না। পণ্ডরপুর তুকারামের পরম তীর্থ। উহাই তাঁহার পিতৃগৃহ। তিনি বলিয়াছেন পণ্ডরীয়ে মাঝেং মাহের সাজণী। ওংবিয়ে কাণ্ডীং গাউং গীত॥ এই পাণ্ডুপুর পিতৃগৃহে শ্রীরাধা, রুক্মিণী সত্যভামা আমার মাতা আর পাণ্ডুরঙ্গজী আমার পিতা। উদ্ধব, অক্রুর, ব্যাস, দেবর্ষি নারদ প্রভৃতি ভাই। গরুড় বন্ধু। এই গৃহে প্রতিদিন আমার বহু আত্মীয়-স্বজন সাধুর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হয়। নিবৃত্তি, জ্ঞানদেব, সোপানদেব, নামদেব, জনা, মিত্র-নরহরি, রুইদাস, কবীর, সুরদাস প্রভৃতি ভক্তগণ সর্ব্বদাই এখানে আমাকে কৃপা করেন। সাধুগণের চরণেই আমার প্রাণ।

তাঁহাদের মহিমা গান করিয়াই আমি জীবনধারণ করি। আমার পিতা মাতার মত আনন্দময় আর কেহ নাই। আরও বলিতেছেন—

ধন্য তো গ্রাম যেথেং হরিদাস। ধন্য তোচি বাস ভাগ্যতয়া॥

যে গ্রামে হরিদাস ভক্ত বাস করে, সেই গ্রাম ধন্য। সেই গ্রামে বহু ভাগ্যেই বাস করা যায়। কেন না সেখানে ঘরে ঘরে পূর্ণজ্ঞান এবং তথাকার নরনারী সকলেই নারায়ণ তুল্য। পাপাচরণে সেই দেশে ক্ষণকালও অতিবাহিত হয় না কারণ প্রতি ঘরে হরিনাম কীর্তন নিশি-দিন হইতে থাকে। তুকা বলেন—সেই দেশবাসী জীব আপন কোটী-কুলের উদ্ধার করিয়া থাকে। স্থানান্তরে বলিতেছেন—পণ্ঢরীচা বাস ধন্য তেচি প্রাণী অমৃতাচী বাণী দিব্য দেহ। পণ্ডরপুরে যে বাস করে, এরূপ প্রাণী ধন্য, তাহার বাণী অমৃতের ধারা, তাহার দেহ অপ্রাকৃত। মূঢ়, মতিহীন, দুষ্ট, অবিচারী, ইহারাও পাণ্ডুরঙ্গের কৃপায় কৃতার্থ। শান্তি, ক্ষমা, বৈরাগ্য, আশাশূন্যতা এবং নির্মলতা নরনারীর ভূষণ। তুকা বলিতেছেন, এদেশে জাতিকুলের অভিমান নাই। এখানকার সকলেই জীবন্মুক্ত। "ধন্য তেহি ভূমি ধন্য তরুবর। ধন্য তে সরোবর তীর্থরূপ" এই দেশের ভূমি বৃক্ষ লতা ধন্য। এখানকার সরোবর নকল তীর্থ স্বরূপ তাহারাও ধন্য। "ধন্য পশুপক্ষী কীট পাষাণ। এখানে হরিরঙ্গী সকলকেই প্রেমের রঙ্গে রঙ্গাইয়া লইয়াছেন, ধন্য এই দেশ। পাণ্ডুপুরের বর্ণনায় তুকারাম সহস্র মুখ হইয়া উঠিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা পড়িবার সময় গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের শ্রীবৃন্দাবন মাধুরী বর্ণনার কথা মনে পড়ে। শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত বৃন্দাবন-শতকের বর্ণনা ও তুকারামের বর্ণনা অনেক স্থলে এক ভাব জাগাইয়া দেয়।

হরিনাম কীর্তন-মহিমা বর্ণনা করিয়া তুকা শতাধিক অভঙ্গ রচনা করিয়াছেন। এই গানগুলির মধ্যে এরূপ সরলতা ও মাধুরী বর্তমান যে,

উহারা অতি সহজেই শ্রোতৃগণের মন আকর্ষণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ চরণে লাগাইয়া দেয়, একটী অভঙ্গ—

"নাম ঘেতাং ন লগে মোল। নাম মন্ত্র নাহী খোল॥
দোংচি অক্ষরাংচে কাম। উচ্চারাবেং রাম রাম॥
নাহীং বর্ণাশ্রম জাতি। নামী অবঘীংচি সরতি॥
তুকা মহ্নে নাম। চৈতন্য নিজধাম॥"

হরিনাম গ্রহণকারীর কোনও মূল্য দিতে হয় না, নাম মন্ত্রের কোনো বিধি নিষেধ রহস্যও নাই। মাত্র দুইটী অক্ষরের প্রয়োজন। মুখে বল "রাম" "রাম"। ইহাতে বর্ণ, আশ্রম, জাতি বিচারের স্থান নাই। তুকা বলেন—শ্রীহরিনাম চৈতন্য স্বরূপ। আরও বলিতেছেন—

সত্য সাচ খরে। নাম বিঠোবাচে বরে॥
জেনে তুটতি বন্ধনেং। উভয় লোকীং কীতি জেনে॥
ভাব জ্যাংচে গাংঠীং। ত্যাসী লাভ উঠা উঠী॥

সত্য সত্য বলিতেছি বিঠোবার শ্রেষ্ঠ নামের তুলনা নাই। উহাতে ভববন্ধন ছিন্ন হইয়া যায় এবং ইহকাল পরকাল উভয়তঃ কীর্তি ঘোষিত হইয়া থাকে। যাহার ভাবসম্পত্তি আছে তাহার আর কথাই নাই। সে খুব বেশী লাভবান হয়। তুকা বলেন—নামে কলিকালের পরাজয় হয়। এই নাম সঙ্কীর্তনের ন্যায় আর কোনো সাধন দেখিতেছি না। ইহাতে জন্মান্তরের পাপরাশি জলিয়া যায়। এই নাম সাধনে কোনও শ্রম স্বীকার করিতে হয় না বা বনেও যাইতে হয় না বরং সুখে সুখে ভক্তের ঘরেই ভগবান্ আগমন করেন। একস্থানে স্থির ভাবে এক মনে আকুলতার সহিত অনন্তের নাম কীর্তন করিতে হয়।

রামকৃষ্ণ হরি বিট্‌ঠল কেশবা। মন্ত্রহা জপাবা সর্বকাল॥

এই নামরূপ মহামন্ত্র ভিন্ন জীবের আর কোনও সাধন নাই। আর যে সাধক এই নামসাধনরূপ সম্পত্তি লাভ করিয়াছে, সে সর্ব প্রকার ধনী হইয়া গিয়াছে। তাহার মত আর কেহ নাই। হরিনাম উচ্চারণ করিলে আর পাতকের ভয় নাই। হরিনামকারীকে দেখিয়া কলিকাল ভয়ে কম্পিত হয়। হরিনাম কীর্তনকারীর জন্ম ও মরণ-ভয় শেষ হইয়া যায়। তাহার আর তপস্যার অনুষ্ঠান বা অন্য সাধনের প্রয়োজন হয় না।

"কৃষ্ণ বিষ্ণু হরি গোবিন্দ গোপাল। মার্গহা প্রাঞ্জল বৈকুণ্ঠীংচা।"

ভগবানের নাম কীর্তনই বৈকুণ্ঠগমনের অতি সরল পথ। আরও দেখ—সকলাংসী যেথে আহে অধিকার। কলীযুগীং উদ্ধার হরিনামে॥ এই হরিনামে সকলেরই অধিকার। কলিযুগের উদ্ধারের উপায় শ্রীহরিনাম।

"সরলীং হীং নামে উচ্চারাবী সদা। হরি বা গোবিন্দা রামকৃষ্ণা।"

সর্বদা হরি, গোবিন্দ, রাম কৃষ্ণনাম সরলভাবে কীর্তন করিবে।

সন্ধ্যা, কর্ম, ধ্যান, জপ, তপ অনুষ্ঠান। অবঘেংঘড়ে নাম উচ্চারিতাং॥
ন বেংচে মোল কাহীং লগাতী ন সায়াস। তরীকাং আলস করিসী মহ্ণী॥

শ্রীহরিনাম করিলেই সন্ধ্যা, ধ্যান, তপ, জপ প্রভৃতি সকল সাধন করা হইয়া যায়, আর ঐ নাম কোনো মূল্যেও বিক্রয় হয় না, বা নাম উচ্চারণ করিতে পরিশ্রমও হয় না, কেন উহাতে আলস্য করিতেছ? আরও দেখ কলিকালের সাধন কি সুন্দর। উহাতে শুধু আছে বাহু দোলাইয়া দোলাইয়া নৃত্য এবং গীত।

গায়েং নাচেং বাহেং টালী। সাধন কলী উত্তম হেং॥

কলিযুগে শ্রীহরি সঙ্কীর্তন কর। এই সাধন শ্রীভগবান নারায়ণ কলিজীবকে ভেট দিয়াছেন, ইহাতেই দর্শন দিয়াছেন।

কলিযুগামাজী করাবেং কীর্তন।' তেনেং নারায়ণ দেইল ভেটী॥

যাহারা সর্বদা শ্রীহরিনাম করেন তাহাদিগকে দেখিয়াও পতিত জীবের উদ্ধার হয়—

বিঠোবাচেং নাম জ্যাচে মুখীং নিত্য।
ত্যা দেখিল্যা পতিত উদ্ধরতী॥

অন্যান্য সাধন অধিকারী অনধিকারী বিশেষে পরিবর্তিত হইয়া ব্যবহৃত হয়, শ্রীনাম কিন্তু সকলের মুখে একরূপ। উহা ব্রাহ্মণকেও যেরূপ পবিত্র করে পতিতাকেও সেইরূপ উদ্ধার করে। এইরূপ মহিমাময় শ্রীহরিনাম যাহার রসনায় নৃত্য করে না, তাহাকে প্রেত বলিয়াই জানিবে।

বাচে বিট্ঠল নাহীং। তোচি প্রেতরূপ পাহীং॥

বিশেষতঃ শ্রীনামের মহিমায় যাহার বিশ্বাস হইল না, সে জীবিত থাকিয়াও নরক মধ্যে বাস করিতেছে।

বিট্ঠল নামাচা নাহী জ্যা বিশ্বাস।
তো বসে উদাস নরকামধ্যেং॥

শ্রীভগবানের স্বরূপ বর্ণনায় বেদ কখনও তাঁহাকে সগুণ কখনও নির্গুণ বলিয়াছে, নামে কিন্তু এরূপ সগুণ নির্গুণের ভেদ নাই। নাম সর্বদাই একরূপ।

"সগুণ নির্গুণ তুজ ম্হনে দেব।
তুকা ম্হণে ভেদ নাহীং নামীং॥

শ্রীহরিনাম কণ্ঠে গ্রহণ করিলে শরীর শীতল হইয়া যায়, ইন্দ্রিয়গণ আর পারিয়া উঠে না। তাহারা পরাজিত হয়।

"নাম ঘেতাং কণ্ঠ শীতল শরীর। ইন্দ্রিয়াং ব্যাপার নাঠবনী॥

তুকারাম বিনয়ের খনি। তিনি বলিতেছেন—যাহার মুখে শ্রীহরিনাম তিনি যতই দুরাচারী হউন না কেন, আমি কায়মনোবাক্যে তাহার চিহ্নিত দাসগণের অন্যতম।

হো কাং দুরাচারী।
বাচে নাম জো উচ্চারী॥
ত্যাচা দাস মী অঙ্কিত।
কায়াবাচা মনেং সহিত॥

তিনি শ্রীনাম কীর্তন করেন এই তাহার যথেষ্ট গুণ। এই গুণেই আমি তাহার বন্দনা করি তাহার স্বভাবের পরিচয়ে আমার কি প্রয়োজন আছে? অগ্নির সৌজন্য শীত নিবারণে, তাহা বলিয়া অগ্নিকে কি কেহ আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া আদর করে? বৃশ্চিক সর্পও নারায়ণ তাহা বলিয়া উহাদিগকে কেহ স্পর্শ করিবার দুঃসাহস করে না। উহাদিগকে দূর হইতেই বন্দনা করিবে।

জন দেব তরী পায়াংচি পড়াবেং।
ত্যাচিয়া স্বভাবে চাড় নাহী॥
অগ্নিচে সৌজন্য শীত নিবারণ।
শালবাং বান্ধোন নেতা নয়ে॥
তুকা মহ্‌নে বিংচু সর্প নারায়ণ।
বন্দাবে দুরোন শিবোং নয়ে॥

শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিলে যে সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় সে সম্বন্ধে তুকা বলিয়াছেন—শ্রীনাম করিলে অঙ্গে রোমাঞ্চ, নয়নে প্রেমাশ্রু এবং সর্বাঙ্গে প্রেমপুলক হয়। কণ্ঠ প্রেমে রুদ্ধ হইয়া আসে।

নাম আঠবিতাং সগদ্গদিত কণ্ঠীং।
প্রেম বাঢ়ে পোটীং ঐসেং করীং॥
রোমাঞ্চ জীবন আনন্দাশ্রু নেত্রীং।
অষ্টাঙ্গ হী গাত্রীং প্রেম তুজে॥

শ্রীহরিনামের গুণে মাতোয়ারা তুকারাম বলিয়াছেন—শ্রীহরি যেরূপ শ্রীহরিদাসও সেইরূপ। তাহার কোন ভয়, মোহ, চিন্তা বা আশা নাই।

"হরি তৈসে হরীচে দাস। নাহীং তয়াং ভয় মোহ চিন্তা আস॥"

এই কথা তাঁহার জীবনে সুন্দর ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, ছত্রপতি শিবাজীর সহিত মিলন-প্রসঙ্গে। রাজ-দরবারে আসিতে অস্বীকৃত হইলে শিবাজী স্বয়ং সাধু তুকারামের সমীপে আগমন করেন। তুকারাম তখন তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে তুকারাম কিরূপ অকিঞ্চন একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন।

রায়া ছত্রপতি ঐকাবেং বচন। রামদাসীং ধ্যান লাবা বেগীং॥
রামদাস স্বামী সোয়রা সজ্জন। যাসি তুং নমন অর্পী বাপা॥
মারুতী অবতার প্রগটলা। উপদেশ কেলা তুজ লাগীং॥
রাম নাম মন্ত্র তারক কেবল। ঝালাসে সীতল উমাকান্ত॥

হে ছত্রপতি, আপনি আমার কথা শুনুন। আপনার গুরুদেব শ্রীরামদাসের চিন্তায় অবিলম্বে লাগিয়া থাকুন। তিনি অতিশয় মাননীয় এবং সজ্জন। তাহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিবেন। তিনি আপনাকে কৃপা করিবার জন্যই প্রকাশিত হইয়াছেন। তিনি মারুতির অবতার। একমাত্র তারক রামনাম মন্ত্র যাহাতে উমাকান্ত শঙ্করের আনন্দ সেই নাম তিনি আপনাকে উপদেশ করিয়াছেন। যে নাম জপ করিয়া বাল্মীকি বাল্মীকি হইয়াছেন এবং পুরাকালের সকল লোক উদ্ধার পাইয়াছে সেই বীজ মন্ত্র, তাহাতে আবার বশিষ্ঠের উপদেশ ইহা হইতে আর অধিক কি কাছে? অতএব অপর কোনো সৎসঙ্গের আশা করিবেন না। শ্রীরাম পাণ্ডুরঙ্গ আপনাকে কৃপা করুন; হে নৃপশ্রেষ্ঠ, আমার আশা করিবেন না, অনতিবিলম্বে গুরু রামদাসের সমীপে গমন করুন। আমারও আপনাকে দিয়া কোনো প্রয়োজন নাই। কেন না

আপনি ছত্রপতি, আর আমি পত্রপতি। আপনার রাজ্যে আপনার অধিকার আর আমার ভিক্ষার অধিকার চারিদিকে। পাণ্ডুরঙ্গ আমার সর্বস্ব। আপনি পবিত্র-চিত্ত রামভক্ত নৃপতি। আমি বিঠোবার দাস শুদ্ধ-ভিখারী। আমার নিমিত্ত আপনি কর্ত্তব্যে উপেক্ষা করিবেন না। গুরু রামদাসের চরণ সমীপে গমন করুন। সদ্‌গুরুর শরণ গ্রহণ সকল কল্যাণের নিদান।

তুকা ম্হনে রায়া মূলা আশা কল্যাণ।
সদ্‌গুরু শরণ অসেং বাপা॥

একদা কোনও স্ত্রীলোক সাধুজীর নিকটে অসৎ অভিপ্রায় লইয়া উপস্থিত হইলে সাধুজী বলিয়াছিলেন—

পরবিয়া নারী রখুমাই সমান। পরস্ত্রী আমার রুক্মিণী মাতার মত। আরও—

"ন সহাবে মজ তুঝে হে পতন।
ন কো হেং বচন দুষ্ট বদোং॥"

আমা হইতে তোমার অসৎপথে পতন ঘটিবে না। তুমি কোনও দুষ্ট কথা আমার কাছে বলিও না। তুকা মহ্‌নে তুজ পাহিজে ভ্রতার॥ আমাকে তোমার ভাইএর মত দৃষ্টিতে দেখ।

সাধুজীর জীবনী সম্বন্ধে বহু আশ্চর্য ঘটনা শুনা যায়। একদা তুকারাম পরমাবিষ্ট হইয়া শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতেছেন। বহু শ্রোতা সেই কীর্ত্তন রসে ডুবিয়া আছেন। তাহাদের মধ্যে ছত্রপতি শিবাজীও আছেন। শত্রুগণ চতুর শিবাজীর সহিত কিছুতেই পারিয়া উঠিতেছিল না। তাহারা যে স্থানে কীর্ত্তন আনন্দে অসহায় অবস্থায় শিবাজী রহিয়াছেন বহু সৈন্য লইয়া সেই স্থানটি আক্রমণ করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে তাহারা দুর্গের নিম্নে আসিয়া উপস্থিত হইল। অল্পক্ষণের মধ্যে দুর্গ আক্রান্ত হইবে এবং সাধুজীর

হরিকীর্তন রসের ভঙ্গ হইবে এই ভাবিয়া শিবাজী তুকারামকে বলিলেন —মহাত্মন্ আমি বাহিরে গিয়া আত্মসমর্পণ করি নতুবা শত্রুগণ দুর্গ আক্রমণ করিয়া কীর্তনের অশান্তি উৎপাদন করিবে একা আমার জন্য কীর্তনানন্দ ভঙ্গে প্রয়োজন নাই। শিবাজীর এই কথা শুনিয়া সাধুজী শান্তভাবে উত্তর দিলেন যাঁহার নাম গান করিতেছি তাঁহার ইচ্ছা হইলে আনন্দ ভঙ্গ হইবে—অপরে আমাদের কি করিবে ? স্থির চিত্তে বসিয়া থাকুন, বাহিরে যাইবার প্রয়োজন নাই। সাধুজীর আদেশে শিবাজী বসিয়াই রহিলেন—কীর্তন দ্বিগুণিত উৎসাহে চলিল। বাহিরে শত্রুগণ দেখিতে পাইল সন্ধ্যার অন্ধকারে অশ্বারোহণে শিবাজী দুর্গের বাহিরে আসিয়া পলাইয়া যাইতেছে। সৈন্যগণ পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও তাহার খোঁজ পাইল না যেন কিছু দূর গিয়া পাহাড়ের গায়ে মিলাইয়া গেল। তুকার কীর্তন অনুরাগে শ্রীহরিই শিবাজীর বেশে কীর্তন রসের ভঙ্গ যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন।

অপর আর একদিন তুকা কীর্তন আনন্দে ডুবিয়া আছেন এমন সময় এক কসাই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মহাশয়, আমি গরুগুলি লইয়া যাইতেছিলাম উহা হইতে একটী গরু ছুটিয়া কোন্ দিকে গেল আপনি কি দেখিয়াছেন ? যদি দেখিয়া থাকেন তবে বলিয়া দিন। করুণহৃদয় তুকা ভাবিলেন লোকটি কসাই—হারানো গরুটির সন্ধান বলিয়া দিলে উহার মৃত্যু অনিবার্য অথচ মিথ্যা কথাই বা বলি কেমন করিয়া ? দেখিয়াছি গরু এই দিক্ দিয়াই গিয়াছে। ভাল আমি মিথ্যা না বলিয়াও কেমন করিয়া গরুর প্রাণ বাঁচাইতে পারি ? ক্ষণকাল চুপ্ করিয়া থাকিয়া তিনি বলিলেন দেখ, তোমার গরু ছুটিয়া যাইতে যে দেখিয়াছে সে বলিতে পারে না, আর যে বলিতে পারে সে দেখে নাই। কসাই সাধুকে পাগল বলিয়া উপেক্ষা করিয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। সাধু

কিন্তু ঠিক্ কথাই বলিলেন—চক্ষু কথা বলিতে পারে না, বাক্ ইন্দ্রিয়ও দেখিতে পারে না।

তুকারামের কাল নির্ণয়ে বহুপ্রকার মতভেদের কারণ বর্তমান রহিয়াছে। অধ্যাপক S. K. Belvelkar এবং R. D. Ranadeএর মতানুসারে সম্ভবতঃ ১৫৯৮ খৃঃ তুকা জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫০ খৃঃ বদি দ্বিতীয়া বৃহস্পতিবার তিনি দেহত্যাগ করেন। জ্ঞানদেবের সমাধি মন্দির আছে। সমর্থস্বামী রামদাসের সমাধি আছে। একনাথ ও নামদেবেরও সমাধি-স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। তুকারামের কিন্তু সেরূপ কোনো সমাধি-স্থান নির্দিষ্ট নাই। এই কারণেই বৈকুণ্ঠ গমনের প্রসঙ্গ হইয়া থাকিবে। যাহাই হউক না কেন জীবিত থাকা কালেই যে তুকা পূর্ণরূপে ভগবানের ভাবে ভাবিত হইয়াছিলেন—তাহার দেহ মন সব কিছুই ভগবানের হইয়া গিয়াছিল, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই।

তুকারামের জীবনে যাহাদের প্রভাব পড়িয়াছে তাহাদের মধ্যে সর্বাগ্রে তাহার গুরু বাবাজীর উল্লেখ করিতে হয়। এই বাবাজী সম্বন্ধে অনেক সমালোচনা হইয়াছে। ইহার সম্যক্ পরিচয় এখনো সঠিকভাবে পাওয়া গিয়াছে তাহা বলা যায় না। ইনি কে? রাঘব চৈতন্য-কেশব চৈতন্য-বাবাজী চৈতন্য এই নাম তুকারাম উল্লেখ করিয়াছেন তাহার দীক্ষা প্রসঙ্গে। কিন্তু ইহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা হয় নাই। তুকারামের এক শিষ্যা বহিনাবাঈ বলেন রাঘব চৈতন্য সচ্চিদানন্দ বাবার শিষ্য ছিলেন। এই সচ্চিদানন্দ বাবা জ্ঞানদেবের শিষ্য এবং জ্ঞানেশ্বরীর পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কারক। ইহাতে প্রমাণিত হয় তুকারাম জ্ঞানদেবের প্রশিষ্য।

এই সকল চৈতন্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য ১৭৮৭ খৃঃ লিখিত চৈতন্য কথা কল্পতরু নামক এক গ্রন্থে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে ১৬৭৪ খৃঃ কৃষ্ণদাস লিখিত কোনো গ্রন্থ বিশেষ হইতে তথ্য সংগ্রহ হইয়াছে।

ইহাতে দেখা যায়, তুকারামের অন্তর্ধানের মাত্র ২৫ বৎসরের মধ্যে উহা লেখা হয়। উক্ত গ্রন্থের বিবরণে পাওয়া যায়, রাঘব চৈতন্য উত্তম নগরীতে বাস করিতেন। বর্তমান ওতুরা সহর পুষ্পবতী বা কুসুমাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদী কুকুরী নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। রাঘব চৈতন্যের শিষ্য বিশ্বনাথ চৈতন্য, ইহারই অপর নাম কেশব চৈতন্য। কেহ বলেন—কেশব চৈতন্য ও বাবাজী চৈতন্য একই ব্যক্তি। তুকারামের গুরু যে চৈতন্য এ সম্বন্ধে সকলেই একমত এবং তিনি বৈষ্ণব বাবাজী।

যাহাদের প্রভাব তুকা অধিকপরিমাণে নিজের জীবনে অনুভব করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে চারিজন মহাত্মা প্রধান। তুকা বলেন—দর্জীর পুত্র নামদেব নির্বাধে ভগবানের সঙ্গে খেলা করিয়াছেন। জ্ঞানদেব তাহার ভ্রাতা ও ভগ্নীর সহিত ভগবানকে ঘিরিয়া নৃত্য করিয়াছেন। রামানন্দের শিষ্য কবীর তাঁহার প্রেমের সঙ্গী হইয়াছেন। একনাথস্বামী বহুশিষ্য সঙ্গে করিয়া ভজন করিয়াছেন। আর কিছু না করিলেও এই চারিজন ভক্তের অনুসরণ কর। জ্ঞানদেবকে তুকারাম যে খুবই সম্মান করিতেন তাহা পরিষ্কার বুঝা যায়। কেহ কেহ তুকারামকে নামদেবের অবতার বলেন। ইহার তাৎপর্য তিনি নামদেবের ভাবটিকে অন্তরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। নামদেব ও তুকার অভঙ্গ তুলনা করিলে দেখা যায়, যদিও নামদেবের রচনায় ভাব প্রবণতা অধিক বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন, তুকার সঙ্গীতে তাহার অভাব নাই বরং ভাবপ্রমত্ততার সঙ্গে আধ্যাত্মিক অনুভূতির সূক্ষ্ম পরিচয় উহার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইঁহাদের কাহারও ভাবুকতা বা রস-প্রেরিত প্রাণের ধারা দার্শনিক বিচার নিয়ন্ত্রিত নয়। ইঁহাদের অন্তরের অনুভব দর্শনের বিচার-যুক্তির সীমা লঙ্ঘন করিয়া কেবল শুদ্ধ দরদীর প্রাণধারার সহিত মিলিত হইয়াছে। তুকা জ্ঞানেশ্বরী কণ্ঠস্থ

করিয়া লইয়াছিলেন। এই জ্ঞানেশ্বরী জ্ঞানদেবকৃত, মারাঠী ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা। একনাথকৃত ভাগবত একাদশ স্কন্ধের ব্যাখ্যাও তাহার নিত্যপাঠ্য। এই একনাথী-ভাগবত-রসে তিনি ডুবিয়া থাকিতেন। নামদেবকৃত অভঙ্গ, জ্ঞানদেব রচিত জ্ঞানেশ্বরী এবং একনাথী-ভাগবত তুকার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকে শুদ্ধ করিয়া তাঁহার ভাবময় জীবন ধারাকে দরদীর রূপ প্রদান করিয়াছিল, ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সকলের উপর তাঁহার সেই বাবাজী গুরুদেব সাক্ষাৎভাবে তাঁহাকে যে ভাব-প্রেরণা দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার জীবন শত সহস্র তিক্ততার মধ্যেও মধুক্ষরণশীল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি আপন মনে গান গাহিতেন, নিজে মুগ্ধ হইতেন— যে শুনিত সে মুগ্ধ হইয়া যাইত। ভগবদনুভবে তাহার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিত। তিনি শ্রোতৃবর্গকে সেই অনুভবামৃতে আপ্যায়িত করিতেন।

সাধু তুকার সহিত সমর্থস্বামী রামদাস এবং ছত্রপতি শিবাজীর সাক্ষাৎকার প্রসিদ্ধ ঘটনা। তুকার অদর্শন হয় ১৬৫০ খৃঃ। রামদাসস্বামী ১৬৩৪ খৃঃ কৃষ্ণানদীর তীরে আসিয়া বাস করেন। শিবাজী ১৬৪৯ খৃঃ তোরণা দুর্গ আক্রমণ করেন। এই সকল বিবেচনা করিলে তুকারামের সহিত রামদাস এবং শিবাজীর মিলন ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়া গ্রহণ করিতে কোনো বাধা থাকে না।

তুকার অভঙ্গে এই সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে। দেহু ও লোহাগাও নামক স্থানে যখন নিয়মিত ভাবে কীর্তন করিয়া সাধু তুকারাম অবস্থান করিতেছিলেন, শিবাজী তখন পুণাতেই ছিলেন। পুণা হইতে দেহু ও লোহাগাও খুব দূরবর্তী নয়। শিবাজী সাধু তুকার নিকট বীরত্ব সম্বন্ধে বহুপ্রকার উপদেশ পাইয়াছেন, ইহাও নিঃসন্দেহে স্বীকার করা যায়। তুকা বলেন—তাহাকেই যথার্থ বীর বলিব যে লৌকিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় বিষয়েই শৌর্য-প্রকাশ করিতে সমর্থ। সাহসিকতা

ভিন্ন দুঃখ যায় না। সৈন্যগণ অবশ্যই প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবে। ভগবান সাহসী বীরকেই আশ্রয়দান করেন। যে অগণিত শর-বর্ষণের মধ্যেও নিজের প্রভুর পক্ষ সমর্থন করিয়া প্রাণ বিসর্জন করে, তাহার পরকালে অনন্ত সুখ লাভ হয়। নিজে বীর না হইলে অপর বীরের সম্মান করিতে পারে না। যাহারা কেবল উদর ভরণের জন্য অস্ত্র ধারণ করে তাহারা অর্থান্বেষীমাত্র, তাহাদের বীরত্বের নাম গন্ধও নাই। যথার্থ বীরের পরিচয় বিপদের মুখে।

কৃষ্ণানদীর তীরে অবস্থান কালে রামদাসস্বামী পণ্ডরপুরে বিঠোবার মন্দিরে গমন করেন। তিনি বিঠোবা ও রামচন্দ্র যে একই, এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া অভঙ্গ রচনা করেন। বিঠোবার প্রধান ভক্ত সমসাময়িক তুকারামের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছে, ইহা বলা কোনো মতেই অযৌক্তিক হইবে না।

একটি প্রবাদ আছে—রামদাস এবং তুকারাম পণ্ডরপুরে ভীমা নদীর দুই তীরে থাকিয়া পরস্পর দেখা করেন। একজন কাঁদিতেছিলেন অপর জন বিলাপ করিতেছিলেন—তুকারামের শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন—গুরুজী, আপনি এরূপ কাতরভাবে ক্রন্দন করিতেছেন কেন? তুকা উত্তর দিলেন—আমি কেন কাঁদিতেছি?—তবে বলি, আমি দেখিতেছি সংসারী লোকেরা ভগবানের সন্ধানে কত আনন্দ তাহা বুঝিল না। ইহারা মিথ্যা সংসারের অল্প আনন্দে মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ইহাই আমার বড় দুঃখের কারণ হইল। রামদাসকে তাহার শিষ্যেরা জিজ্ঞাসা করিলেন—স্বামিন্, আপনি ওরূপ বিলাপ করিতেছেন কেন? তিনি বলিলেন—আমি কত চিৎকার করিয়া করিয়া মানুষের মায়ার ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিলাম, কোনো ফল হইল না দেখিয়াই আমি কাতর প্রাণে বিলাপ করিতেছি।

বহুলোক তুকার সমীপে শরণাগত হইয়াছিল। তুকার শিষ্যগণের মধ্যে শাস্তাজী প্রধান, গঙ্গারাম দ্বিতীয়। শাস্তাজীর লেখা তুকার অভঙ্গগুলি পুঁথির আকারে এখনো রহিয়াছে। অন্যান্য শিষ্যের মধ্যে রামেশ্বরভট্ট কর্তৃক বিবরণে তুকার সম্বন্ধে বহু বিষয় অবগত হওয়া যায়। পার্শ্ববর্তী জনগণের দ্বারা যখন তুকা নানাভাবে নির্য্যাতিত হইতেছিলেন, রামেশ্বর তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়া সেই কার্য্যে প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন। এই রামেশ্বর পণ্ডিত হইলেও ধর্ম্মজীবনের অমৃতাস্বাদ হইতে বঞ্চিতই ছিলেন।

একদা কোনো অজ্ঞানিত হস্ত হইতে তুকার উপর গরমজল বর্ষিত হওয়ার ফলে সাধুজী বড় জ্বালা অনুভব করেন। তিনি বলেন—আমার শরীর পুড়িয়া যাইতেছে, আমার মনে হইতেছে আমার আত্মাই জ্বলিয়া গেল। হে প্রভু, আমাকে রক্ষা কর। আমার প্রতিটি রোমের মধ্যে জ্বালা অনুভব করিতেছি। মৃত্যু বুঝি আর দূরে নয়। দেহ ও আত্মা পৃথক্ হইয়া যাইবে। এখনো তুমি আসিলে না? আমার পিপাসার জল লইয়া এস, আর কেহ আমাকে এই অবস্থায় সাহায্য করিতে সমর্থ নয়। তুমি আমাকে জননীর মত স্নেহে রক্ষা করিতে সমর্থ।

রামেশ্বর ভট্টকে সাধুর জ্বালার অনুরূপ জ্বালা ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই ভট্টই সাধুর গায়ে গরম জল ঢালিবার মূলে ছিলেন। তিনি জ্বালায় অস্থির হইয়া সাধুর নিকট আসিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তুকা ছিলেন মহান্। তিনি ভট্টের দুর্দশা দেখিয়া করুণার্দ্র চিত্ত হইলেন। তাহার উদ্দেশ্যে একটি অভঙ্গ রচনা করিলেন।

মন পবিত্র হইলে শত্রুও বন্ধুরূপে পরিণত হয়। যাহার মনে হিংসা নাই তাহাকে ব্যাঘ্র বা সর্পও হিংসা করে না। বিষ তাহার সমীপে অমৃত হইয়া যায়। আঘাতও তখন সহায়ক, অকর্ম তখন কর্মরূপে রূপান্তরিত

হয়। দুঃখ তখন সুখের নিদান, অগ্নি শীতল স্পর্শ। সর্বত্র এক আত্মা বিরাজিত, এই ভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে পূর্বোক্ত অবস্থা হইয়া থাকে।

রামেশ্বর ভট্ট তাহার ভাব-পরিবর্তন সম্বন্ধে বলেন—তুকারামের সহিত হিংসার ফলে আমি দৈহিক যাতনা ভোগ করিয়াছি। জ্ঞানদেব স্বপ্নে দেখা দিয়া আমাকে বলিলেন—সাধুশ্রেষ্ঠ-নামদেবের অবতার তুকারামের নির্যাতন তুমি করিয়াছ, ইহার প্রায়শ্চিত্ত তাহার সমীপে শরণাগত হওয়া। যাও তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করো, তবেই তুমি রোগ-মুক্ত হইবে। স্বপ্নের পরহইতে আমি নিয়মিতভাবে তুকারামের কীর্তন শুনিতে যাইতাম। কিছুদিন যাইতে না যাইতে আমি রোগ-যাতনা-মুক্ত হইলাম।

আমি বুঝিলাম যত পাণ্ডিত্যই থাকুক না কেন তুকারামের সমান লোক দুর্লভ। বেদ পুরাণ পাঠ করিলেই অধ্যাত্ম আলোক পাওয়া যায় না। জাতি ও কুলের গৌরবে একালে ব্রাহ্মণগণ অধ্যাত্ম আলোক হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। তুকারাম বণিকের পুত্র হইলেও ভগবানের ভক্ত। তাহার কথা অমৃত তুল্য। তিনি বেদের তাৎপর্যই লৌকিক ভাষায় গান করেন। তাহার সরলতা, অনাসক্ত-ভাব এবং জ্ঞান অনন্য সাধারণ। বহু সাধু জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, রামশ্বর ভট্ট বলেন—একমাত্র তুকারামই বান্ধবগণের নিকট বিদায় লইয়া সশরীরে বিমানে আরোহণ পূর্বক গোলোকে গমন করিয়াছেন।

তুকা কৃষিকার্য নিরত বণিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এই কুলে জন্ম হইয়াছে বলিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন—হে প্রভু, তুমি ভালই করিয়াছ। উচ্চকুলে জন্ম হইলে আমি সাধুসেবা বঞ্চিত হইয়া অহঙ্কারে প্রমত্ত হইতাম। উহার ফল হইত নরকে গতি। আমার কুলের রীতি অনুসারে আমি তীর্থযাত্রা করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছি। আমি

পণ্ডরীকে দর্শন ভিন্ন ধর্ম জানি না, একাদশী ব্রতভিন্ন ব্রত জানিনা। আমি প্রভুর নাম নিরন্তর গ্রহণ করিব। আমরণ আমার এই একমাত্র অবলম্বন।

প্রায়শঃ দেখাযায়, মরমী সাধুগণ যতই একান্তে ভজন করিবার নিমিত্ত ইচ্ছা করেন সংসারের আকর্ষণ এবং নানারূপ বিভীষিকা ততই তাহাদিগের অধ্যাত্ম পথের বাধারূপে পুঞ্জীভূত হইতে থাকে। বিপদ তাহাদিগকে আক্রমণের পর আক্রমণ করিয়া ব্যস্ত করিয়া তোলে। সাধু তুকারাম বলেন—আমি কি খাইব, কোথায় যাইব? আমি কাহার সাহায্যে গ্রামে বাস করিব? গ্রামের মোড়ল এবং আরও পাঁচজনে আমার প্রতি দিন দিন অসন্তুষ্ট হইতেছে। আমাকে কে ভিক্ষা দিবে? তাহারা বলিবে, তুমি কোনো কাজ কর না কেন? তোমার বিচার হওয়া প্রয়োজন। গ্রামের প্রধানদের নিকট যাইয়া আমি বলিয়াছি—আমি একজন সাধারণ লোক, আমার নিকট কোথা হইতে এতলোক কেন আসে, তাহা আমি বলিতে পারি না। এখন বহু লোকের সমাগমে আমার ভজন পূজন আর হয় না। আমি ইহাদের সঙ্গ ছাড়িয়া বিঠোবার নিকট চলিয়া যাইব।

তুকা বলেন—আমার গৃহ দুঃখময় হইলেও উহা আমার মনকে কাবু করিতে পারে নাই। আমার জমি খাজনার দায়ে বিক্রয় হইয়াছে, হউক। দুর্ভিক্ষের অন্নকষ্টে পরিবারের লোকেরা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আমার স্ত্রী দুর্বাক্য দ্বারা আমাকে দুঃখ দিবার চেষ্টা করিয়াছে, করুক। লোকে আমার সুনাম নষ্ট করিয়া নিন্দা করিয়াছে। আমাকে তাহারা অসম্মান করে, করুক। আমার ধন সম্পত্তি সকলই গিয়াছে, যাউক। হে বিঠোবা, লোকের সমাজে লজ্জিত আমি তোমার আশ্রয় লইলাম। আমি তোমার জন্য মন্দির নির্মাণ করিলাম তোমারই জন্য স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিলাম।

স্ত্রী সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—আমার গৃহে নিত্য সাধু অতিথির আগমন হয়। আহা! তাহারা দুটি মধুরবাক্য পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন, তাহাও আমার গৃহে জুটিল না। সাধুরা আমার নিকট আসেন, করতাল বাজাইয়া গান করেন। তাহারা লোকলজ্জা ত্যাগ করিয়াছেন। নিন্দা গ্রাহ্যই করেন না। তাহাদের দেহরক্ষার চিন্তা নাই। সেই সাধুদের প্রতি আমার স্ত্রী ক্ষ্যাপা-কুকুরের মত ব্যবহার করে।

পত্নী দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। পিতা মাতা মরিয়াছে। পুত্র মরিয়াছে। এখন তাহার আর কেহ নাই। তিনি বলেন—বিঠোবা, এখন তুমি ও আমি; আমাদের মধ্যে আর কেহ প্রতিবন্ধক নাই। সাংসারিক জীবনের যত দুঃখ উহা ভগবানের কৃপা। ভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্তকে সংসারের আসক্তিকে তিক্তবোধ করাইবার নিমিত্ত দুঃখের আঘাত করিয়া রক্ষা করেন। তাঁহাব ভক্তকে সম্পদ্ দান করিলে সে যে অহঙ্কারী হইবে, এজন্য তাহাকে অর্থ দেন না। তাহার স্ত্রী যদি মনের মত হয়, তবে সে আসক্তির মোহে ভগবানকে ভুলিয়া যায়, এজন্য তাহাকে স্বাধীন প্রকৃতি মুখরা ভার্যা দেন। এ সকল আমি নিজেই অনুভব করিয়াছি, অপরের নিকট ইহা শিক্ষাকরিতে হয় নাই।

নামদেব তুকারামের প্রায় তিনশত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হন। একদিন স্বপ্নে আসিয়া তিনি তুকাকে বলেন—তুকা, তোমার বাক্য সার্থক কর। অভঙ্গ রচনা করিয়া ভগবানের মহিমা গান কর। আমি শত কোটি সংখ্যায় তাঁহার নাম করিব বলিয়া ভাবিয়াছিলাম, আমার সংখ্যা পূর্ণ হয় নাই। আমার অপূর্ণ সংখ্যা পূর্ণ করিবার ভার তোমাকে দিলাম। ছন্দের জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। ভগবান্ তোমার ছন্দ ও মাত্রা রক্ষা করিবেন। তুমি শুধু অভঙ্গ রচনায় মন দাও।

সংখ্যা পূর্ণ হইয়াছে কি না কে বলিবে? তবে এ কথা বলা যাইতে

পারে নামদেব যে রচনার পথ প্রদর্শক উহা তুকার প্রচেষ্টায় পুষ্টি লাভ করিয়া মহারাষ্ট্র সাহিত্যে অপূর্ব রসের অবতারণা করিয়াছে। নামদেবের কৃপায় স্বপ্নে তাহাকে ভগবান্ দর্শন দিয়াছেন। তুকা এই নিমিত্ত নামদেবের সমীপে কৃতজ্ঞ। স্বপ্নে ভগবানের দর্শন ও নামদেবের নির্দেশে তাহার অন্তরের গোপনতন্ত্রী মধুরঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। তিনি বলেন —আমি আমার মত অভঙ্গ রচনা করিয়াছি, উহা কাহারো ভালে লাগিবে কি না জানি না। ভগবান্ জানেন, কাহাদের জন্য এগুলি তিনি আমাকে দিয়া রচনা করাইলেন। ইহাতে আমার কর্তৃত্ব অভিমান কিছু নাই। এই গানগুলি আমি তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াই নিশ্চিন্ত।

তুকারাম ভগবানের দর্শন করিয়া বলিলেন—আমার দুঃখের মধ্যে তুমি দেখা দিয়াছ। আমার মত দুঃখীর সঙ্গে সঙ্গে তুমি ছায়ার মত থাক। আমার সমীপে তুমি কিশোর মূর্তিতে আসিয়াছ। তোমার সুন্দর মোহনরূপে আমাকে মুগ্ধ করিয়াছ—আমাকে আলিঙ্গন করিয়াছ—আমাকে সান্ত্বন দিয়াছ। আমি তোমাকে আমার দুঃখ দূর করিবার জন্য ডাকিয়া কষ্ট দিয়াছি—আমাকে ক্ষমা কর—আর কখনো দুঃখ পাইলেও তোমাকে উদ্বিগ্ন করিব না। আমি মুখ বুজিয়া সকল দুঃখ সহ্য করিব।

আমি তোমার ধৈর্যের উপর চাপ দিতেছিলাম। আমি না বুঝিয়া ত্রয়োদশ দিবস উপবাসী ছিলাম। তুমি ইন্দ্রায়ণীর জল হইতে আমার অভঙ্গগুলি তুলিয়া দিয়াছ। আমার মনের দুঃখ দূর করিয়াছ। এখন হইতে প্রাণান্তেও আমি তোমাকে উদ্বিগ্ন করিব না। আমি বুঝিলাম—দেখিলাম তুমি তোমার ভক্তের জন্য কত কষ্ট সহ্য কর। যাহা বলিয়াছি ক্ষমা কর, ভবিষ্যতে আর কখনো ওরূপ করিব না—সাবধান হইব। সাধুর জন্য তুমি সকলই করিয়া থাক। আমি অজ্ঞ তাহাতেই অধীর হইয়াছিলাম। যাহাই হউক না তুমি নিজের হাতে আমাকে কৃপা বিতরণ করিয়াছ।

কেহ আমার গলায় কাটারি দিয়া আঘাত করে নাই—কেহ আমাকে আক্রমণও করে নাই, তবু আমি তোমার সাহায্যের জন্য কাতর কণ্ঠে ক্রন্দন করিয়াছি। তুমি কৃপালু, এইরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাকে ও আমার অভঙ্গগুলিকে রক্ষা করিয়াছ। করুণায় তুমি অতুলনীয়। আমার বাক্য তোমার মহিমা বলিতে অসমর্থ। মাতার অধিক স্নেহে তোমার অন্তর পূর্ণ। চন্দ্র হইতেও তুমি আহ্লাদক। তোমার সৌন্দর্য অমৃত-তরঙ্গিণীর ধারায় প্রবাহিত। তোমার গুণের সহিত কাহার তুলনা করিব? আমি নিঃশব্দে তোমার পদতলে মস্তক স্থাপন করিতেছি। আমি পাপমতি— আমাকে তোমার পদতলে স্থান দাও। সংসারে আমার প্রয়োজন নাই। প্রতিক্ষণে আমার বুদ্ধির বিপর্যয় হয়, চিত্তের স্থিরতা বিনষ্ট হয়, আমার উদ্বেগ দূর করিয়া হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাক।

আলন্দী গ্রামে জ্ঞানদেবের মন্দির। এক ব্রাহ্মণ জ্ঞানদেবের কৃপা-প্রেরণা পাইবার জন্য ধ্যানে বসিয়া থাকেন। কয়েকদিন এইভাবে অপেক্ষায় অতিবাহিত হইল। ব্রাহ্মণ স্বপ্নে দেখিলেন—জ্ঞানদেব আসিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন,—ব্রাহ্মণ, তুমি তুকারামের কাছে যাও। সেখানেই তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের আলোক পাইবে। ব্রাহ্মণ সাধুর নিকট আসিলেন। তুকারাম তাহাকে উপদেশ দিয়া বলিলেন—কেবল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া চলিলেই হইবে না, তুমি ভগবানের কৃপা লাভ করিবার ব্রত গ্রহণ কর। তাঁহার নাম গ্রহণ করিলে তিনি তোমার সহায় হইবেন। মুক্তি বলিয়া কোনো বস্তু ভগবানের হাতে নাই যে, তিনি উহা ভক্তকে দিয়া দিবেন। ইন্দ্রিয়জয় করিয়া প্রাকৃত ভোগ্য সামগ্রীর অনুসন্ধান ছাড়িয়া দিলেই অনায়াসে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবানের কৃপার ভরসা কর। মনের চঞ্চলতা দূর কর। তিনি করুণা-সমুদ্র। এক নিমেষের মধ্যে তিনি তোমাকে দুঃখাতীত করিতে পারেন।

গোবিন্দের ধ্যান কর। তন্ময় হইয়া যাইবে। তোমাতে ও তাঁহাতে ভেদ দর্শন হইবে না। আনন্দে অন্তর পূর্ণ হইবে। প্রেমাশ্রুধারা বহিয়া যাইবে। তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে ভাবিতেছ কেন? বিশ্বের সর্বত্র আপনাকে ছড়াইয়া দাও। ভোগময় জীবন ধারা ত্যাগ করিতে বিলম্ব করিও না। তুমি নিজেকে ক্ষুদ্র ভাবিয়া অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া যাইতেছ—পদে পদে দুঃখ অনুভব করিতেছ।

জ্ঞানদেবের কথা স্মরণ করিয়া তিনি বলেন,—অসীম জ্ঞানভাণ্ডার—অধ্যাত্ম জ্ঞানগুরু, আপনার জ্ঞানদেব নাম সার্থক হইয়াছে। আমার ন্যায় হীন ব্যক্তিকেও আপনি মহান্ করিয়াছেন। আপনার সহিত দেবতারও তুলনা হয় না। অপরের সহিত তুলনা করিব কেন? আপনার অভিলাষ। আমি বুঝিব কেমন করিয়া? আমি বিনীতভাবে আপনাকে নমস্কার করি, বালক যা খুশি তাই বলে। আপনি মহান্, তাহার প্রলাপ আপনি ক্ষমা করিবেন। আমার প্রার্থনা, আপনি আমাকে আপনার পদতলে স্থান দিবেন।

•তুকার আধ্যাত্মিক জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষা কত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়া পূর্ণতা লাভ করিয়াছে তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অধ্যাত্ম জীবনের ব্যর্থতার অমানিশা সাধককে যখন চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ফেলে, সহস্র দুঃখ যখন কাল নাগিনীর ন্যায় ফণা তুলিয়া বিষ-বাষ্পে আকাশ বাতাস ভরিয়া ফেলে, তখন সাধক একমাত্র তাহার প্রিয়তমের করুণা-কটাক্ষের অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়। সাংসারিক দুঃখ তুকার জীবনকে অসহনীয় করিয়াছিল, তথাপি তিনি ধৈর্য ধারণ করিয়া শেষ পরিণতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া ধীর পদবিক্ষেপে চলিতেছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—আমার প্রভুর সমীপে যে সম্পদ্ পাইয়াছি, আমি উহা কিছুতেই ছাড়িব না। আমি আত্মার অন্বেষণে নিরলস হইব। ভগবৎ স্মরণে বিস্মৃতিকে বিদায় দিব। তাঁহার প্রাপ্তির

আনন্দে সকল লজ্জা বিসর্জন দিব। তাঁহাকে পাইবার জন্য স্থিরসঙ্কল্পেই আমি সুখ অনুভব করিতেছি। মিথ্যা মায়িক সম্বন্ধ দুঃখের কারণ। সংসার সম্বন্ধে আমি কঠোর হইব। প্রশংসার আশা করিয়া নিন্দার ভয়ে ভীত হইব না। কে আমাকে অনুগ্রহ করিল—স্নেহ করিল, সেদিকে তাকাইব না। কোথায় সুখ পাইলাম—কে দুঃখ দিল, ইহা ভাবিব না। যাহারা ভগবানকে পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহারা দৃঢ়ভাবে তাঁহার চিন্তায় লাগিয়া থাকুন। ওরে আমার মন! তুমিও লৌহের মত দৃঢ়তা অবলম্বন কর।

যে যা বলে বলুক। কাহারও নিন্দা প্রশংসা শুনিবার আমার সময় নাই। আমাকে তোমরা সকলে বিদায় দাও। ব্যবহারিক লোকের সঙ্গে মেলামেশা করিবার অবসর আমার কোথায়? তাহারা যে ব্যবহারিক কথা বলিয়াই আমার চিত্তকে বিক্ষিপ্ত করে। আমায় গৃহহারা কর—সম্পদহীন কর—সন্তান হীন কর। আমার যখন আসক্তির আর কেহই থাকিবে না, বাধ্য হইয়াই হে ভগবন্! সকল আসক্তি তোমার দিকে' যাইবে। আমাকে দেশান্তরী-ভ্রমণকারী করিয়া দাও, তবেই নিশিদিন আমি তোমার চিন্তা করিতে বাধ্য হইব। আমি যেন ভাল খাদ্য না পাই। আমার কুলে কেহ না থাকুক্। হে ভগবন্! কেবল তোমার কৃপাই যেন আমার উপর বর্ষিত হয়। আমাকে যত পার দৈহিক দুঃখ দাও, কিন্তু আমার মনটি তোমার কাছে তুলিয়া রাখ। আমি জানি, দেহ, গৃহ, পুত্র সকলই ভঙ্গুর। কেবল তুমিই নিত্য সুখস্বরূপ।

লোকে বলে, দেহকে রক্ষা কর। বলতো উহার প্রয়োজন কি? তাহারা কি জানে না, মৃত্যু যে কোনো সময়ে এই দেহকে আক্রমণ করিতে পারে? এই দেহকে মৃত্যু অনায়াসলব্ধ খাদ্যের মত গিলিয়া ফেলে। আর আমরা সেই দেহেরই পুষ্টির নিমিত্ত কত সুখাদ্য সুপেয়ের

প্রয়োজন অনুভব করিতেছি। ইহা কি আমাদের অজ্ঞানের ফলই নয়? বার্ধক্য আসিয়া আমাদিগকে দেহান্ত কালেরই কি খবর দেয় না? তবু কি আমরা সচেতন হইব না? কখন মৃত্যু আসিবে তাহার স্থিরতা আছে কি? অপরের দেহ যখন অগ্নিতে ভস্মীভূত হইতে দেখ, তখন কি একবারও ভাবনা যে, তোমারও শরীর এই ভাবে ভস্মীভূত হইবে?

মৃত্যুর পূর্বেই ভগবানকে ডাকিয়া লও। দেহ-ধারণের শেষমূল্য মৃত্যু। তবে আর ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বনের প্রয়োজন কি? পার্শ্ববর্তী লোকের গৃহে যখন ডাকাতি হয়, তুমি কেন নিজের সম্পত্তি সম্বন্ধে ভুলিয়া থাকিবে। ডাকাতেরা বন্ধুর মুখোশ পরিয়া তোমার সর্বস্ব হরণ করিয়া লইতেছে। তখনও তুমি মোহের আবরণে থাকিবে? অন্তরের সম্পদ্ রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টিত হও। ভগবানের সমীপে শরণ গ্রহণ ভিন্ন মৃত্যুর হাত এড়াইবার আর উপায় নাই। মৃত্যুর দূত যখন আসিবে তখন তাহাকে কি বলিয়া ফিরাইবে? কোন সম্পদের গরিমায় তুমি মৃত্যুকে ভুলিয়া রহিয়াছ? ভগবান্‌কে স্মরণ কর—জন্ম মৃত্যুর ভয় বন্ধন দূর হইবে। তুমি অর্থ দানকর বলিয়া লোকে তোমাকে ভালবাসে, প্রীতি করে। মৃত্যু সময়ে কেহ তোমাকে সাহায্য করিতে পারিবে না। তোমার নাকে মুখে যখন স্রাব ক্লেদ গলিত হইবে তখন তোমার সন্তান, পত্নী, সকলেই ঘৃণায় সরিয়া যাইবে। স্ত্রী বলিবে, আর সহ্য হয় না, সকল বাড়ীটাই নোংড়া করিয়া ফেলিল। তখন ভগবান ভিন্ন আর কেহ তোমার সহায় নাই। মৃত্যু আসিতেছে, ইহা জানিয়া তুমি কেমন করিয়া সংসারের সঙ্গে জড়াইয়া থাকিতে পার? পিতা, মাতা, রাজা, শাসনকর্ত্তা, যে যত ভাল মানুষই হউক না, কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারে না।

দেহ ভঙ্গুর হইলেও ইহা দ্বারা অনেক কাজ করা যায়। অভিমান

ত্যাগ করিয়া মনকে নির্মল করিলে যেখানে সেখানে তীর্থযাত্রার ফল লাভ করা যায়। পবিত্রমনা ব্যক্তি বাহিরে কোন অলঙ্কার ধারণের প্রয়োজন মনে করেন না। তাহার মুখে ভগবানের নামই পরম অলঙ্কার। অন্তরের আনন্দই হৃদয়ের আভরণ। সাধু ব্যক্তি তাহার দেহ, ধন ও মন ভগবানে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি পরশমণি হইতেও অধিক হইয়াছেন। মানবদেহ ভগবানের অনুভবের সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ। দেবতারাও মানবদেহ ধারণ করিবার জন্য অভিলাষী হন। আমরা মানবদেহ ধারণ করিয়া ভগবানের সেবা করিতে শিখিয়াছি। আমাদের জীবন ধন্য। আমরা এই দেহেই ভগবানকে পাইতে পারি। এই দেহই আমাদের মুক্তির দ্বার।

সাধু তুকারাম এই পার্থিব দেহ সম্পূর্ণরূপে ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিবার জন্য নির্দেশ দান করিয়া জীবনের আদর্শ দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন—প্রভু! তোমাকে আমি এই নিবেদন জানাইতেছি—আমি যেখানেই থাকি, আমার মস্তক যেন তোমার চরণেই লুণ্ঠিত থাকে। আমার মন যেন সতত তোমারই ভাবনা করে। দেহ, ধন ও মনের বিকল্প হইতে আমাকে কাড়িয়া লও। মৃত্যু সময়ে কফ পিত্ত বায়ুর আক্রমণ হইতে মুক্ত কর। আমার যতক্ষণ সামর্থ্য আছে, আমি তোমার নাম করিব। অসহায় অবস্থায় তুমি সহায় হইও। আমি তোমার পাদপদ্ম সর্বদাই স্মরণ করিতেছি। আমার মনের ভাব তুমি জান, অপরকে তাহা জানিতে দিব না। আমি কোনমতে জীবন-ভার বহন করিতেছি, কিন্তু দৃষ্টি রাখিয়াছি তোমার রূপে নিবদ্ধ। আমার বাণীকে তোমার গানে নিযুক্ত করিয়াছি। আমার মন তোমার দর্শনের অভিলাষী। অপর কিছু আমি চাহি না। কর্তব্যের ভার বহন করিয়া চলিয়াছি, মন কিন্তু তোমাতেই সংলগ্ন রহিয়াছে।

তুকা ভগবানকে অন্বেষণ করিয়া পাইয়াছেন। তাহার ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তিনি সকলকে ডাকিয়া সেই সহজ উপায় নির্ধারণ করিয়া বলিতেছেন—আমার কাছে ভগবানকে ধরিবার একটি ঔষধ আছে। তিনি আমাদের নিকট হইতে পলাইয়া থাকিবেন সাধ্য কি? আমরা অভিমান ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে ডাকিব, তিনি না আসিয়া পারিবেন কেন? আমি প্রেমের রজ্জুতে তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিব।

প্রিয়তমকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন—তুমি যেখানেই যাও না কেন দেখিতে পাইবে, তুকা দাঁড়াইয়া আছে। আমি আমার প্রেম সব জায়গায় ছড়াইয়া দিব। আমার প্রেমের ভূমি ছাড়া তুমি আর স্থান পাইবে না। যেখানে যাও, আমি তোমার উপর নজর রাখিব। তোমার রহস্য আর আমার কাছে গোপন রাখিতে পারিবে না। কূর্ম যেমন তাহার শরীরটিকে লুকাইয়া রাখে, আমিও তোমাকে তেমনি আমার অন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছি। আমি কোনো অবস্থাতেই তোমার রূপটিকে গলিয়া যাইতে দিব না। তোমার নামগানের বিকশিত লতিকার কুঞ্জমণ্ডপে আমি বিহগরূপে বাস করিব। কুসুম শোভায় আমোদিত হইয়া তৃপ্তির রসময় ফল আস্বাদ করিব।

ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে তুকারাম সাধু-সঙ্গের মহিমা বলিয়াছেন। তিনি বলেন—আমার মনের মত সাধুর দেখা পাইলেই আমি সন্তুষ্ট। যাহারা আমার প্রিয়তমকে ভালবাসেন, তাঁহাদের মিলন আকাঙ্ক্ষায় আমার প্রাণ কাঁদে। আমার চক্ষু তাঁহাদের দর্শনের জন্য তৃষিত হইয়া থাকে। সেরূপ সাধুদের দর্শন ও আলিঙ্গনে আমার জীবন ধন্য হয়। আমি প্রাণ ভরিয়া প্রিয়তমের গান গাহিতে পারি। অভিমানী সাধু, একগুঁয়ে পণ্ডিত ও যান্ত্রিকদের ঘরে আমি ভগবানকে দেখিতে পাই না! দেখি, শুধু তাহারা পরস্পর কথা কাটাকাটি করে।

সেখানে আত্মজ্ঞানের বিপরীত লাভ হয়। যাহাদের মনের উপর সংযমের বাঁধ নাই, তাহারা নিরর্থক পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে। আমাকে যেন এরূপ সংসর্গে পড়িতে না হয়।

তুকা বলেন—হে ভগবন্, আমি পণ্ডরপুরের ধূলি বা পথের কাঁকর হইয়া থাকিব। আমি তোমার পদস্পর্শের অভিলাষে আর সকলই পরিত্যাগ করিয়াছি। সাধুরা যখন তীর্থ যাত্রায় পণ্ডরপুরে আসিবেন, আমি তাহাদের পদস্পর্শ পাইয়া ধন্য হইব। আমি সাধুদের পাদুকা হইয়া থাকিব। তাহাদের আশ্রমদ্বারে কুকুর বা বিড়াল হইয়া থাকিব। আমি সেই ঝরণা বা কূপ হইব—যাহার জলে সাধুরা পদ ধৌত করিবেন। সাধুদের সেবার উপযুক্ত দেহ পাইলে আমি জন্মান্তরের জন্য ভয় করি না।

সাধুগণ আমাকে কৃতজ্ঞতা পূর্ণ করিয়াছেন। তাহারা আমাকে সর্বদা জাগ্রত রাখিয়াছেন। তাহাদের অনুগ্রহের প্রতিদান দিতে আমি অসমর্থ। তাহাদের পায়ের তলায় আমার সমগ্র প্রাণ সমর্পণ করিলেও তাহাদের ঋণ শোধ হইবার নয়। তাহারা আত্মহারা হইয়া থাকিলেও আমাকে অপরিমেয় অধ্যাত্ম-জ্ঞান দান করেন। তাহারা স্বভাব সুলভ বাৎসল্যে আমার সমীপে আগমন করেন এবং আমাকে প্রীতি করেন। আমার জীবনের দুঃখই আমাকে ভগবানের স্মরণ করাইয়া জাগ্রত রাখিয়াছে।

ভগবানের দর্শনে আকাঙ্ক্ষা হইলেই সহসা তাহার দর্শন হয় না। বহু প্রকার ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দর্শন লালসার তীব্রতা কি প্রকারে ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করে, তুকার জীবনে তাহার পূর্ণাঙ্গ আদর্শ রহিয়াছে। জানিতে ইচ্ছা করিলেই ভগবানের জ্ঞান লাভ হয় না। তুকা বলেন—লোকে যাহা মনে করে, আমি সেরূপ মোটেই নই। আমি তাঁহাকে জানিবার জন্য কত চেষ্টা করিলাম। এখনো তাহাকে জানিতে পারি নাই। আমি তাহাকে না দেখিতে পাইলে কেমন করিয়া নৃত্য

করিব ? তিনি যে আমাকে বঞ্চিত করিতেছেন। তাহার পূর্ণজ্ঞান আমার এখনো হইল না। তিনি কি জানেন না আমি একজন বণিক, আমায় সহসা ঠকানো সম্ভব হইবে না।—আমাকে নাচাইতে হইলে দেখা দিতে হইবে। আমি তো স্বপ্নেও একদিন তোমার মধুর মোহনরূপ দেখিতে পারি না ? তোমার চতুর্ভুজরূপ, গলার বনমালা, ললাটে কস্তুরী-তিলক-শোভা আমাকে একটিবার স্বপ্নেও দেখাইতে পার ! আমি তোমার কাছে যত নিবেদন করিলাম, সবই আমার বিফল হইল ? আমার যত দুঃখ সকলই রহিয়া গেল, আমাকে সান্ত্বনা দিলে না, আমার অভিলাষ পূর্ণ করিলে না ? তুমি স্বপ্নে দেখা দিলেও আমি আশ্বস্ত হইতাম। আমি যে সাধুসমাজে বসিতেও লজ্জা বোধ করি। আমার উৎসাহ ভাঙ্গিয়া পড়িল, আমি বড় অসহায় বলিয়া অনুভব করিতেছি।

লোকমর্যাদা, দৈহিক সুখ, সর্বপ্রকার সম্পৎ আমার আত্মাকে বিভ্রান্ত করে। হে ভগবন্, তুমি আমার নিকটে এস। শুধু বিচার বিজ্ঞানে আর আমার প্রয়োজন নাই। উহা গৌণ, প্রধানতঃ আমি তোমার দর্শন প্রার্থনা করি। আমার প্রাণ কেবল তোমার দর্শনের নিমিত্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতেছে। বিশ্বব্যাপী তোমার অনন্তরূপ আমার দর্শন এবং ধারণার অতীত। শুনিয়াছি, তুমি ভক্তের প্রতি করুণা করিয়া তাহাদের অভিমত রূপ গ্রহণ কর। এস, আমি যে ভাবে তোমাকে দর্শন করিয়া গ্রহণ করিতে পারি, সেই চতুর্ভুজরূপে এসো। তোমার ভক্ত উদ্ধব, অক্রূর, ব্যাস, অম্বরীষ, রুক্মাঙ্গদ, প্রহ্লাদকে যে রূপ দেখাইয়াছ, আমাকে সে রূপ দেখাও। তোমার সুন্দর বদন ও পাদপদ্মের শোভা দেখিবার জন্য আমার অন্তর চঞ্চল হইয়াছে। তুমি যে মোহনরূপে রাজর্ষি জনকের গৃহে গিয়াছিলে—যে কারুণ্যপূর্ণ মূর্তি ধরিয়া বিদুরের গৃহে অন্ন ভোজন করিয়াছ

—যে রূপে পাণ্ডব-বান্ধব তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের সহায়ক হইয়াছিলে—যে রূপে তুমি দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছ—যে রূপে তুমি গোপীর সহিত খেলা করিয়াছ—যে রূপে তুমি গোবৎস ও রাখাল বালকের আনন্দ দিয়াছ, আমার সমীপে তোমার সেই ভুবন-সুন্দর রূপ প্রকাশ কর। সাধুগণ বলেন, তাহাদের ভক্তিতে তুমি বড় হইলেও ছোট হইয়া দেখা দিয়াছ। আমি তোমার দর্শন পাইলে আশা মিটাইয়া কথা বলিব। তোমার পাদপদ্ম হৃদয়ে ধারণ করিব, সেই শোভায় দৃষ্টি স্থাপিত করিব, তোমার সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়াইয়া থাকিব। আমার অন্তরের এই গোপন বাসনা তুমি ভিন্ন আর কেহ পূর্ণ করিতে পারিবে না। আমি যে তোমার জন্য পাগল হইয়াছি। তোমাকে দেখিব বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করি, কই দেখিতে না পাইয়া যে কাঁদিয়া মরি। আমি সংসারের সকল সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়াছি। তোমার যে রূপের কথা শুনিয়াছি উহা দেখিবার জন্য এখন আমি ব্যাকুল হইয়া ছুটাছুটি করিতেছি। তুমি কি অপর কোনো ভক্তের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, না নিদ্রিত হইয়া রহিয়াছ? তুমি বুঝি গোপীর অঞ্চলে বাঁধা পড়িয়াছ? তাহাদের মুখের দিকে বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিয়াছ কি? তুমি কি কোনো ভক্তের বিপদে সহায়তা করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছ? বহু দূরের পথে যাইবে বুঝি? তুমি কি আমার কোনো দোষ দেখিয়াছ, তাই তুমি আমার কাছে আসিতেছ না? তোমার অদর্শনে আমার প্রাণ যায়। বল, বল, কেন তুমি দেখা দাও না?

সুখাদ্য দেখিয়া ক্ষুধার্ত ভিখারী যেরূপ লুব্ধ হয়, আমার মন তোমার জন্য সেইরূপ হইয়াছে। ক্ষীরের লাড্ডু লইয়া পলাইবার জন্য বিড়ালের যেরূপ আকুলতা, তোমার জন্য আমারও সেইরূপ। শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার সময় মেয়ে বাপের বাড়ীর দিকে যেরূপ উৎকণ্ঠায় দৃষ্টিপাত করে, আমার মনও তোমার জন্য সেইরূপ করিতেছে।

আমি যাহাকে পাই জিজ্ঞাসা করি কবে তুমি আমার কাছে আসিবে? তোমার সহিত নিমেষের জন্যও আমার বিচ্ছেদ হইবে না। আমি সকলই ভুলিয়াছি, শুধু তুমি আমার সবখানি ভাবনার বিষয় হইয়াছ। এমন লোকের দেখা কবে পাইব যে আমাকে বলিয়া দিবে তুমি আমার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য আসিতেছ?

প্রাচীন সাধুরা সর্বেন্দ্রিয়জয়ী। আমি যে একটি ইন্দ্রিয়কেও সংযত করিতে পারিলাম না। তবে কি আমি তোমার দর্শন পাইব না? আমার সংশয় ও মনের সঙ্গে সর্বদা যুদ্ধ চলিয়াছে। হঠাৎ অজানিত ভাবে দুঃখ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করে। শুধু তোমার নাম-বলে আমি কোনরূপে সেই বিপদে রক্ষা পাই। পথে অন্ধকার দেখিয়া আমার ভয় হয়। চারিদিক্ শূন্য, ভয়সঙ্কুল, কাহাকেও বিশ্বাস করা যায় বা কাহারও ভরসা করা যায়, এরূপ দেখি না। শ্বাপদ-বিপৎসঙ্কুল পথে অন্ধকারে আমি পথ চলিতে বহুবার স্খলিত ও পতিত হই। বহু পথের মুখে আসিয়া কোন্ পথে যাইব ঠিক করিয়া উঠিতে পারি না। আমার গুরুদেব আমাকে একটি পথ দেখাইয়া দিয়াছেন, তবু তুমি এখনও অনেক দূরে রহিয়াছ। আমার মনের চঞ্চলতা হইতে আমায় রক্ষা কর। সে নিমেষের জন্য স্থির হয় না। এখন আর তুমি আমার সম্বন্ধে অমনোযোগী হইও না। এই অসহায়ের সহায় হও। আমার ইন্দ্রিয়গুলি যে আমার মনকে শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিল। আমার নিজের সকল প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে। এখন শুধু তোমার কৃপার অপেক্ষায় রহিয়াছি।

অধ্যাত্ম জীবনের পথে নিজের দোষগুলি যখন চোখে পড়ে তখন ঐগুলি দূর করিবার জন্য সাধক চেষ্টা করে। সে অনুভব করে, তাহার ব্যক্তিগত চেষ্টা দুর্বার ইন্দ্রিয়-লালসার গতির সম্মুখে ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার আঘাতে জর্জরিত সাধক তখন ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া প্রশান্ততা লাভ করে।

তুকা বলেন—আমার কত দোষ তাহা আমি জানি। চেষ্টা করি ঐগুলি হইতে মনকে দূরে রাখিতে—পারি না। আমার মন লালসার সামগ্রীর দিকে ছুটিয়া যায়, ধরিয়া রাখিতে পারি না। একমাত্র তোমার করুণা আমাকে রক্ষা করিতে পারে। আমি যে ইন্দ্রিয়ের দাস হইয়া রহিলাম। যত দোষই করি না কেন তুমি যেন নির্দয় হইও না। আমার মন বলে, আমি অন্যায় করিতেছি, আমি জানি আমার দোষ আছে, তোমার নিকট লুকাইবার উপায় নাই। এখন তুমি যাহা ভাল মনে কর করিবে। আমি তোমার কৃপার অপেক্ষা করি। আমার যে সকল গুণ ছিল—হারাইয়াছি। এখন আমি পরের দোষ খুঁজিয়া বেড়াই। লোকের নিকট প্রশংসা শুনিবার আশায় থাকি। এখন আমি সাধু জীবন যাপন করিতেছি—বলিতে সঙ্কোচ হয়। আমার ভয় হয়, তুমি বুঝি আমাকে গ্রহণ করিবে না। আমার মনের স্থিরতা আর নাই। মন এখানে সেখানে ছুটাছুটি করে। ব্যবহারিক আসক্তির বন্ধনে আমি আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি। সুখাদ্য সুপেয় আমার লোভের সামগ্রী হইয়াছে। আমি সকল প্রকার দোষের খনি হইয়াছি। নিদ্রা, আলস্য আমাকে পরাজিত করিয়াছে। বাহিরে সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছি, কিন্তু আসক্তির বস্তুগুলি ত্যাগ করিতে পারি নাই। সর্বদা ভাবি, আমার মন একই সামগ্রীতে বার বার আসক্ত হইতেছে। উহাকে নিবৃত্ত করিতে পারিলাম না। আমি এক বহুরূপী হইলাম বাহিরে সাধু, ভিতরে আমার কোন পরিবর্তন হইল না।

জীবনের দোষগুলি বড় করিয়া দেখিতে দেখিতে নিজেকে ধিক্কার দিয়া সাধক বলেন—ধিক্ আমার অভিমান—আমার সুখ্যাতিকে শত ধিক্। আমার পাপের সীমা নাই—দুঃখেরও অন্ত নাই। আমি এই সংসারের এক দুর্বিসহ ভার রূপে পরিণত হইয়াছি। আরও কত দুঃখ

সহ্য করিতে হইবে জানি না। যত দুঃখ সহিয়াছি তাহাতে পাষাণও চূর্ণ হইয়া যায়। আমার দোষের কথা জানিলে মানুষ আমার দিকে ফিরিয়াও দেখিবে না। আমার কায়মনোবাক্যে দোষ করিয়াছি—আমার হস্ত, পদ, চক্ষু, দোষ করিয়াছে। হিংসা, বিদ্বেষ, বিশ্বাসভঙ্গ কোন দোষ করিতে বাকী নাই। আমার নিজের দোষের কথা আর কত বলিব? অল্পধনের গর্বে স্ফীত আমি কত অন্যায় করিয়াছি। আমার পিতার আদেশ অমান্য করিয়াছি। আমি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়াসক্ত হইয়াছিলাম। হে সাধুগণ—আমার প্রার্থনা, আপনারা আমাকে ভগবানের সমীপে গ্রহণের যোগ্য করিয়া দিন।

স্বাধীনতার অভিমানে আমি বহু অন্যায় করিয়াছি। আমি তোমার নাম শুনি নাই, গান গাহি নাই। আমি মিথ্যা লজ্জার অভিনয় করিয়াছি। সাধু প্রসঙ্গে মন দিই নাই। আমি বরং সাধুদের গালি দিয়াছি—নিন্দা করিয়াছি। আমি অকৃতজ্ঞ হইয়া লোকের দুঃখ উৎপাদক হইয়াছি। আমি নিরর্থক সংসারের বোঝা বহন করিয়াছি। আমি তীর্থযাত্রা করি নাই। শুধু দেহের পুষ্টি বিধান করিয়াছি। সাধুর সেবা করি নাই। দান করি নাই, দেবতার পূজা করি নাই। ভগবানের দর্শনে বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া সাধক ভাবেন—বুঝি তাহার পাপগুলিই বাধক হইয়াছে। সেই ভাবে তুকা বলেন—তোমার দর্শনের জন্য আমার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে কিন্তু বুঝিতেছি, পাপগুলি তোমার ও আমার মধ্যবর্তী হইয়া তোমাকে দেখিতে দিতেছে না। এখন তোমার কৃপা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। আমার দিকে দৃষ্টি করিলে আর আশা নাই। আমি পাপী, তুমি পবিত্র। আমি পতিত, তুমি উদ্ধারক। পাপী তাহার প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিবে—উদ্ধারক তাহার নিজের মহত্বে ছুটিয়া আসিয়া রক্ষা করিবে। লোহার হাতুড়ি দিয়া স্পর্শমণিকে ভাঙ্গিতে গেলেও মণির স্পর্শে লৌহময় যন্ত্রটি স্বর্ণ হইয়া যায়।

কস্তুরীর গন্ধ সংযোগে মাটিরও মূল্য অধিক হইয়া যায়। আমরা তো পাপ করিবই। হে ভগবন্, তুমি যে কৃপালু। তুমি যেন তোমার কর্তব্যে অবহেলা করিও না।

মরমী সাধক নিজের জীবন পর্যালোচনা করিয়া বলেন—তুমি আমাকে গ্রহণ করিবে কি করিবে না, ইহাই এখন আমার ভাবনার বিষয় হইয়াছে। তোমার পাদ-পদ্ম দর্শন হইবে কি না সেই চিন্তা আমার মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তুমি আমার সঙ্গে আলাপ করিবে কি না তাহাই আমি ভাবিতেছি। আমার সন্দেহ হইতেছে বহু লোকের মধ্যে তুমি আমাকে চিনিয়া লইবে কি না? আমি তোমার সমীপে গ্রহণের যোগ্য হইতে পারি নাই। তুমি কি ভাবিতেছ আমাকে দেখা দিলে আমি তোমার নিকট কিছু চাহিব? আমি তো তোমার দর্শনেই কৃতার্থ হইব। আর কোন সামগ্রী চাহিবার মত আমি দেখি না। আমি ধন, সম্পৎ, মান, এমন কি মুক্তির আশাও পরিত্যাগ করিয়াছি। আমি শুধু একটিবার তোমার দর্শন প্রার্থনা করি। একটিবার শুধু তুমি আমাকে তোমার বক্ষঃস্থলে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ কর।

সাধু তুকা মনে করেন—তিনি সম্যক্‌রূপে ভগবানে আত্মনিবেদন করিতে পারেন নাই বলিয়া ভগবান্ তাহাকে দর্শন দেন না। তিনি বলেন—আমি যদি সত্যই তোমাকে আমার দেহ মন নিবেদন করিয়াছি কেন আবার ভয় আসিয়া আমাকে অভিভূত করে? অহো আমি কি দুর্ভাগ্য! বুঝিয়াছি, আমার বুকে মুখে এখনও একভাব হয় নাই। হে প্রভু, আমার এই অন্যায়ের জন্য ন্যায্য শাস্তি দাও।

দৈন্যের ধ্বনি তুকার গানে বহুলোক তাহার প্রশংসা করে। এই সকল প্রশংসায় পাছে কোন অভিমান আসিয়া দেখা দেয় এইজন্য সাধু ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলেন—প্রভু, তুমি লোকের ভুল ভাঙ্গিয়া দাও। আমার মনে কামনা ও ক্রোধের বোঝা অত্যন্ত বেশী

হইয়াছে, এজন্য আমার হৃদয়ের দ্বার তোমার সমীপে খুলিয়া দিলাম তুমি এই হৃদয় শুদ্ধ করিয়া লও। সাধুগণের প্রশংসিত হইয়া আমার মনে অভিমান হইয়াছে। ইহাতে আমার সদ্‌গুণ ধ্বংস হইয়া যাইবে। আমি মনে ভাবি আমি খুব জ্ঞানী। হে ভগবন্‌, এই অভিমান হইতে তুমি রক্ষা কর অন্যথা উপায় নাই।

সাধু তুকারাম ভগবানকে জিজ্ঞাসা করিয়া বলেন—প্রভু আমি অযোগ্য হইলেও তুমি কেন আমাকে প্রশংসিত করিয়াছ? মানুষের যখন তীব্র শিরঃপীড়া রহিয়াছে তখন তাহাকে চন্দন-চর্চিত করিলে কি সে আনন্দ বোধ করে? যাহার জ্বর হইয়াছে তাহার নিকট সুখাদ্য সুপেয় উপস্থিত করিয়া কি ফল হইবে? মৃতের মণ্ডন যেরূপ নিরর্থক তেমনি অভিমানী আমার প্রশংসা নিষ্ফল।

কবি তুকারাম তাহার সাধুতার গুণে দীনভাবে বলেন—শিক্ষা পাইলে শুকপাখী নানারূপ কথা উচ্চারণ করে, উহার অর্থ সে কি বুঝিতে পারে? স্বপ্নদৃষ্ট সুখেই কেহ রাজা হইয়া যায় না? আমার কণ্ঠে তুমি গান দিয়াছ কিন্তু ঐ অভিমান আমাকে দূরে রাখিতেছে। প্রতিবিম্ব হাত দিয়া ধরা যায় না—রাখাল বালক গরু চরায়, কিন্তু সে ঐ গরুর মালিক নয়।

তুকা বলেন—ভোগের সামগ্রী আমার বিষের মত বোধ হয়, আমি সুখ ও সম্মান চাই না। আমার দৈহিক সেবা অগ্নিদাহ—সুখাদ্য বিষের মত—প্রশংসা হৃদয়ের শেল। হে আমার প্রিয়, তুমি আমাকে মায়া মরীচিকার দিকে প্রলুব্ধ করিও না। পরিণামে যাহাতে আমার মঙ্গল হয় তাহাই করিও—আমাকে বর্তমান অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার কর।

যেদিন অনাদরে লোক আমায় পরিত্যাগ করিবে—আমি অনুতাপে তোমায় স্মরণ করিব। আমার চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িবে—আমি নির্জনে তোমার ভাবনার অবসর পাইব।

সাধক নির্জন-বাস অভিলাষ করিলেও সাধুসঙ্গ-মহিমা তাহার অন্তরে প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন—অহো, আমার দুর্ভাগ্যক্রমে কোথায়ও একজন সঙ্গী দেখিতে পাই না। সকল দিকেই মহাশূন্য। সকলেই সংসারী কথা বলে, আমার প্রিয়তমের কথাতো কেহ বলে না? আমি যাহার সমীপে প্রভুর কথা শুনিতে পাইব সেই সাধুর সঙ্গলাভ আমার চিরদিন অভিলষিত।

সাধুদের অনুভূতির কথা মনে করিলে আমার প্রাণের মধ্যে জ্বালা অনুভব হয়। সাধুদের সেবার যোগ্য করিয়া লইবার জন্য আমার জীবন আমি উৎসর্গ করিয়া দিব। অনুভূতি-হীন শুধু কথায় কি ফল? নিষ্ফল লতিকার আদর করে কে? সাধুরা তোমার রূপ দর্শন করেন। তাহারা কত ভাবে তোমার বর্ণনা করেন। আমি কি ভাবে তোমার বর্ণনা করিব?

হে প্রভু, আমায় বলিয়া দাও—আমি এমন কি দোষ করিয়াছি যে, তোমার সেবার অযোগ্যই থাকিব? তুমি সকলের কাছেই সমান তবে আমি কেন দূরে থাকিব।

সাধুদের অসীম করুণা। তাহারা ভিন্ন আমার আর কোন অবলম্বন নাই। আমি তাহাদেরই শরণাগত। হে সাধুগণ, আপনারা আমার দিকে একটিবার দৃষ্টিপাত করুন। কোন্‌দিন আমি আরও দশজনের মাঝে দাঁড়াইয়া ভগবানের আনন্দবর্ধক হইতে পারিব? সাধুগণ কোন্ দিন বলিবেন যে, আমি তাহাদের প্রিয় ভগবানের সমীপে গ্রহণের যোগ্য হইয়াছি। তাহাদের আশ্বাস পাইলে আমার মন স্থির হইবে। আমি যে প্রভুর সুন্দর বদন এবং চরণ একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় করিয়াছি। আমি সাধুদের বাক্যই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি। আর কোন সাধনা আমি জানি না। হে সাধুগণ, আপনারা আমার

হৃদয়ের ব্যথা আপনাদের প্রিয় ভগবানের নিকট জানাইবেন। আমি পাতকী পতিত যত দোষের ডালি হই না কেন, আপনাদের কথায় তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। তিনি আমাকে উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। সাধুদের ব্যবহারে যে তিনি ঋণী হইয়া আছেন।

সাধু তুকা বুঝিয়াছিলেন—মানুষ নিজের চেষ্টায় যাহা করিতে অসমর্থ ভগবৎকৃপায় উহা অনায়াসে সুসিদ্ধ হইতে পারে। তিনি জানেন—ভগবানের দয়া হইলে অসম্ভব কিছুই থাকে না। তিনি বলেন—আমি যে তোমার দ্বারের কুকুর, আমি যে তোমার দয়ার ভিখারী। আমাকে দূর করিয়া দিও না। আমি হয় তো তোমার দৃষ্টির কণ্টক। তুমি তো প্রভু সমর্থ। তোমার অচিন্ত্য শক্তিতে আমার দুর্দৈব দূর করিয়া লও। আমি জানি আমার মন সংযম জানে না—ন্যায় উপদেশ গ্রহণ করে না। ইন্দ্রিয়ের টানে পাপে লিপ্তহওয়া তাহার স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমি ভোগের টোপ গিলিয়া বিপন্ন হইয়াছি। এখন যে উহা আর নিজের ক্ষমতায় ত্যাগ করিতে পারি না। আমি যে অক্ষম প্রভু, তোমার দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছি।

বাঁশীর গানে পেটারায় আবদ্ধ কাল-সাপের মত আমি ভোগের টানে সংসারে আবদ্ধ। আমি এই মায়ার বন্ধন ছাড়াইতে অপারগ। খাদ্যের লোভে মীনের মত টোপ গিলিয়া আমি ধরা পড়িয়াছি। ফাঁদে পড়িয়া ডানা ছাড়াইতে যত্ন করিয়া পাখীর মত আরও শক্ত বাঁধনে আবদ্ধ হইলাম। মধুমক্ষিকার মত উড়িতে যাইয়া মধুতে পক্ষ প্রলিপ্ত হইয়া গেল, আমার জীবন যাইবার উপক্রম হইল। হে ভগবন্, আমাকে এখন বাঁচাও। আমি যে শিশু, চলিতে পারি না। তুমি মায়ের প্রাণ লইয়া আমাকে কোলে তুলিয়া লও। আমার ক্ষুধা দূর কর। আমার প্রাণ চাতকের মত শুদ্ধভাবযুক্ত। ফটিকজলভিন্ন মৃত্তিকা-স্পৃষ্ট জল

যে আমার তৃষ্ণা দূর করিতে পারিবে না। আমার তৃষ্ণা তীব্র কিন্তু আমি আকাশের জলেরই প্রতীক্ষা করি। বর্ষার জল না হইলে অঙ্কুরকে সঞ্জীবিত করিবে কে? দীর্ঘ উপবাসের পর সুখাদ্য লাভের ন্যায় সুখময় তোমার দর্শনের অপেক্ষা করিতেছি। আমার অন্তরে দীর্ঘ অদর্শনের পর মায়ের মিলনের জন্য শিশুর প্রাণের আকুলতা জাগাইয়া দাও। লোভীর লোভনীয় সামগ্রী দর্শনে যে লোলুপতা সেই লোলুপতা তোমার জন্য জাগ্রত করিয়া দাও। আমি আর মনের কথা বাক্যে কতটুকু প্রকাশ করিব, তুমি যে আমার মন জান। আমি শুধু তোমার করুণা প্রার্থনা করি। তোমার সমীপে যাইবার যোগ্যতা আমার নাই সেরূপ কোন সাধনার বলও নাই। আমার প্রাণের কথা যথার্থরূপে তোমার সমীপে বলা হইয়াছে কিনা তাহা সর্বহৃদয়ান্তর্যামী তুমি জান।

সাধক ভাবিয়াছেন ভগবানের দর্শন পাইবেন। এই অপেক্ষায় বহুদিন অতীত হইল। কত চেষ্টা—কত আগ্রহ, কোন উপায়ে তাহার দর্শন মিলিল না। ধৈর্য ভাঙ্গিয়া পড়িল। মন হইল উদাস। দর্শনের আশায় ক্ষীণালোক নির্বাপিত প্রায়। তখন তিনি বলেন—আর কত দিন বসিয়া থাকিব? বুঝিলাম প্রভু, আমার দর্শন হইবে না। তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইল। আমার সকল দিক্ সমান ভাবে নষ্ট হইল। আমার সংসার সুখ গেল। মনে ভাবিলাম, তোমাকে দর্শন করিয়া সুখে থাকিব, সে আশাও গেল। আমার ইহকাল পরকাল সব গেল। ঋণে ডুবিলাম। লোকের দ্বারে হাত পাতিবার উপায় আর নাই। অসম্মানিত হইলাম, লোকের সমাজে মুখ দেখাইবার উপায়নাই। সংসারকে অবহেলা করিয়া তোমার পথে বাহির হইলাম। তোমাকেও পাইলাম না। এখন তিরস্কার আর নির্যাতন আমার লাভ হইল। দুশ্চিন্তা আমাকে জর্জরিত করিল।

হতাশার অন্ধকারে সাধক তুকা বলেন—হে প্রভু, তুমি আমাকে গ্রহণ করিলে না। আর আমি ধৈর্য রাখিতে পারি না। বুঝিলাম—তুমি আমার

দুরদৃষ্টের কাছে পরাজিত হইয়াছ। আমার মত অসমর্থ অযোগ্যকে তুমি আর কখন উদ্ধার করিতে পার নাই। বুঝিলাম—তোমার নামের শক্তি আর নাই। তোমার প্রতি ভালবাসা আমার কমিয়া যাইতেছে। আমার বিপুল-পাপ পথ অবরুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। আমার কাছে তোমার আসিবার ক্ষমতা নাই। ভাল কথা, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ, তোমার ভক্ত তোমার কত উপকার করিয়াছে? তোমার ভক্ত তোমাকে সুন্দর রূপ দিয়াছে। আমাদের মত লোকের জন্য তোমার রূপ গ্রহণ করিতে হয়। তোমার নাম প্রকাশ করিতে হয়। এই নাম ভক্তের দান। আমাদের মত লোক ভিন্ন তোমার খোঁজ করে কে? তুমি যে মহাশূন্যরূপেই অপরের কাছে কোণ-ঠেসা হইয়া থাক।

আমার মত লোকের জন্যই তুমি নাম এবং মোহনরূপ গ্রহণ করিয়াছ। অন্ধকারই আলোক শিখাকে উজল করিয়া দেয়। স্থান বিশেষে খচিত হইয়াই মণির শোভা, রোগী নীরোগ হইয়াই চিকিৎসকের মহিমা প্রকাশ করে। বিষের তীব্রতাই সুধার মাধুরী আস্বাদন করায়। পিতল কাছে থাকিলেই সোণার মূল্য অবধারিত হয়। তুমি যে ভগবান্ হইয়াছ সে আমাদেরই জন্য। তুমি বুঝি ভুলিয়া গিয়াছ যে, আমরাই তোমাকে ভগবান করিয়াছি? লোক বড়লোক হইলেই গরীবের কথা ভুলিয়া যায়। আমরা না চালাইলে তুমি চলিতে পার না। তুমি নিরাকার হইলে কিছুই করিতে পারিতে না। তুকা বলেন—কেন তুমি আমাকে এত কষ্ট দিতেছ? হে ভগবন, আমার মনে হয়, আমার এমন যোগ্য বাক্য নাই যে, তোমাকে গালি দিয়া সেই বাক্যের সার্থকতা করি। তুমি নির্লজ্জ, তুমি চোর, তুমি লম্পট, তুমি পার্বত্য প্রদেশে বিচরণ কর। তুমি বনচারী, তুমি পশুপাখী লইয়া থাক, তুমি—তুমি আমাকে ঝগড়ায় প্রবৃত্ত করিয়াছ, এখন কেহ আর আমার মুখ বন্ধ করিতে

পারিবে না। তুমি ভিখারী, তোমার সকল কর্ম মিথ্যা, আমার মত লজ্জাহীন লোকই ধৈর্য ধরিয়া তোমাকে বিশ্বাস করে। তুমি কোন কথা বল না, নির্বাক হইয়া সেবকের সেবা গ্রহণ কর। তুমি যেমন ভিখারী তোমার সঙ্গীগুলিকেও সেইরূপ কর। ধিক্ তোমার আশা, তুমি ভীরু, তোমার সাহস থাকিলে আমার আছে আসিতে। তোমার ও আমার মাঝে আর কেহ নাই, তবু তুমি আমার কাছে আসিতে ভয় কর কেন? জগতের আশ্রয় হইয়াও তুমি এত শক্তি হীন? তোমার নাম উচ্চারণ করিয়া আমরাই তোমাকে শক্তির প্রেরণা যোগাই। হায়, আমি মহামায়ার জালে ধরা পড়িয়াছি।

শুনিয়াছিলাম তুমি দয়ালু, দেখিতেছি তাহার বিপরীত। আমাকে তুমি এত অসহায় করিলে কেন? তোমার সেবক অপরের উপর নির্ভর করিবে কেন? তবে কি আমার আত্মনিবেদন বিফল, তুমি কি দয়ার দান ভুলিয়া গেলে? কেন আমার জন্ম হইল? কেন আমাকে অপরের করুণার পাত্র করিয়াছ, ইহা কি তোমার অকর্মণ্যতা প্রকাশ করে না? তোমার সেবক বলিয়া পরিচয় দিতে এখন আমার লজ্জা করে। ঘটনাচক্র আমার কথাকে মিথ্যা করিল। কত সাধুর আকাঙ্ক্ষা তুমি অপূর্ণ রাখিয়াছ। আমাকে দিয়া বৃথাই গান গাওয়াইলে, আমার কাছে এখন ইহা ব্যর্থ প্রয়াস বলিয়া বোধ হইতেছে। যদি আমার সকল আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রহিল, তবে আর তোমার দাস বলিয়া পরিচয় দেওয়ার কি সার্থকতা? যদি তুমি আমার প্রেমের অপেক্ষা কর, তবে আর দেরী করিও না? যদি একদিন দেখা দিবেই তবে "আজই"। তোমার দর্শন পাইলেই আমি তোমার গান গাহিবার অধিকারী বলিয়া বিবেচনা করিব।

তুকা বলেন—শুনিয়াছি, তুমি খুব কাছে, তবু যে দেখা দাও না তাহাতেই মনে হয়, তুমি বড় নিষ্ঠুর। আমার বুকে থাকিয়াও আমার

প্রতি তোমার করুণার অভাব কেন? তুমি কি আমার অন্তরের বেদনা জান না? আমার মন চিরচঞ্চল, ইন্দ্রিয় দুর্দমনীয় দুরন্ত, আমার দোষের অবধি নাই। তবুও বলি যদি দেখা না দাও তোমাকে অভিশাপ দিব। তুমি কাহার জন্য লুকাইয়া রহিতেছ? শিশুকে কাঁদাইয়া সুখাদ্য লুকাইয়া রাখিয়া ফল কি? তুমি পালক হইয়াও অভিশাপের পাত্র হইবে। আমি তোমাকে অভিশাপ দিয়া আমারও সুনাম হারাইব। তুমি আর আমার সম্বন্ধে অমনোযোগী থাকিও না। আমি যদি তোমার নাম সাধনায় বিরত হই আর কে তোমার নাম আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিবে? লোকে তোমাকে গালি দিলে—তোমার নামের অমর্যাদা হইলে আমার দুর্বিসহ দুঃখ বোধ হইবে।

মরমী তুকার অন্তরে ভগবানের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে যে সন্দেহ জাগিয়াছিল তাহাতেই অকপট ভাবের প্রকাশ হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—আমি যদি জানিতাম মোটেই তোমাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, তবে আর তোমার সন্ধানে পাগল হইতাম না। আমি নিরাশ হইলাম, আমার সংসারের জীবন ব্যর্থ হইল, পরমার্থও লাভ হইল না। কেন আমি বৃথা তাঁহার সন্ধান করিলাম? আমার জীবন নিরর্থক ক্ষয়িত হইল। আমি এখন অস্ত্রাঘাতে প্রাণ দিব, না হয় অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিব—গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিব—তীব্র তাপ বা শীতল স্পর্শে দেহান্ত করিব, অথবা চিরকালকার জন্য মুখ বন্ধ করিব। হে ভগবন্, তুমি কি বল, আমি আমার দেহ ভস্মাচ্ছাদিত করিব এবং ভবঘুরের মত ঘুরিয়া বেড়াইব? দীর্ঘকাল উপবাস থাকিলেই কি তুমি দেখা দিবে? হে ভগবন্, বলিয়া দাও কোন্ উপায়ে তোমাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। আমার জন্য যদি তোমার ব্যাকুলতা নাই তবে আর বাঁচিয়া থাকিয়া লাভ কি? যদি আশা থাকিত—তুমি আসিবে, আমি জীবন ধারণ করিতাম। উঃ—কি

তীব্র নিষ্ঠুরতা! তুমি ভিন্ন আমাকে আর কে গ্রহণ করিবে? আমার আশা যে শতধা ছিন্ন হইল—তবে কি আমি আত্মহত্যা করিব?

তুকার কাতর নিবেদন বুঝি প্রিয়তমের সমীপে পৌছিয়াছিল! তাঁহার আর ভক্তের কাছে আসিতে বিলম্ব সহ্য হয় না। তুকার দুঃখ চরম ভূমিতে পৌছিয়াছে। ভগবান্ তাহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন। তুকার অন্তরের অন্ধকার-মেঘের আড়াল হইতে ভগবৎদর্শনের আলোক-ছটা প্রকাশিত হইতেছে। অন্ধকার রজনী শেষ হইয়াছে। ভগবৎদর্শনের আলোক-প্রভায় উদ্ভাসিত মুখমণ্ডল তুকারাম ভগবানের চরণে প্রণাম করিয়া বলেন—আমি তোমার সুন্দর বদন দেখিতেছি। এই দর্শন অনন্ত আনন্দের দুয়ার খুলিয়া দিয়াছে, আমার মন এই আনন্দে ডুবিয়া রহিল। তুকা ভগবানের চরণ ধরিয়া লুণ্ঠিত হইলেন। তুকা বলেন—আমি তাঁহাকে দেখি। আমার সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল, আনন্দে আমাকে উচ্চতর আনন্দের দিকে লইয়া চলিল। আমার সকল চেষ্টা আজ সফল হইল। আমি অভিলষিত প্রিয়তমকে পাইলাম, আমার হৃদয় তাঁহার পদস্পর্শে ধন্য হইল। আমার মনের দৌরাত্ম্য শান্ত হইল, আমার মৃত্যুর ভয় মুছিয়া গেল, বার্ধক্যের জড়তা ভুলিয়া গেলাম। আমার দেহ রূপান্তরিত হইয়া গেল। তাঁহার প্রভা পড়িয়া আমার দেহ উজ্জ্বল হইল। আমি এখন অসীম ঐশ্বর্যের অধিকারী হইলাম। নিরুপম রূপবানের চরম স্পর্শ পাইলাম। নিত্য সম্পদের অধিকারী হইলাম, জীবন মরণে এই সম্পদ্ আর ছাড়িব না। সকল প্রকার দুষ্ট দৃষ্টি হইতে আমি ইহাকে রক্ষা করিব।

তুকার বিবেচনায় ভগবানের দর্শনের সহায় রূপে সাধুগণের সঙ্গ সর্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন – আমার ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে, আমার উদ্বেগ দূর হইয়াছে—আমি সাধুর সঙ্গ লাভ করিয়াছি। সেই সাধুগণের কৃপায় আমি ভগবানকে খুঁজিয়া পাইয়াছি। এখন আমি তাহাকে আমার হৃদয়

সম্পুটে আবদ্ধ করিয়া রাখিব। লুকানো রত্ন ভক্তির মহিমায় প্রকাশিত হইয়াছে।

তিনি বলেন—হঠাৎ সেই আকাঙ্ক্ষিত রত্ন আমার হস্তগত হইল আমি উহা পাইবার জন্য যোগ্য সাধনা করি নাই। আমার ভাগ্য বলে আমি তাহাকে দর্শন করিলাম। আর কোনো ক্ষতির ভয়ে আমি কাতর নই। আমার দারিদ্র্য আর নাই। আমার উদ্বেগ দূর হইয়াছে। আমি মানব সমাজে মহাভাগ্যবান্।

তুকা কত সাধনার ভিতর দিয়া এই দর্শনের আনন্দ লাভ করিয়াছেন তাহা একবারে ভুলিয়া যাইতে পারেন না। তিনি বলেন—আমি সর্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিয়াছি। আমার সাধ্যানুসারে ভগবানের সেবা করিয়াছি—আমি কখন পিছনের দিকে তাকাই নাই। প্রতিটি মুহূর্তকে আমি কাজে লাগাইয়া কাল জয় করিয়াছি, বৃথাকল্পনায় আমি মনকে ভারাক্রান্ত করি নাই। পাপ কামনাকে আমার পথ অবরোধের সুযোগ দেওয়া হয় নাই। এখন ভাগ্য প্রসন্ন হইয়াছে। কাহারও ভয় আর নাই।

তৃপ্তির আনন্দে তুকার অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি বলেন—আমার বহু দোষ ছিল বলিয়াই প্রিয়তম প্রভু আমাকে গ্রহণ করিয়াছেন আমি নীচকুলে জন্মিয়াছি। আমার মোটে বুদ্ধি নাই। আমি বিশ্রী কদাকার নানারূপ কুঅভ্যাসে পরিপূর্ণ। এখন আমি বুঝিতে পারিলাম—ভগবান্ আমাদের যাহা করেন, শেষ পর্যন্ত মঙ্গলের জন্য। এখন আমার নাম করিলে তাঁহার আনন্দ হয়। তাঁহার ভক্তগণের তো কথাই নাই।

তিনি বলেন—হে ভগবন্? তোমাকে দেখিব বলিয়া কতদিন প্রতীক্ষা করিয়াছি। কাল আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। এখন আর বিচ্ছেদ থাকিবে না। এতদিন আমার অন্তরের বাসনা

আমাকে দুঃখ দিয়াছে। আনন্দের ছবির দিকে ছুটিয়াছি। এখন আমি পূর্ণ আনন্দে রহিলাম। আমি আত্মীয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করি নাই। তোমার পথ দেখিয়াই চলিয়াছি। তোমার সঙ্গ পাইব বলিয়া নির্জনে বাস করিয়াছি। হে প্রভু! একবার দাঁড়াও। আমাকে ফিরিয়া দেখ। তোমাকে দেখিলাম। সাধুগণ আমার কতই না উপকার করিয়াছেন। আজিকার লাভ অনির্বচনীয়, ইহার পবিত্রতা অপরিমেয়। আমার চতুর্দিকে আজ আনন্দ—মঙ্গল। যত দোষ সকলই আজ গুণরূপে পরিণত হইয়া গেল। আমার হাতে জ্ঞানের প্রদীপটি সকল অজ্ঞান অন্ধকার দূর করিল। যত দুঃখ ভোগ করিয়াছি সকলই সুখ-রূপে পরিণত হইল। জগতে আজ সর্বত্র মঙ্গল ছড়াইয়া গিয়াছে। তোমার নামে যে আমার মন বসিয়াছে ইহা নিঃসন্দেহ সৌভাগ্য। আমি কালের ক্রীড়নক হইব না। আমি এখন অধ্যাত্ম-অমৃত পান করিয়া জীবন ধারণ করিব। সাধুদের সঙ্গ করিব, তাহাতে তৃপ্তির পর তৃপ্তি - আনন্দের পর আনন্দ বৃদ্ধি পাইবে।

তুকারাম জীবনের কর্তব্য ভার হইতে ছুটি পাইয়াছেন। তিনি বলেন—আনন্দ প্রচুর! যাঁহারা আনন্দময়ের অনুসন্ধান করে তাহাদের আনন্দ !! আমরা নাচিব, গাহিব, হাততালি দিব ইহাতেই প্রিয়তমের প্রীতি-বিধান করিব। আমাদের প্রতিদিনই ছুটির দিন! সমর্থপ্রভু আমাদিগকে সকল দিকহইতে রক্ষা করিবেন। আমার ইন্দ্রিয়ব্যাপারসম্বন্ধে আমি একেবারে অমনোযোগী হইয়াছি। অধ্যাত্ম-আনন্দ আমার প্রতি ইন্দ্রিয়দ্বারে প্রবাহিত হইতেছে। আমার বাগ্‌ইন্দ্রিয় আমার শাসনের বাহিরে গিয়াছে। সে নির্বাধরূপে তোমার নাম উচ্চারণ করে। উত্তরোত্তর আমি অধিকতর আনন্দে প্রবেশ করিতেছি। কৃপণের ধনের মত আমার আনন্দ সঞ্চয় হইতেছে।

স্রোতস্বিনী যেমন সমুদ্রে যাইয়া বিশ্রাম লাভ করে, আমার সকল ইন্দ্রিয় বৃত্তি তোমাতেই যাইয়া মিলিত হইল। যাহারা আত্মজ্ঞানের বড়াই করে বা কৈবল্যের অভিমান করে, তাহারা আমার কাছে আসুক। আমি যখন তোমার মহিমা কীর্তন করি, আমার সকল অঙ্গ তোমাময় হইয়া যায়। তুমি আমার উত্তমর্ণ। তোমার কাছেই আমি ঋণী। যাহারা তীর্থভ্রমণে যান, তাহাদের কষ্টই লাভ হয়। যাহারা স্বর্গসুখ আকাঙ্ক্ষা করেন, আমার অবস্থা দেখিয়া তাহারা উহা হইতে বিরত হইবেন। আমি তাহাদের দর্শনের আনন্দ হইব।

পৃথিবীর অন্যান্য মরমী সাধকের ন্যায় তুকার জীবনেও এক অদ্ভুত অধ্যাত্ম আলোক পাত হইয়াছিল। অখণ্ড মধুরধ্বনি তাঁহার বাহির এবং অন্তর্জগৎ মুখরিত করিয়া দিয়াছিল। তিনি বলেন—সমগ্র জগত আলোকে ছাইয়া গিয়াছে। অন্ধকার আর কোথাও নাই। আমি কোথায় লুকাইব? সত্য তাহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছে। উহার বিস্তার অপরিসীম। তুকা বলেন—আমার প্রিয়তমের জ্যোতিঃ অগণিত চন্দ্রের জ্যোতিঃকে ম্লান করিয়া দেয়। তাঁহার আলোক-প্রভা বর্ণনার অতীত। তিনি বলেন—হে প্রভু, তোমার নাম স্নেহ ও করুণায় পরিপূর্ণ। তুমি আমাদের সকল বোঝা বহন কর। দিবা রাত্রির ভেদ আমার ঘুচিয়া গিয়াছে। সর্বকালে তোমার আলোকেই আমি জীবন ধারণ করিতেছি। সে যে কি আনন্দ তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব? তোমার নাম আমার কণ্ঠের ভূষণ হইয়াছে। তোমার শক্তিতে আমার কিছুই অভাব নাই। তুমি আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছ। আমার সন্দেহ ও প্রলাপ শেষ হইয়া গিয়াছে। তুমি এখন আমার সহিত এক শয্যায় শয়ন কর। তোমার মধুর সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে আমি ঘুমাইয়া পড়ি। অনন্ত রাগিণীর সহিত আমার রাগিণী মিশিয়া গিয়াছে। আমার সকল

মনোবৃত্তি তোমাতে লীন হইয়াছে। আমার প্রাণ অলৌকিক অভিমানে পূর্ণ হইয়াছে। আমি আমার দেহকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিতেছি না। আমার কণ্ঠে যেন আর কেহ কথা কহিতেছে। সুখ এবং দুঃখ সীমাহারা হইয়া গিয়াছে। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে আমি যে সুখের পরিমাণ বলিতে পারি না? আমার অন্তর বাহির তোমার অনুভব-সুখে পূর্ণ।

অন্যত্র সাধু তুকা বলেন—আমি তাঁহার হাতে পড়িয়াছি। তিনি আমাকে সকল সময় অনুসরণ করিতেছেন। বিনা বেতনে সেবকের মতো তিনি আমাকে খাটাইয়া লইতেছেন। খাটুনিতে আমার কি হয় না হয় তিনি তাহা দেখিতেছেন না। তিনি যে আমায় সর্বহারা করিলেন! তুকা বলেন—হে ভগবন্! তুমি আমাকে ভিতরে বাহিরে সবদিকে ঘিরিয়া রাখিয়াছ। তুমি যে আমার সমস্ত কর্ম শেষ করিয়া দিলে। আমায় মন পর্যন্ত হরণ করিয়া লইয়া গেলে। আমার আত্মবোধ পর্যন্ত লুপ্ত হইল। তুমি আমাকে সকল বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে। একবার তুমি আমার সম্মুখে দাঁড়াও। তোমার এই রূপ আমি ভালবাসি, নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লই। পথে আমি তোমারই সহায়তায় চলি। তুমিই যে আমার বোঝা বহন করিয়া লইয়া চল। আমার অর্থহীন বাক্যকে তুমিই সার্থক কর। তুমি আমার লজ্জা হরণ করিয়াছ, আমার বুকে অসীম সাহস দিয়াছ। তুমি আমার মাথায় হাত দিয়াছ। আমি তোমার পদে মন দিয়াছি। এইভাবে আমরা দু'জনে দেহে দেহে আত্মায় আত্মায় মিলিত হইয়া গিয়াছি। আমি তোমার সেবা করিব। তুমি আমাকে কৃপা করিবে।

তুকার জীবনে প্রিয়তমের সহিত যেজাতীয় একাত্মতা অনুভব হইয়াছিল মরমিয়ার ইতিহাসে উহা চিরন্তন বিস্ময়। তিনি বলেন—

আমি আমার মধ্য হইতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমার ঐ গর্ভে আমার জন্ম। আমি যে দিকে তাকাই আমাকেই দেখি। আমার প্রিয়তমই দাতা, প্রিয়তমই ভোক্তা, সমগ্র জগৎ তাঁহার মধুর সঙ্গীতে পরিপূর্ণ, তাহার গভীরতা আমাকে আত্মসাৎ করিয়া ফেলিয়াছে। সমুদ্র ও তরঙ্গ এক হইয়া গেল। নূতন কেহ আসেও না যায়ওনা। অত্যন্ত প্রলয়ের কাল আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সূর্যের উদয় ও অস্ত সকলই শেষ হইয়া গেল

ঈশ্বর অনুভবের আনন্দে তুকা উন্মত্তপ্রায়। তিনি বলেন—আমি যেখানে যাই, প্রিয়তম আমার অনুসরণ করেন। তিনি আমার হৃদয় মন হরণ করিয়াছেন। আমাকে দেখা দিয়া পাগল করিয়াছেন। মুখে আর কথা ফোটে না, কান আর কিছু শোনে না। দেহ আমার তাঁহার আকাঙ্ক্ষায় পূর্ণ হইল। নূতন সম্পদে পুরাণো সবকিছু ভুলাইয়া দিল। সংসারীর জীবন মৃত্যুপ্রায়। পূর্বের দৃষ্টি আমার আর নাই। আমার জীবন অলৌকিক আনন্দে পূর্ণ। আমার রসনা অভিনব মাধুর্য আস্বাদন করিয়াছে। ভগবানের নাম ভিন্ন আর কিছু আমার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয় না আমি একাকী থাকিবারও সুযোগ হারাইয়াছি। যেখানে যাই দেখি প্রিয়তম সঙ্গে আছেন। নিদ্রাভঙ্গে মানুষ যেমন দেখে তাহার ঘরেই সে আছে, তেমনি আমি তোমাকে সর্বদিকে দেখিতেছি। আমি তোমার কাছে এমন কি ঋণে আবদ্ধ যে, তুমি সকল সময় আমার সঙ্গী হইয়া আছ? তুমি যে আমার হইয়া গিয়াছ। আমি যাহা বলি, যাহা প্রার্থনা করি তাহাই যে তুমি পূর্ণ কর। যে দিন আমি সংসারীর জীবন ত্যাগ করিলাম, তুমি যে আমার সঙ্গী হইলে! আমি আমার সকল ভার তোমাকে দিলাম। ক্ষুধা পাইলে খাদ্য দিবে, শীতবোধ হইলে বস্ত্র দিবে আমার মন যাহা চায়, তাহাই যোগাইবে। তোমার সুদর্শন-চক্র বিঘ্ন দূর করিয়া সকল সময় আমাদিগকে রক্ষা করিবে। আমি মুক্তির জন্য

আকাঙ্ক্ষা করি না। যেমন রাখিবে তেমন থাকিব। আমি কিছু না দেখিলেও সকল দেখা হইয়া গিয়াছে। 'আমি ও আমার' ভাব দূর হইয়া গিয়াছে। কিছু লওয়া না হইলেও সকলই গ্রহণ করা হইয়াছে। ভোজন না করিয়াও পূর্ণ হইয়াছি। কথা না বলিলেও সবকিছু প্রকাশিত হইয়াছে। যাহা কিছু লুকানো ছিল প্রকাশ হইল। কিছু না শুনিলেও সকল কথাই আমার মনে জাগিতেছে। আমার জন্য আর কোন কর্ম অবশিষ্ট নাই। আমি এখন চুপ্ করিয়া বসিয়া থাকিব। আমি সকল কাজের বাহির হইয়াছি। তুমি ছাড়া আর আমার সকল সম্বন্ধ ছুটিয়া গিয়াছে। নাম রূপের অতীত—কর্ম ও অকর্মের বাহিরে—আমার অস্তিত্ব জীবন-মরণের সীমা অতিক্রম করিয়াছে।

মরমিয়া তুকার সাধনায় সমগ্র বিশ্ব ঈশ্বরময় হইয়া গিয়াছে। তিনি বলেন—সকলেই জানে আমি তোমার প্রিয়। আমি কোন্ উপচারে তোমাকে পূজা করিব? স্নানের জল দিব?—সেই জল যে তুমি! চন্দন গন্ধ বিলেপন দিব?—সেই চন্দন গন্ধ যে তুমি! ফুলের সৌরভে যে তোমারই অস্তিত্ব। তোমাকে কোন্ আসনে বসাইব? সকল আসনের আশ্রয় যে তুমি। যে নৈবেদ্য তোমাকে উপহার দিব উহার মাধুর্য যে তুমি। সঙ্গীতের স্বরে তুমি। করতালের তালে তালে তুমি। তোমাকে ছাড়া একটু স্থানও দেখি না যেখানে দাঁড়াইয়া নৃত্য করিব। হে রাম! হে কৃষ্ণ! হে হরি! সর্বত্রই যে আমি তোমার পাদপদ্ম দর্শন করিতেছি। আমি যখন ভ্রমণ করি তখন তোমার প্রদক্ষিণ হয়। শয়নে আমি তোমাকে অষ্টাঙ্গ প্রণাম করি। সকল নদী, সকল কূপ আমি তুমিময় দেখিতেছি। গৃহ এবং অট্টালিকা সকলই তোমার মন্দির। যে শব্দ শুনি উহাতে তোমারই নাম।

কাহার ঘরে ভগবান্ আসিয়াছেন তাহা কেমন করিয়া বুঝিব? দেখ

কে লোকসমাজের সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছে? ভগবানকে ছাড়া আর কোন আত্মীয় কাহার অন্তর্হিত? এরূপ ব্যক্তির উপস্থিতিতে ভক্তের অন্তরের কামনা দূর হইয়া যায়। সাধু কখন মিথ্যা বলেন না। কুসঙ্গ হইতে তিনি ভয়ে দূরে সরিয়া থাকেন। আলো হাতে থাকিলে যেরূপ অন্ধকারকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না সেইরূপ ভগবানকে হৃদয়ে ধরিলে মায়া ও মৃত্যুভয়কে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভক্তের জন্ম ও মৃত্যুর ভার সকলই তাঁহার প্রিয়তমের উপর ন্যস্ত। ভক্তের সমীপে রাত্রির অন্ধকার—নিদ্রার অলসতা দূর হইয়া যায়। তুকা বলেন—নিদ্রা ও অজ্ঞান অন্ধকার আমাকে ত্যাগ করিয়াছে—আমি নিশিদিন তাঁহারই আলোকে রহিয়াছি।

সাধনার জীবনে সিদ্ধির আনন্দ কেমন করিয়া জন্মমৃত্যুর ভ্রম ঘুচাইয়া দেয় এবং অনন্ত জীবন ধারার সহিত সরাসরি পরিচয় করাইয়া দেয় সে সম্বন্ধে তুকা বলেন—আমি মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করিলাম। আমার ক্ষুদ্র অহমিকা ভাঙ্গিয়া গেল। আমি অনন্ত আনন্দে মিলিত হইলাম। আমার প্রভু তাঁহার সমীপে আমাকে এরূপ স্থান করিয়া দিলেন যে, আমি এখন মুক্তমনে তাঁহার মহিমা কীর্তন করিতে পারি। প্রিয়তমের সহিত সম্বন্ধ নির্ধারণ করিতে বসিয়া তুকা বলেন—আমি তাহার সন্তান, তাহার সকল সম্পদের অধিকারী। তাহার ভাণ্ডারের চাবি আমার হাতে। ভগবানের কৃপামৃত বিতরণ করিবার জন্য তিনি আমাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন। অধ্যাত্মজীবনে আমি সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছি। পাণ্ডুরঙ্গ আমার পিতা, রুক্মিণী আমার মাতা। অন্যত্র তিনি বলেন—আমার মুখে পাণ্ডুরঙ্গ কথা বলেন। আমি কখন কি বলি জানি না। আমার মত অজ্ঞানী কেমন করিয়া বেদ অগম্য বিষয় প্রকাশ করিবে? গুরুকৃপায় ভগবান্ আমার সকল বোঝা বহন করিতেছেন।

সাধু তুকা নিজের জীবনে অপূর্ব অমৃতের স্বাদ পাইয়া ধন্য হইয়াছেন। এখন উহা কেমন করিয়া সাধারণ লোকের মধ্যে ছড়াইয়া দিবেন, ইহাই হইল তাহার জীবনের মহৎ ব্রত। তিনি বলেন – একবার নয়, যুগে যুগে ভগবান্ যতবার লীলা করেন আমি (ভক্ত) তাহার সঙ্গে আছি। আমার কর্তব্য তাহার মহিমা কীর্তন করিয়া সাধুগণকে মিলিত করানো। প্রবঞ্চক কপট সাধু আমার কাছেও আসিবে না। ভগবান্ আমাকে তাহার সঙ্গী করিয়া লইয়াছেন। তিনি যখন লঙ্কা জয় করেন, যখন ব্রজে গো-পালন করেন, আমাকে তাহার সঙ্গী করিয়াছিলেন। শুকদেব যখন সমাধির জন্য গমন করেন—ব্যাসদেব যখন তাহাকে জনকের নিকট প্রেরণ করেন, তখনও আমি ছিলাম। আমি সংসার সমুদ্র পারে যাইবার জন্য কোমর বাঁধিয়াছি। এস, কে যাবে? ছোট বড়, স্ত্রী, পুরুষ, যে কেহ ইচ্ছা কর যাইতে পার; কোন ভয় নাই। আমি অনায়াসে তোমাদিগকে পারে লইয়া যাইব। তোমরা শ্রীভগবানের নাম উচ্চারণ কর। বিট্‌ঠলের নাম উচ্চারণ কর, তোমাদের সকল পাপ দূর হইয়া যাইবে। আমরা সাধুদের পথ পরিষ্কার করিয়া দিব। সাধারণ লোক না বুঝিয়া বনে যায়, নির্জনে বাস করে। শাস্ত্রের প্রধান তাৎপর্য চাপা পড়িয়াছে। শুষ্ক শাস্ত্র-জ্ঞান আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে। সাধনার পথে ইন্দ্রিয় বাধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, আমরা ভক্তির ঘণ্টা বাজাইব। ইহাতে মৃত্যুরও ভয় হইবে। ভগবানের নামকীর্তন আমাদের পূর্ণ আনন্দ দান করিবে।

সাধনার জীবন সম্বন্ধে তুকা যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, উহা বড়ই প্রয়োজনীয়। ইন্দ্রিয়-সংযম, সত্যভাষণ, সঙ্গত্যাগ সম্বন্ধে তিনি বহুবার উপদেশ করিয়াছেন। যোগী সাধক আহার বিহার সম্বন্ধে সতর্কদৃষ্টি না রাখিলে কখনও ভগবদনুভূতির রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

সংসার বাসনা ও ঈশ্বরানুরাগ কিরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহা তিনি স্পষ্ট কথায় ব্যক্ত করিয়াছেন। দৈহিক আরাম এবং লৌকিক সম্মান উভয়ই সাধনার কণ্টক। মানব দেহ কাহারও দৃষ্টিতে অত্যন্ত ঘৃণিত, আবার শুদ্ধ দৃষ্টিকোণে ইহাই সকল সাধনার দ্বার। তুকা বলেন—দেহকে কেহ বলে ভাল, কেহ বলে মন্দ, আমি বলি—এই দেহভাব পরিত্যাগ করিয়া আত্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে ঈশ্বরানুরাগ সিদ্ধ হয়।

ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে গুরুবাদ একটি বিশেষ বিবেচনার বিষয়। প্রাচীন মহাপুরুষগণ বিভিন্নভাবে গুরু সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়াছেন। তুকার বিবেচনা এই বিষয়ে এক অভিনব ধারা অবলম্বন করিয়াছে। তিনি বলেন—যে ব্যক্তি শিষ্যকেও দেবতা বলিয়া জানেন, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি। যিনি শিষ্যের নিকট সেবা গ্রহণ করেন না, তিনিই শিক্ষক হইতে পারেন। তাঁহার উপদেশ ফলবান্ হয়। এইরূপ গুরু দেহভাব সম্বন্ধে উদাসীন বলিয়া পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানের আধার। তুকা বলেন -- আমি সত্য বলিতেছি। ইহাতে কেহ ক্রুদ্ধ হইলে আমি ভয় করি না। "শিষ্যাচী জো নেঘে সেবা। মানী দেবা সারিখে ত্যাচা ফলে উপদেশ।" কেবল দেহ পোষণ করিয়া স্থূল করিলেই গুরু হওয়া যায় না। সাধুতার অনুশীলন না করিলে শিষ্য করিবার যোগ্যতা হয় না। যে নিজেই সাঁতার জানে না, সে যদি অপরকে ধরিতে বলে—তাহা হইলে উভয়েই যে জলে ডুবিয়া যায়। একজন ক্লান্ত মানুষ অপর ক্লান্তের আশ্রয় লইলে উভয়েই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যাদুকরগুরু শিষ্যকে কোন একবিন্দুতে অপলক নেত্রে চাহিয়া থাকিতে বলে এবং সেই বিন্দুতে আলোক দেখিবার উপদেশ দেয়। শিষ্যকে এইভাবে সমাধির আনন্দ অনুভব করায় এবং প্রবঞ্চনা করে। মিথ্যা উপদেশ দিয়া জীবিকা অর্জন করে এবং শিষ্যকে নিজের নাম জপ করিতে বলে। শুদ্ধ পরমার্থকে বিসর্জন দিয়া

গুরুগিরির লোভে ভোগে প্রবৃত্ত হয়। শাস্ত্রকে লঙ্ঘন করে ও বেদজ্ঞান অপহরণ করে, সাধনভজন বিনষ্ট করে, বৈরাগ্য লুপ্ত করে। হরিভজনের বিঘ্ন জন্মায়।

"কায়া বাচা মনেঁ সোড়বী সঙ্কল্প। গুরু গুরু জপ প্রতিপাদী।
শুদ্ধ পরমার্থ বুড়বিলা তেণেঁ। গুরুত্ব ভূষণেঁ ভগভোগী॥
…………বৈরাগ্যা চা লোপ হরিভজনীঁ বিক্ষেপ॥"

আদর্শ গুরু কেবল নিজেই আদর্শ-জীবন যাপন করিবেন তাহা নহে, তাঁহার উপদেশ পাইয়া শিষ্যগণও যাহাতে পবিত্র জীবন যাপন করিতে প্রবৃত্ত হয়, সেই নিমিত্ত সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন। অধিকার না হইলে বলপূর্বক কাহাকেও উপদেশ দিবেন না।

"নসতাঁ অধিকার। উপদেশাসী বলাৎকার।

সাধনার উপায় স্বরূপে ভগবানের মহিমা বহুভাবেই কীর্তিত হইয়াছে। তুকা বলেন – নিশ্চিন্ত হইয়া নির্জনে শুদ্ধান্তঃকরণে একাকী বসিয়া রাম, কৃষ্ণ, হরি, মুকুন্দ, মুরারী বারংবার উচ্চারণ কর। ভগবান্ অবশ্যই তোমার হৃদয়ে আসিয়া অবস্থান করিবেন। নাম-কীর্তন সাধনায় জন্মান্তরের দোষ দূর হইয়া যায়। নাম সাধককে দূর বনে যাইতে হয় না। ভগবানই তাঁহার সমীপে আগমন করেন। নিজের প্রিয়নাম গ্রহণ সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন, এই সিদ্ধান্ত বেদপুরাণ এবং সকল শাস্ত্র বলিয়াছেন।

"বেদ অনন্ত বোলিলা। অর্থ ইতুলাচি শোধিলা।
বিঠোবাসী শরণ জাবেঁ। নিজনিষ্ঠ নাম গাবেঁ॥
সকল শাস্ত্রাঁচা বিচার। অন্তী ইতুলাচি নির্ধার।
অঠরা পুরাণী সিদ্ধান্ত। তুকা মহ্ণে হাচি হেত॥"

আমার যত বিপদ হউক না কেন আমি নাম কীর্তন ছাড়িব না। হরিনাম চিন্তা দ্বারা আমার সমস্ত কর্তব্য সাধিত হইবে। নাম উচ্চারণে

আমার শরীর শীতল, মন শান্ত, ইন্দ্রিয় সংযত, রসনায় অমৃতের ধারা প্রবাহিত, অন্তর ভাবপূর্ণ, প্রেমরসে অঙ্গ-কান্তি উজ্জ্বল হইবে ও ত্রিবিধ ভাব দূর হইবে। নামের মহিমায় আমি দেহের ভাব অতিক্রম করিব। জীবন্মুক্তির আনন্দ নাম জপকারীই লাভ করে। অপর কোনও সাধন নামের সহিত তুলনার যোগ্য নয়। নাম স্মরণে অলভ্য লাভ হয়। যে প্রেমের সহিত নাম উচ্চারণ করে তাহার কোটীকুল উদ্ধার হয়।

"তুকা মহ্ণে কোটিকুলে তী পুনীত। ভাবেঁ গাতাঁ গীত বিঠোবাচে।"

নামের মধুরতা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই মধু রসনায় আস্বাদিত হইলে আর সকল বস্তুই তিক্ত বোধ হয়। ইহার মাধুরী প্রতিক্ষণে অধিকতর হয়। অপর রস মৃত্যুকে ডাকিয়া আনে। নামরসে সংসারভয় দূর হয়। তুকা বলেন—বিট্‌ঠল আমার চিরকালের আহার্য হইয়াছেন

"তুকা মহ্ণে আহার ঝালা। হা বিটঠল আমহাসীঁ ॥"

কমল তাহার সৌরভ কি জানে? ভ্রমরই উহা আস্বাদন করে। গাভী তৃণ ভোজন করে। তাহার কচি বাছুর দুগ্ধের মাধুর্য অনুভব করে। ঝিনুক তাহার বুকের মুক্তার মূল্য জানে না। বিলাসিনী রমণী উহা ধারণ করিয়া আনন্দ বোধ করে। সেইরূপ ভগবানও তাহার নামের মাধুরী জানেন না, ভক্তই কেবল উহা জানে!

"তৈসেঁ, তুজ ঠাবেঁ নাহী তুঝ নাম। আমহীচতে প্রেমসুখ জাণোঁ।"

# একা

ছেলেবেলায় যাহারা পিতামাতার স্নেহে বঞ্চিত তাহারা সত্যই বড় দুঃখী। গ্রহাচার্য বলেন,—মূলা নক্ষত্রে পুত্রের জন্ম হইলে পিতামাতার মৃত্যু হয়। আর কাহারও না হইলেও একনাথের বেলায় তাহা সত্য হইল। সূর্যনারায়ণ ঋগ্‌বেদী ব্রাহ্মণ। তাহার পুত্র একনাথ। পুত্র-জন্মের পর অতি অল্পদিনের মধ্যে সূর্যনারায়ণ ইহলোক ত্যাগ করিলেন। একনাথের মাতা পতির শোকে তাহার অনুগমন করিল। একনাথের পিতামহ বৃদ্ধ চক্রপাণি এখন তাহার একমাত্র আশ্রয়। চক্রপাণি ভিন্ন এ সংসারে একার আর কেহ নাই। পিতামাতার স্নেহ পায় নাই বলিয়া একা ছেলেবেলা হইতেই অস্বাভাবিক শান্ত, স্থির মতি, প্রখর বুদ্ধি, শ্রদ্ধালু এবং নম্র। খুব অল্প বয়সে উপনয়ন হইয়া গেল। সে বেদপাঠের জন্য গুরুগৃহে গেল। বেদপাঠ শেষ করিয়া সে পুরাণ, স্মৃতি, পড়িতে লাগিল। অল্প সময়ের মধ্যে সে বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পণ্ডিতগণের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে। তাহার প্রাণে বিমল ভাব-ধারা। শাস্ত্র জ্ঞানে অপরিতৃপ্ত একা এখন অনুভব রাজ্যে প্রবেশের জন্য উৎকণ্ঠিত।

অন্ধকার রাত্রি। ভয়ঙ্কর বন। কোথাও কেহ নাই। সমস্ত প্রাণী নিদ্রিত। একটু শব্দ নাই। পথ দেখা যায় না। একা অন্ধকারে একাকী চলিয়াছে। গভীর বনে নির্জন শিবালয়। নির্ভীক যুবক একা মন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবতার সম্মুখে বসিয়াছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সে ধ্যানমগ্ন হইল। প্রাণের টানে সে প্রতিদিন ছুটিয়া আসে জন-পরিত্যক্ত নিস্তব্ধ এই ভগ্ন-শিবালয়ে। এখানে তাহার প্রাণের কবাট খুলিয়া যায়। সে নিজের মনে কত কথা বলিতে থাকে। কখনও সে কাঁদিয়া আকুল হয়। কখনও সে হাসিতে হাসিতে লুটাইয়া পড়ে। কখনও সে যোগীর মত আসন করিয়া নিস্পন্দ শরীরে বসিয়া থাকে। কখনও সে অপলক নেত্রে চাহিয়া যেন কাহার দর্শনের জন্য অপেক্ষা

করে; অশ্রুধারায় বক্ষ প্লাবিত হইয়া যায়। সে সাধনার কোন নির্দিষ্ট ধারার সন্ধান পাইতেছে না। তাহার মনে হইতেছে—উপযুক্ত গুরু ভিন্ন কিছুই হইবার নয়। সদ্‌গুরু কৃপা ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। এখন সে সদ্‌গুরু কোথায় পায়? তাহার অন্তর চঞ্চল হইয়াছে। হঠাৎ রাত্রি শেষে শিবালয়ের মধ্যে একটি শব্দ শুনা গেল। একনাথ চমকিত হইয়া চাহিল · কাহাকেও দেখা গেল না। যে কথা শুনিতে পাওয়া গেল উহাতে বুঝা গেল—"দেবগড়ে যাও। সেখানে জনার্দন পন্ত আছেন। তিনিই তোমাকে কৃতার্থ করিবেন। তিনিই তোমার গুরু।"

একনাথের গুরু জনার্দন স্বামী ১৫০৪ খৃষ্টাব্দে চালিশগাও নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন; তিনি দেশস্থ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি অপবিত্র জীবন যাপন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণানদীর তীরবর্তী অঙ্কলকোপ গ্রামে এক ডুমুর গাছের তলায় নৃসিংহ সরস্বতী নামে এক সাধুর নিকট তিনি দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তাহার জীবনের পটপরিবর্তন হইয়া গেল। সাঁতারা জেলায় এখনও এই স্থানটি দর্শনীয় তীর্থরূপে বর্তমান। নৃসিংহবাড়ী ও গণ্‌গাপুর নামে আরও দুইটি স্থান নৃসিংহসরস্বতীর পবিত্রস্মৃতি বহন করিতেছে।

জনার্দন দীক্ষার পরেও ব্যবহারিক জীবনের কর্তব্য পালনে পরান্মুখ হন নাই। মুসলমান নৃপতির অধীনে তিনি কিল্লাদারের পদে কার্য করিতেন। দেবগড়ের সমস্ত কর্তৃত্ব তাহার হাতেই সমর্পিত ছিল। তিনি রাজনীতি কুশল ছিলেন। তাহার জীবনের আদর্শ—ব্যবহারিক ও পারমার্থিক জীবনের সমন্বয় সাধন।

তিনি তাহার অভঙ্গে অন্তরের মিনতি জানাইয়া তাহার গুরুদেবের সমীপে প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—আমি পাপ জীবন ভার বহন করিয়াছি, আমার প্রীতি কেবল পত্নীতে নিবদ্ধ ছিল, আর

কাহাকেও তাহা হইতে অধিক জানিতাম না। আমি সাধুদের নিন্দা করিয়াছি। কর্তব্য বিমুখ হইয়া আনন্দের সহিত কুকর্মে নিরত হইয়াছি। বহু প্রকারে আঘাত খাইয়া পাপের খনি আমি গুরুর সমীপে শরণ গ্রহণ করিয়াছি। গুরু নৃসিংহদেব নিশ্চয় আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করিবেন। হে গুরুদেব, তুমি যদি আমার দুঃখভার গ্রহণ না কর, আমি আর কোথায় যাইব, কাহার শরণ লইব? আমার পাপের গুরুত্ব বুঝিয়া তুমি কি লুকাইয়া থাকিতে চাও, ইহা কি তোমার নিকট গুরুভার হইবে, অথবা তুমি কি আমার সম্বন্ধে নিদ্রিত? তোমার স্তব্ধতা যে আমাকে দুঃখপূর্ণ করিয়া তুলিল, আমার প্রতি কারুণ্য প্রকাশ কর। আমি আধ্যাত্মিক আলোক কাহাকে বলে জানিতাম না। ছুটিয়া বেড়াইয়াছি, বহু দুঃখ সহিয়াছি, তুমি পতিতের বন্ধু বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাই তো আমি তোমার সমীপে আসিয়া শরণ লইলাম। আমি অন্তরের আলোক-পথের পথিক। এই পথে চলিবার সময় মিথ্যা জগতের প্রলোভন আমার সমীপে তুচ্ছ। আমি পণ্ডরপুরের সরল পথ ধরিয়া চলিয়াছি। অপর কাহারও কথা অন্তরে যেন আমার না আসে, আমি যেন সাধুগণের চরণ তলায় পড়িয়া থাকি। দ্বারে সমাগত জনকে যেন আমি একমুষ্টি খাইতে দিতে পারি, অতিথি-নারায়ণ যেন আমার গৃহ হইতে ফিরিয়া না যায়। তীর্থে যাইয়া কি ফল? মন যদি পবিত্র হয়, ঘরেই তাঁহাকে পাওয়া যায়। ভক্ত যেখানে থাকে সেখানেই তাঁহাকে দেখে।

তিনি আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা বর্ণনা করিয়া বলেন—একটি চাকার ভিতরে আর একটি পর পর এই প্রকার বহু চক্র ঘূর্ণিত হইতেছে, কত মণিমুক্তা অতৈল দীপিকার ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিতেছে, কখনও সর্পের আকৃতি কখনও মণিমুক্তার দীপ্তি, শুভ্রফেননিভ শোভা, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, জোনাকীর আলো, নক্ষত্রের ঝিকিমিকি, রবির

কিরণ, একটির পর একটি আসিয়া চক্ষু ধাঁধাইয়া দেয়। জীবহংস একই ভাবে সমাহিত চিত্তে ধ্যান করে। এই ভাবে পরমাত্মার নিত্য স্বরূপ প্রকাশিত হয়, ইনিই সর্বেশ্বর ভগবান্ এবং সকলের প্রিয়।

তিনি ছিলেন একজন দত্তাত্রেয়-উপাসক। যোগ সাধকগণের নিকট দত্তাত্রেয় বিশেষ পরিচিত। ব্রহ্মার নির্দেশে অত্রিমুনি কপিলদেবের ভগ্নী অনসূয়ার পাণি গ্রহণ করেন। পতিব্রতা নারীর আদর্শ এই অনসূয়া। বনবাস কালে রাম অত্রিমুনির আশ্রমে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সেই সময় অনুসূয়া সীতাকে পাতিব্রত্য ধর্ম শিক্ষা দেন। সনৎসুজাতের উপদেশ অনুসারে সস্ত্রীক অত্রি কঠোর তপস্যা করিয়াছেন। একদিন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, মিলিত ভাবে আসিয়াছেন। অত্রি ও অনুসূয়া ধ্যান সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। দেবতার কোমল স্পর্শে বহির্জগতের চেতনা ফিরিয়া আসিল। অত্রি প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া দেবতার স্তুতি করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন—আমার মত সংসারীর সমীপে আপনাদের আবির্ভাব আপনাদের কৃপা ভিন্ন কোনও সাধনার বলে হইতে পারে না। কৃতার্থ হইলাম আদেশ করুন। দেবতাগণ বলিলেন – ঋষিপ্রবর সস্ত্রীক তোমাদের পবিত্র সাধনায় আমরা বড় আনন্দ পাইয়াছি। এরূপ আদর্শ দাম্পত্য প্রেমে আমাদের বড় সন্তোষ হয়। আমরা তোমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিব। তোমাদের মত ধর্মপ্রাণ পিতা ও মাতার সমীপে পুত্র হইয়া আমাদের সুখ হইবে। জীব জগতের মঙ্গল হইবে।

কিছুদিন পর অনুসূয়ার গৃহে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্কর তিন বালকরূপে প্রকাশিত হইলেন। ব্রহ্মার অংশে চন্দ্র, শঙ্করের অংশে দুর্বাসা এবং বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয়।

উপনয়নের পর দত্তাত্রেয় ঋভুর নিকট সাধনা ও মন্ত্রের রহস্য শিক্ষা করেন। তিনি ছিলেন সমবয়সীদের অত্যন্ত প্রিয় যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ।

একদিন তিনি একটি সরোবরে প্রবেশ করিয়া তিন দিন পর্যন্ত সমাধিমগ্ন হইয়া রহিলেন। বালকগণ সরোবরের পার্শ্বে তাহার উত্থানের অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। সমাধি ভঙ্গের পর তিনি দেখিলেন, বালকগণের প্রীতি অসামান্য। তিনি তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গভীর অরণ্যে তপস্যা করিতে লাগিলেন। অলর্ক, প্রহ্লাদ এবং যদুমহারাজকে ইনি সাধনার সম্বন্ধে জ্ঞান উপদেশ করেন।

জনার্দনের একাগ্র সাধনায় ভগবান্ দত্তাত্রেয় তাহাকে দর্শন দিলেন। সাধুর নবজীবন আরম্ভ হইল। তিনি গুরুবার দত্তাত্রেয়ের দিবস বলিয়া দেবগড়ের কাছারী বন্ধ দেন। তাহার গুণমুগ্ধ হিন্দুমুসলমান সকলেই উহা মানিয়া লয়। তিনি প্রতিদিন নির্জনে সাধন ভজনে অনেক সময় অতিবাহিত করেন। তাহার সাধুস্বভাবের পরিচয় পাইয়া বহুলোক তাহার অনুগত হইল।

দৈববাণীর পর একনাথ দেবগড়ে আসিলেন। পথে দুইদিন খাওয়া হয় নাই। অবিশ্রান্ত পথ হাটিয়া তৃতীয় দিনে সদ্গুরুর অন্বেষণ-কাতর একনাথ জনার্দনের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন। যেন কতদিনের সুপরিচিত বন্ধুর সহিত বন্ধুর মিলন হইল! অজানিত ভাবে এক জাতীয় দুইটি রত্ন ভিন্ন স্থানে পড়িয়াছিল, গুরুশিষ্য-সম্বন্ধ-সূত্রে তাহাদের গ্রন্থন হইল! এক জনের জীবন যেন অপরের মধ্যদিয়াই পূর্ণতা লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। একজন যেন প্রস্ফুটিত হইবার সবখানি যোগ্যতা লইয়াও দখিন হাওয়ার মত আর একজনের কৃপা পাইবার অপেক্ষা করিতেছিল। গন্ধ যেন গন্ধবহ বাতাসের জন্য ফুলের বুকের মধ্যেই চুপ করিয়া বসিয়াছিল। আলোক ভিন্ন রূপের বৈচিত্র্য দেখিবে কেমন করিয়া? সদ্গুরু ভিন্ন শিষ্যের অন্তর্নিহিত বিচিত্র শক্তির বিকাশ করিবে কে? একা গুরুদর্শন করিলেন। তাহার প্রতি গুরুদেবের

কৃপা-কিরণ পড়িল। প্রায় ছয় বৎসর পর্যন্ত গুরুসমীপে অবস্থান করিয়া তিনি সেবা করিতে লাগিলেন। গুরুসেবা ভজনের মূল।

জনার্দনের সেবক আরও আছে। একনাথের মত কেহ নয়। গুরু শয্যা ত্যাগ করিবার পূর্বেই নবীনশিষ্য সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছেন। গুরুর নিদ্রা না আসা পর্যন্ত শিষ্যের নিদ্রা নাই। স্নানের সময় জল লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন একনাথ। কাপড় লইয়া অপেক্ষা করেন একনাথ। পূজার যোগাড় করিয়া রাখেন একনাথ। ভোজনের সময় পরিবেশন করেন একনাথ। তাম্বুল অর্পণে একনাথ। শয়নে পদসেবক একনাথ। তাহাকে ভিন্ন জনার্দনের একপদ অগ্রসর হইবার উপায় নাই। ছায়ার মত তিনি গুরুদেবের অনুসরণ করেন। গুরুর সন্তোষের নিমিত্ত নিজেব জীবনটিকে উৎসর্গ করিয়াছেন। এ জীবনে যেন তাহার সমস্ত কর্তব্যের পর্যবসান হইয়াছে এক গুরু-সেবায়। জনার্দন এরূপ বিশ্বস্ত শিষ্যের উপর তাহার অর্থসংক্রান্ত সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। একনাথ অবসর সময়ে গুরুসেবার অঙ্গরূপে টাকা পয়সার হিসাব করিতে বসেন। তাহার মধ্যেও তাঁহার অসাধারণ ধৈর্য।

ভোরের আলো ধরণীকে স্পর্শ করিয়াছে। আশ্রম-বৃক্ষে পক্ষীকুলের কাকলি শুনা যাইতেছে। জনার্দন এইমাত্র জাগ্রত হইয়াছেন। পার্শ্বের কুটিরে একনাথ শয়ন করেন। তাহার ঘরে কে যেন হাততালি দিয়াছে। জনার্দন শয্যা ত্যাগকরিয়া জানালা দিয়া উঁকি দিলেন। দেখিলেন—কতগুলি হিসাবের খাতাপত্র ছড়ানো রহিয়াছে। মধ্যস্থলে উপবিষ্ট তাহার একনিষ্ঠ সেবক একনাথ। হাততালি সে—ই দিয়াছে। গম্ভীর স্বরে ডাকিলেন—"একা" নবীন শিষ্য গুরুর কণ্ঠস্বরে চমকিত হইলেন। মুখ তুলিয়া দেখেন—জানালার ধারে দাঁড়াইয়া গুরুদেব।

গুরু বলেন—একা, হঠাৎ তুমি হাততালি দিলে কেন?

শিষ্য বলিলেন—গুরুদেব, একটি পাই হিসাব মিলিতেছিল না। সারা-রাত্রি সেই হিসাব মিলাইবার জন্য জাগিয়াছি। এতক্ষণে সেই হিসাব মিলিয়া গিয়াছে। বড় আনন্দ হইয়াছে।

গুরু বলিলেন—একপাইএর ভুল শোধন করিয়া তোমার এত আনন্দ? কত জীবন ধরিয়া যে ভুল করা হইয়াছে, তাহার শোধন করিতে পারিলে কি বিরাট্ আনন্দ তাহা তুমি অনুমান করিতে পার কি? যে ভাবে সারারাত্রি জাগরণে আকুল উৎকণ্ঠায় একপাইএর ভুল শোধন হইয়াছে এই জাতীয় উৎকণ্ঠা যদি তোমার ভগবানের চিন্তায় হইত, ভগবান্ কি আর দূরে থাকিতে পারিতেন?

একনাথ বুঝিলেন অধিকতর উৎকণ্ঠার সহিত ভগবানের আরাধনা করিবার জন্য গুরুদেবের এই উপদেশ। একা গুরুচরণে প্রণাম করিয়া বলিলেন—আপনার আশীর্ব্বাদে অবশ্য আমি ভগবানের দর্শন করিব। তিনি খুব আগ্রহে উপাসনা করিতে লাগিলেন। কিছুদিন অতিবাহিত হইতে না হইতে তিনি মূল গুরুমূর্তি দত্তাত্রেয়ের দর্শন করিলেন। এখন একনাথের মনঃসংযমের এরূপ বল যে, যখন তখন তিনি তাহার উপাস্য দত্তাত্রেয়কে দর্শন করেন।

শিষ্যের জীবনে এক অভিনব পরিবর্তন আসিয়াছে। গুরু এখন তাহাকে শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার জন্য নবভাবে দীক্ষিত করিয়া বলিলেন—বৎস, ভগবান দত্তাত্রেয়রূপে তোমার জ্ঞানের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। এইবার তুমি ভক্তির সেবাময় জীবন যাপন করিয়া ধন্য হও। শূলভঞ্জন পর্বতে অতি মনোরম আশ্রম আছে। তুমি সেখানে যাও। তুমি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন করিবে।

একা গুরুদেবের আজ্ঞায় ভজনে প্রবৃত্ত। শ্রীকৃষ্ণরূপ চিন্তায় তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার গুণে মুগ্ধসাধক এক নূতন জীবনের

আস্বাদ পাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-পুলকে উন্মত্তপ্রায় একা গুরুর সমীপে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তিনি বলেন—ধন্য ধন্য গুরুদেব, আপনার কৃপার অসীম বল। আপনার কৃপায় আমার জীবন সফল হইয়াছে। আমি সুন্দর শ্যামল শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে কৃতার্থ হইয়াছি। আমার ভুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এখন আমি আপনার কি সেবা করিব আজ্ঞা করুন।

জনার্দন ভাবিলেন—একনাথের প্রতি ভগবানের পূর্ণ কৃপা। কিছুদিন মহতের সঙ্গে থাকিয়া এই কৃপার মাধুরী সে আস্বাদন করুক। সাধুর সমীপে অবস্থান করিলেই ভগবানের কৃপার বিচিত্রতা বুঝা যায়, কত ভাবে ভগবান্ কৃপা করেন। সাধুগণ আপন আপন জীবনের অতি সাধারণ ঘটনার মধ্যে আরাধ্য-দেবতার করুণা উপলব্ধি করিয়া আনন্দে ডুবিয়া থাকেন। বিশ্বাসীর নিকট সেই সকল সাধারণ ঘটনার সমাবেশও অমূল্য সম্পৎ। অবিশ্বাসীকে সাক্ষাৎ ভগবান্ দেখাইলেও সে সন্দেহ করিতে ছাড়ে না। বিশ্বাসীর অন্তর ভগবৎকথা শ্রবণেই গলিয়া যায়। সাধুগণ ভগবানের অনুভব এবং বিশ্বাসের খনি। তাহাদের কাছে থাকিলে প্রতিপদে ভগবৎকৃপা অনুভব করা যায়। একা সাধুসঙ্গ করিবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। জনার্দন বলিলেন—বৎস, তুমি এখন কিছুদিন সাধুগণের সমবায়ে অবস্থান কর। সাধু সেবায় চিত্ত নির্মল হয়। তাহারা সমগ্র জীব-জগতের পরম বান্ধব। তাহাদের সমীপে প্রীতিময় ব্যবহার শিক্ষা কর। তোমাকে আমার জীবনের একটি প্রধান উদ্দেশ্য সফল করিতে হইবে। তুমি ভাগবতের ধর্ম প্রচার কর। এই ধর্মই বিশ্বের সকল জীবের শান্তি আনয়ন করিবে। বিশ্বাত্মা ভগবানের সন্তোষ বিধান এই ধর্মের মূল কথা। বিশ্ব-বান্ধব সাধুর নিকটেই সত্য ধর্মের সন্ধান পাইবে। সাধারণ লোক যাহাতে এই প্রেমময় ধর্মের পরিচয় লাভ করিতে পারে তুমি সেই ভাবে চেষ্টা কর। গুরুর আদেশে তীর্থভ্রমণ

প্রসঙ্গে একনাথ ভাগবত-ধর্ম প্রচার করিতে লাগিলেন। তাহার অন্তরে অফুরন্ত উল্লাস। ধর্মপ্রচার তাহার গুরু-সেবা; তিনি চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়া ওবীছন্দে এক গ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থ শুনিয়া জনার্দন অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

একনাথ বহুদিনপর জন্মভূমি দেখিবার জন্য পৈঠনে আসিলেন। তিনি নিজগৃহে প্রবেশ করিলেন না। নিকটস্থ পিপ্পলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে উঠিলেন। তাহার বৃদ্ধ ঠাকুরদাদা তখনও জীবিত। ইতিমধ্যে তিনি অনেক খোঁজ করিয়াও একনাথকে ধরিতে পারেন নাই। তিনি নিজে জনার্দন স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া একনাথের বিবাহের অনুমতি-পত্র আনিয়াছেন। গুরু লিখিয়া দিয়াছেন—একনাথ তুমি বিবাহ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে থাক। বৃদ্ধ চক্রপাণি মহাদেবের মন্দিরের দিকেই যাইতেছিলেন। পথে প্রিয় পৌত্রের সঙ্গে দেখা। বৃদ্ধকে দেখিয়া একনাথও ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিলেন না। বৃদ্ধের স্নেহ-শিথিল বাহু-বন্ধনে ইচ্ছা করিয়াই ধরা পড়িলেন। আনন্দে বৃদ্ধের সর্ব অঙ্গ কাঁপিতেছিল, কণ্ঠ রুদ্ধ—নয়নে অশ্রুধারা।

চক্রপাণি বলিলেন—আমি তোমার গুরুর নিকট হইতে অনুমতি আনিয়াছি। এই দেখ তিনি লিখিয়াছেন—'গৃহস্থাশ্রম অপর সকলের মাতৃআশ্রম। একনাথ গৃহস্থ হইয়া ধর্মপ্রচার করুক।'

গুরু-আজ্ঞার উপর অভিমত প্রকাশ অনুচিত। একনাথ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গুরুর আদেশে বিবাহ করিয়া গৃহস্থ। তাহার সহধর্মিণী গিরিজাবাই পতিপরায়ণা আদর্শ গৃহিণী। অপতিতভাবে গৃহস্থধর্ম পালনকরা একনাথের ব্রত। ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ। প্রাতঃস্মরণের পর গুরুচিন্তা। শৌচের পর প্রাতঃস্নান, সন্ধ্যা। সূর্যোদয়ের পর গৃহে নিয়মিত ভগবৎবিগ্রহ সেবাপূজা, গীতা ও ভাগবত অধ্যয়ন। মধ্যাহ্নে গোদাবরী স্নান, তর্পণ, সন্ধ্যা, ব্রহ্মযজ্ঞ অনুষ্ঠান। গৃহে ফিরিয়া বৈশ্বদেব-বলি এবং অতিথি সেবার পর ভোজন। বৈকালবেলা ভক্ত-সঙ্গে সৎকথা, ভাগবত, রামায়ণ অথবা জ্ঞানেশ্বরী পাঠ-ব্যাখ্যা। সন্ধ্যাকালে স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত বিট্‌ঠলমূর্তির আরতি। হরিনাম কীর্তনের পর অন্ন প্রসাদ

গ্রহণ করিয়া বিশ্রাম। প্রতিদিন এই ভাবে তিনি পবিত্রজীবন যাপন করিয়া গৃহস্থের আদর্শ শিক্ষা দিয়াছেন।

ভানুদাস ছিলেন একনাথের প্রপিতামহ। তাঁহার জন্ম ১৪৪৮ খৃষ্টাব্দে বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। তিনি ছিলেন একজন দেশস্থ ব্রাহ্মণ। দামাজীপন্ত নামক সাধুও ইঁহার সমসাময়িক বলিয়া অনুমান করা হয়। ভানুদাস মাত্র দশবৎসর বয়সে একদিন পিতৃকর্ত্তৃক ভৎর্সিত হইয়া এক সূর্যমন্দিরে যাইয়া সাতদিন পর্যন্ত কঠোর সাধনা করেন। সেই হইতে তাহার ভানুদাস খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে।

তখন হাম্পি নামক স্থানে বিট্‌ঠল বিগ্রহ ছিলেন। কৃষ্ণরায় এই বিগ্রহ সেখানে নিয়াছিলেন। ভানুদাস হাম্পিতে (বর্তমান বিজয়নগর) বিট্‌ঠলের মন্দির হইতে সেই মূর্তি পণ্ডরপুরে লইয়া আসিলেন। যখন শত্রুর আক্রমণে বিঠোবার মন্দিরের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা হইয়াছিল এমনি একদিন বিট্‌ঠল বিগ্রহ বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় হাম্পিতে লইয়া আসেন। পণ্ডরপুরের সাধুসম্প্রদায়ের প্রথম পর্যায়ে জ্ঞানদেব, দ্বিতীয় পর্যায়ে নামদেব, তৃতীয় পর্যায়ে ভানুদাস, জনার্দন এবং একনাথ প্রভৃতি। ভানুদাসের বিট্‌ঠল-প্রীতি সাধুগণের সমীপে আদর্শ। তিনি বলেন—

জরি হে আকাশ বর পডোঁ পাহে। ব্রহ্মগোল ভংগা যায়ে॥
বড়বানল ত্রিভুবন খায়। তরী মী তুম্হীচ বাট পাহে গা বিঠোবা॥

মাথার উপর আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ুক, ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণিত হইয়া যাউক, ত্রিভুবন বাড়বানলে দগ্ধ হইয়া যাউক, তথাপি হে বিঠোবা, আমি তোমার পথ চাহিয়া থাকিব।

তিনি বলেন—আমি ভগবানের নাম গ্রহণ ভিন্ন আর কোন সাধন বিধি জানি না। এই পণ্ডরপুর-ধাম মণিরত্নের খনি। যথেচ্ছভাবে এখানে আসিয়া সেই সম্পদ্ লইয়া যাও। এই ধামের তাহাতে কিছুই কমিয়া যাইবে না। বিট্‌ঠল সেই মণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠমণি।

একদা বিগ্রহের মণিমালা চুরির অপরাধে সন্দেহক্রমে ধৃত হইয়া ভানুদাস যখন দণ্ডিত হন তখন তিনি কতগুলি অভঙ্গ রচনা করেন। উহাদের মধ্যে তাহার মর্মবাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়। তিনি বলেন—আমাকে আর কত পরীক্ষা করিবে? আমার শ্বাস কণ্ঠপর্য্যন্ত আসিয়া

রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। সকল প্রকার দুঃখই একে একে আমার ভাগ্যে জুটিয়া আসিতেছে। আমার মন দুঃখের পাথারে ডুবিয়া গেল। এ বিপদে হে বিঠোবা, পদতলে লুণ্ঠিত হওয়া ভিন্ন আর কোনও উপায় দেখিতেছি না। আমার অভিলাষ পূর্ণ, আমার অন্তর সুখে পূর্ণ করিয়া দাও। আমি তোমার নামের শক্তিতে বিশ্বাস করি। আমাকে আর কেন অপরের গলগ্রহ করিয়া রাখ? সপ্ত সমুদ্র একত্র হউক—পৃথিবী মহাশূন্যে লীন হউক—পঞ্চমহাভূত ধ্বংস হইয়া যাউক, তবু আমি তোমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না। যত বিপদই আসুক না কেন, আমি তোমার নাম ছাড়িব না। আমার সঙ্কল্প হইতে আমি একটুও বিচলিত হইব না। পতির প্রতি পত্নী যেরূপ অনুরক্ত, হে নাথ, আমি তোমার প্রতি সেইরূপ অনুরক্ত। ভানুদাস এই সকল অভঙ্গ রচনার সময় ভগবানের দর্শন লাভ করেন।

তিনি বলেন—তাঁহার কৃপায় শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডে নব অঙ্কুর উদ্‌গম হইয়াছে। ভগবানের কৃপা হইলে সাধুগণের সমাগম হয়। সাধুসঙ্গেই ভগবানের কৃপার অনুভব। একনাথ সাধুর সমাদর করেন। ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, ব্রহ্মচারী, সন্ন্যাসী সকলেই তাহার কাছে শাস্ত্রচর্চা ও সৎকথা শ্রবণের জন্য আগমন করেন। গৃহে অন্নদান, জ্ঞানদান, সমান ভাবেই চলিয়াছে। ভাণ্ডার যেন সর্বদা পূর্ণ। কোথা হইতে কে কি যোগাইতেছে তাহা একনাথ জানেন না। স্ত্রী পুরুষ সমান ভাবে সাধু-দর্শনে আসিতেছেন। সকলেই বলে, আমরা এরূপ সাধুর দর্শনে পবিত্র হইলাম।

এই মহাত্মা নিয়মিত গোদাবরী স্নানে যাইতেন। যাইবার পথে একটি সরাইখানা। সেখানে এক অপবিত্র চরিত্র লোক বাস করিত। সেইপথে সাধুর যাওয়া আসার সময় সে নানাপ্রকারে অশান্তির সৃষ্টি করিত। তাহার ধর্মবিদ্বেষ ক্রমে বাড়িয়া যাইতেছিল। অপরের ধর্ম নষ্ট করিবার অপচেষ্টায় তাহার নৈতিক চরিত্র এতদূর অধঃপাতিত হইয়াছিল যে, অকারণে অপরের অনিষ্ট করিতে তাহার কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ হইত না। একদিন একনাথ স্নান করিয়া স্তব পাঠ করিতে করিতে ঐ পথে গৃহে ফিরিতেছেন। দুষ্ট লোকটি সাধুর গায়ের উপর উচ্ছিষ্ট জল ছিটাইয়া দিল। সাধু ফিরিয়া স্নান করিয়া আসিলেন। অগ্রসর

হইতেছেন, আবার সেই লোকটি তাহার মুখের জল ছড়াইয়া দিল। এইভাবে সাধুর বার বার স্নান এবং অপবিত্রীকরণ চলিল। সাধু বিরক্তির কোন চিহ্নই প্রকাশ করেন না। অসীম ধৈর্য দেখিয়া অবশেষে সেই লোকটির ভাবান্তর উপস্থিত হইল। সে আসিয়া একনাথের শরণাগত হইল। সে বলিল—আপনি এই জাতীয় ধৈর্যগুণ কেমন করিয়া লাভ করিলেন। সাধু বলিলেন—ভাই, মাটির দিকে চাহিয়া দেখ। এই ধরণী আমাদের কত অত্যাচার সহ্য করে, তবু পায়ের তলায় থাকিয়া আমাদের ধারণ করে। শিক্ষা লইতে ইচ্ছা করিলে এই মাটির কাছেই ধৈর্যগুণের শিক্ষা যথেষ্ট পাওয়া যায়। সাধুর কথা শুনিয়া তাহার জীবন-ধারা পরিবর্তিত হইয়া গেল।

দ্বিপ্রহর রাত্রিকালে চারজন তৈর্থিক ব্রাহ্মণ সাধুর গৃহে আসিয়া উপস্থিত। মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। বাহিরে যাইবার উপায় নাই। জ্বালানী কাঠ যাহা ছিল ভিজিয়া গিয়াছে। শীতের রাত্রি আগন্তুকগণ জলে ভিজিয়া শীতে কাঁপিতেছিলেন। তাহাদের জন্য গরম জল প্রয়োজন। হাত পা গরম করিবার জন্য অগ্নি প্রয়োজন। রন্ধনের জন্য কাঠ প্রয়োজন। গিরিজাবাই স্বামীকে বলিলেন—এ দুর্যোগে শুষ্ক কাষ্ঠ কোথায় পাওয়া যায়? একনাথ বলিলেন—তুমি ব্যস্ত হইও না এখনই আনিয়া দিতেছি। সাধুজী নিজের ঘরের তক্তপোষ ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। উহা হইতে কাষ্ঠ খণ্ড খণ্ড করিয়া দিতে লাগিলেন। উহা দ্বারাই রন্ধন এবং অন্য কার্য সেদিন হইয়া গেল। পরদিন প্রতিবেশীরা এই কথা শুনিয়া সাধুকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

পিতৃদেবের তিথি-শ্রাদ্ধ। বহু ব্রাহ্মণের ভোজন হইবে। রন্ধন হইয়া গিয়াছে। দ্বারে দাঁড়াইয়া ব্রাহ্মণগণের আগমনের প্রতীক্ষায় একা। কয়েকটি লোক নিকটবর্তী পথে যাইতে যাইতে বলিতেছে—বাঃ খুব সুন্দর গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। এ বাড়ীতে বুঝি লোক খাইবে! এরূপ সুখাদ্যের গন্ধে ক্ষুধা না থাকিলেও ক্ষুধার উদ্রেক হয়! তবে আমাদের মত হীনভাগ্যের অদৃষ্টে এসব খাদ্য জুটিবার নয়। তাহাদের কথা একনাথের কানে গেল। তিনি সেই লোকগুলিকে ডাকাইয়া তাহাদের

বন্ধুবান্ধব সহ পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন করাইলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ যখন আসিলেন তখন পুনরায় রন্ধন হইতেছে।

ব্রাহ্মণগণ বলিলেন—একনাথ, তুমি ব্রাহ্মণ ভোজনের পূর্বে এই সব পতিতজাতির লোক ভোজন করাইয়াছ। তুমিও ইহাদের সহিত পতিত হইয়াছ। এরূপ ব্যক্তির গৃহে আমরা ভোজন করিব না। ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত রাগিয়া গিয়াছেন। তাহাদের অনেক অনুনয় বিনয় করা হইল। তাহারা কিছুতেই মানিলেন না। রাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

একনাথ নিরুপায়। শ্রাদ্ধকার্য যথাসাধ্য শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত করিয়া তিনি পিতৃপুরুষগণের ধ্যান করিলেন। তখন তিনি দেখিতে পাইলেন—পিতা, পিতামহ সকলেই মূর্তি পরিগ্রহকরিয়া শ্রাদ্ধের বাড়ীতে আনন্দ সহকারে ভোজন করিতেছেন। এই দৃশ্য দেখিয়া একার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণ-ভোজন হইল না বলিয়া আর দুঃখ রহিল না।

প্রয়াগ-তীর্থ হইতে গঙ্গাজল লইয়া একদল সাধু কাশীধামে যাইতে-ছিলেন। একনাথ তাহাদের সহিত চলিলেন। কলসীতে জল পূর্ণ করিয়া লইয়াছেন। কাশীধামে শ্রীবিশ্বনাথের মাথায় সেই জলের কিছু দেওয়া হইয়াছে। তাহারা চলিয়াছেন—রামেশ্বর সেতুবন্ধ সেখানে অবশিষ্ট জল রামেশ্বরের মাথায় দিতে পারিলে তাহাদের ব্রত পূর্ণ হয়। পথে কত ক্লেশ! রৌদ্র বৃষ্টি সমান ভাবে দেহের উপর দিয়া যাইতেছে। ব্রতধারী জলবহন করিয়া চলিয়াছে—দূর দূরান্তরের পথে। প্রখর রৌদ্রের অসহ্য তাপ। বালুকাময় বিশাল প্রান্তর অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইতেছে সাধুর দল। একনাথ দেখিলেন—একটি গাধা তপ্ত বালুকায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। বুঝিলেন—গাধাটি পিপাসায় কাতর হইয়াছে। একনাথ কাঁধের ভার নামাইলেন। ধীরে ধীরে গাধাটির কাছে যাইয়া তাহার মুখে সেই কলসীর জল ঢালিয়া দিলেন। গাধাটি স্থিরভাবে জল খাইতে লাগিল। সঙ্গী সাধুগণ একনাথকে বলিলেন—তুমি কেমন সাধু, এতদূর তীর্থের জল বহন করিয়া আনিয়া উহা এইভাবে ঢালিয়া ফেলিলে? তোমার ধর্মবিশ্বাস মোটে নাই। অপবিত্র গাধার মুখে জল ঢালিয়া তুমি [illegible] করিলে। একনাথ বলিলেন—ভাই, আমি নির্বোধ, তাই এরূপ কর্ম করিয়াছি, কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিই বা কেমন বল দেখি? তোমরা

সর্বদা বলিয়া থাক—সর্বজীবেই ভগবান্ আছেন। কাজের সময় সেই কথা ভুলিয়া যাও কেন? নিরুপায় গাধাটির তৃপ্তিতে কি সেই বিশ্বনাথের তৃপ্তি হয় নাই? যথা সময়ে কাজে না লাগিলে জ্ঞানের বোঝা বহন করিবার প্রয়োজন কি? আমার মনে হয়, গাধার মুখে যে গঙ্গা ঢালিয়াছি উহা শ্রীরামেশ্বর কৃপা পূর্বক গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান্ যদি তাঁহার পথে চলিতে চলিতে তাঁহার সেবা করিবার অবসর প্রদান করেন, উহা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

পৈঠনে এক পতিতা বাস করিত। সে ছিল রূপে, গুণে, নৃত্য-গীতে কলা ও কৌশলে অতুলনীয়। একনাথস্বামী মন্দিরে ভাগবত-কথা করিতেন। সে মাঝে মাঝে সেই কথা শুনিতে যাইত। পিঙ্গলার কথা হইতেছে—"অনেক রাত্রি অপেক্ষা করিল পিঙ্গলা। দ্বারে ও ঘরে আকুল উৎকণ্ঠায় ছুটাছুটি, কামুক বন্ধুটি আসিল না। হতাশ হইয়া পিঙ্গলা শয্যায় শুইয়া পড়িল। সে ভাবে—বৃথা ঘৃণিত শরীর বহন করিয়া কামুকের সঙ্গে অধঃপতিত হইতেছি। আমার অন্তর্যামী ভগবান্। তিনি পরম সুন্দর। তাঁহার বিচ্ছেদ নাই, বিরহ নাই। আমি তাঁহার সহিত রমণ করিব। আমাদের মিলন কখনও ভঙ্গ হইবে না। এই ভাবে তাহার জাগতিক ব্যাপারে ঘৃণা এবং বৈরাগ্যের উদয় হইল। সে অন্তর্মুখী হইয়া ভগবানের চরণে শরণাগত হইল।" ভাগবতের কথা শুনিয়া পূর্বোক্ত পতিতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। সে কায়মনোবাক্যে ভগবানে আত্মসমর্পণ করিল।

একদিন গোদাবরী স্নান করিয়া একনাথ ফিরিতেছেন। পথের ধারে কে যেন ডাকিল—প্রভু, একবার আমার মত অপবিত্রার বাড়ীতে আপনার পদধূলি পড়িবে কি? স্বামীজি বলিলেন—ইহা আর কঠিন কথা কি? চল যাইতেছি। অকুণ্ঠিত হৃদয়ে একনাথ সেই পতিতার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাহার পদধূলিতে সেই গৃহ পবিত্র হইয়া গেল। সেই পতিতা চিরজীবনের জন্য সাধুর সমীপে আত্মনিবেদন করিল। তাহার পূর্বজীবনের অপবিত্রতা দূর হইয়া গেল। সে ভগবানের নাম গ্রহণ করিয়া সাধু-জীবন যাপন করিতে লাগিল।

একনাথ হরিনাম কীর্তন করেন। বহু লোকের সমাগম হয়। একদিন কয়েকটি চোর কীর্তন শ্রবণের অছিলায় মণ্ডলীর মধ্যে ঢুকিয়াছে।



অতএব লোকের মধ্যে কে কাহাকে চিনিবে ? তাহারা ভাবিতেছে—কীর্তন শেষ হইয়া গেলে সমস্ত লোক চলিয়া যাইবে, আমরা অন্ধকারে লুকাইয়া থাকিব। পরে যাহা কিছু সংগ্রহ করা যায় লইয়া পালাইব। কীর্তন শেষ হইতে অনেক রাত্রি হইয়াছে। লোকজন সব চলিয়া গিয়াছে। চোরেরা মন্দিরে ঢুকিয়া কাঁসা ও পিতলের বাসনপত্র লইতেছিল। হঠাৎ একটি পাত্র হাত হইতে পড়িয়া গেল। ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল। একনাথ আসনে বসিয়া জপ করিতেছিলেন। রাত্রে অপ্রত্যাশিত শব্দ শুনিয়া তিনি আসন ছাড়িয়া উঠিলেন। মন্দির দ্বারে আসিয়া দেখেন—কয়েকটি লোক পালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে; বাহির হইবার পথ পাইতেছে না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমরা কে ? তাহারা উত্তর করিল—স্বামীজি, আমরা অপরাধী। চুরি করিবার জন্য মন্দিরে ঢুকিয়াছিলাম। আমাদের উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে। আমরা অন্ধ হইয়া গিয়াছি। বাহির হইতে পথ পাইতেছি না। আপনি আমাদের রক্ষা করুন। সাধু অগ্রসর হইয়া তাহাদের চক্ষে হাত বুলাইয়া বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা করিয়া তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন।

সাধুর কৃপায় তাহাদের দৃষ্টিশক্তি লাভ হইল। নূতন দৃষ্টি পাইয়া তাহারা ভগবানের রূপ দর্শনের নিমিত্ত সাধনায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের জীবনের কলঙ্ক চিরকালের জন্য দূর হইয়া গেল।

১৬৫৬ সম্বতে চৈত্র কৃষ্ণা ষষ্ঠী তিথিতে (১৬০১ খৃষ্টাব্দে) বহু ভক্ত মিলিত ভাবে সঙ্কীর্তন করিতেছিলেন। সাধু একনাথ সেই নামের ধ্বনির মধ্যে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া অভীষ্ট দেবতার চরণতলে আশ্রয় লইলেন।

মহারাষ্ট্র-সাহিত্য-ভাণ্ডারে একনাথের দান খুব কম নয়। তিনি আধ্যাত্মিক রচনায় সিদ্ধহস্ত। একাদশ স্কন্ধ ভাগবতের ব্যাখ্যা একনাথী-ভাগবত নামে প্রসিদ্ধ। উহা ছাড়া একনাথ বলিয়াছেন, তিনি ভগবৎ-প্রেরণায় ভাবার্থ-রামায়ণ রচনা করিয়াছেন। যদিও তিনি আংশিক লিখিয়া পরবর্তী অংশ শিষ্যের দ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন তথাপি উহা তাহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। একনাথের অপর গ্রন্থ রুক্মিণী-বিবাহ। তাহার অভঙ্গগুলি আধ্যাত্মিক অনুভব পরিপূর্ণ। ইহারই মধ্যে একনাথের

প্রাণ-রসের পরিচয় পাওয়া যায়। চতুঃশ্লোকী ভাগবতের ব্যাখ্যা ও আত্মসুখ নামে গ্রন্থও তাহার রচিত।

একনাথ ছিলেন একজন কাব্য-রসিক। তাহার রস রচনায়—শৃঙ্গার বীর, হাস্য, করুণ প্রভৃতি রসের বর্ণনায় তিনি যে অদ্ভুত কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, উহা মহারাষ্ট্র-সাহিত্যের গৌরব। তিনি কেবল সাধুই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একাধারে ধর্মাচার্য ও কবি। নিবৃত্তিনাথের প্রতি জ্ঞানদেব যে ভক্তির কথা প্রকাশ করিয়াছেন, একনাথ তাঁহার গুরু জনার্দন স্বামীর উদ্দেশেও তদনুরূপ বহু কথা বলিয়াছেন। অভঙ্গের মধ্যে নিজের নামের সহিত গুরু জনার্দনের নাম যুক্ত করিয়া তিনি গুরুদেবের স্মৃতিকে চিরন্তনী করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি বলেন—আমি আমার পবিত্র মনে সর্বাগ্রে গুরুদেবের জন্য আসন রচনা করিয়াছি। তাঁহার পাদপদ্মসমীপে অভিমানের ধূপ প্রদান করিয়াছি। আমার সদ্‌ভাব-প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছি, আমার পঞ্চপ্রাণ তাঁহাকে নৈবেদ্য অর্পণ করিয়াছি। আমার গুরুদেব আমার অভিমান দূর করিয়াছেন। আমার অন্তরে নিত্য আলোককে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই আলোক ছটার উদয় নাই, অস্ত নাই। জনার্দন আমারই মধ্যে আমার প্রিয়তমকে দর্শন করাইয়াছেন। আমার সাধনার অপেক্ষা না করিয়াই তিনি আমার হৃদয়ের কবাট খুলিয়া দিয়াছেন। গুরু-কৃপার চরমরহস্যই এই যে, তিনি আমাকে বিশ্বময় ভগবানকে দর্শন করাইয়াছেন। যাহা কিছু দেখি, শুনি বা আস্বাদন করি, সকলই যে আমার প্রিয়তম ভগবানের স্বরূপ। গুরুদেবকে যে ভগবানের স্বরূপ দর্শন করে, ভগবানও তাহার সেবক হইয়া যান।

ভগবানে অবিশ্বাসীর সমীপে আধ্যাত্মিক-জীবন তিক্ত বলিয়া বোধ হয়। তাহার রসনায় পবিত্র নাম উচ্চারিত হয় না, অবিশ্বাসেই পাপের অভ্যুদয় হয়, অভিমান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, আধ্যাত্মিক-জীবন ধ্বংস করে। অভিমানী ভগবানের স্বরূপতা লাভের নিমিত্ত গর্ব করিয়া নূতন বন্ধন প্রাপ্ত হয়। লোহার শিকল ছিঁড়িয়া তাহারা সোণার শিকলে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। কতগুলি লোক জ্ঞানের গরিমায় আধ্যাত্মিক-জীবনের আনন্দ হারাইয়া ফেলে, আবার কেহ গন্তব্য স্থানে পৌঁছিতে পারে না

বলিয়া অর্দ্ধ পথে উহা ছাড়িয়া দেয়। কেহ 'সময়ান্তরে দেখা যাইবে' বলিয়া সাধনার পথ হইতে ভ্রষ্ট হয়। হিং-এর সঙ্গে থাকিলে কস্তুরীর সদ্‌গন্ধও বিনষ্ট হইয়া যায়, অসাধুর সঙ্গ-দোষে সাধুরও পবিত্রতা নষ্ট হয়, নিম্ববৃক্ষমূলে শর্করার সার দিলেও নিম্ব কখনও মধুর রসযুক্ত হয় না। গৃহ ছাড়িয়া বনে বাস করিলেই কেহ সাধু হইয়া যায় না, শূকরও বনেই বাস করে। হৃদয়ের পবিত্রতা ও পবিত্র দৃষ্টি না লইয়া যাহারা বনে গমন করে, তাহারা অন্ধকার কোটর-নিবাসী পেচকের মত। সংস্কৃত ভাষা বলিলেই ভগবান্ শুনিবেন, কথ্য ভাষায় বলিলে ভগবান্ শুনিবেন না, ইহা ভ্রান্তি।"

সংস্কৃত বাণী দেবেঁ কেলী<br>
প্রাকৃত তরী চোরা পাসুনী ঝালী<br>
অসোত যা অভিমান ভুলী<br>
বৃথা কেলী কায় কাজ<br>
আতাঁ সংস্কৃতা অথবা প্রাকৃতা।<br>
ভাষা ঝালী জে হরি কথা<br>
তে পাবনচি তত্ত্বতাঁ<br>
সত্য সর্বথা মানলী<br>
দেবাসি নাহীঁ বাচাভিমান<br>
সংস্কৃত প্রাকৃত তয়া সমান<br>
জ্যা বাণী জাহলেঁ ব্রহ্ম কথন<br>
ত্যা ভাষা শ্রীকৃষ্ণ সন্তোষে॥

আমরা কি একথা বলিতে পারি যে, সংস্কৃত ভাষা দেবতা সৃষ্টি করিয়াছেন, আর অন্য ভাষা চোরে সৃষ্টি করিয়াছে। আমরা যে ভাষায়ই ভগবানের মহিমা কীর্তন করি না কেন, উহাই তিনি আদর করেন। ভগবানই সকল ভাষা সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবতার ভাষার অভিমান নাই, সংস্কৃত ও কথ্য ভাষা তাঁহার সমীপে সমান। যে ভাষাতে ব্রহ্ম-কথা হয়, উহাতেই শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ হয়।

অদৃষ্ট অন্যথা হয় না। কর্পূরকে কৌটার ভিতর রাখিলেও উহার গন্ধ বাতাস হরণ করে। সমুদ্রগামী জাহাজও ডুবিয়া যায়। প্রতারক জালমুদ্রাকেও চালাইয়া দেয়। দস্যু ভূগর্ভে প্রোথিত ধনও হরণ করে।

পাকাধানের ক্ষেত্রও জলে ভাসাইয়া লইয়া যায়। ভূবিবরে রক্ষিত ধন দুর্ভাগ্যক্রমে মৃত্তিকায় পরিণত হয়, অদৃষ্টের পরিহাস এই প্রকার! মৃত্যুকে অনিবার্য জানিয়াও লোকে মৃত্যুকে ভয় করে। তাহারা একবারও ভাবিয়া দেখে না, যাহারা ভয়ে পালাইয়া যায় তাহারাও একদিন মৃত্যুর গ্রাসে পতিত হয়। ফুলের পশ্চাৎভাগে ফল পুষ্ট হয়। ফুল ঝরিয়া পড়ে, ফল বোঁটায় থাকে—সে কতদিন? ফলও সময় হইলেই খসিয়া পড়ে। শববহনকারীরা যখন বলে—বড় ভারী বোধ হইতেছে, তখন তাহারা কি ভাবে তাহারাও একদিন এইভাবে বাহিত হইবে? যাহারা ভগবানের শরণাগত হয়, তাহারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করে। আমার মতে তীর্থযাত্রীর ভাব মনে রাখিলে আর ভয় থাকে না। তীর্থযাত্রী সন্ধ্যার অন্ধকারে সহরে প্রবেশ করিল, সকালবেলার আলোকে স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে চলিল; ছোট ছেলেরা খেলাঘর তৈরী করে, আবার ভাঙ্গিয়া ফেলে। মানব জীবনও সেইরূপ একটি খেলাঘর। আঙ্গিনায় নামিয়া আসিল পাখী, দুই চারিটি শস্য কণা খাইল, আবার উড়িয়া চলিয়া গেল। জীবনের সুখ দুঃখ ভোগকেও এইভাবে দেখিবে। কামের প্রভাব দুর্জয়। শঙ্কর মোহিত হইয়াছেন, ইন্দ্র ভয় পাইয়াছেন, নারদ বিপন্ন হইয়াছেন, রাবণ নিহত হইয়াছেন এবং দুর্যোধনের অধঃপতন হইয়াছে এই কামের প্রভাবে! কেবল ধ্যানের প্রভাবেই শুকদেব তাহাকে নির্জিত করিয়াছেন।

একনাথ বলেন সর্বত্র ভগবদ্ভাব দর্শনই ভক্তি। তাঁহার স্মৃতিই তাঁহার স্বরূপ। তাঁহার বিস্মৃতিই মায়া। তাঁহার নাম কীর্তনই প্রধান ভক্তি। অনিত্য বস্তু-জগতে এক নামই নিত্য। নামেই মনের সকল আশা পূর্ণ হয়। ভক্তিহীন ব্যক্তি ভগবানের লীলা শিশুর খেলা বলিয়া মনে করে। আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে পূর্ণহৃদয় ভগবানের লীলার মহিমা বুঝিতে পারে। সাধারণ লোকে নিরর্থক বিতর্ক করে। তাহারা জানে না ভগবানের নাম হইতেই রূপের প্রকাশ হয়। তাঁহার নাম গ্রহণে পাপীর হৃদয়ে আনন্দ উদগম হয় না। তাঁহার নামে আধ্যাত্মিক আনন্দ উদয় হয়, দেহ ও মনের সকল ব্যাধি দূর হইয়া যায়। নাম-সাধনা ধৈর্য ধারণ করিতে শিক্ষা দেয়।

অনুরাগীর কীর্তনে প্রতিপদে নূতন মাধুর্য অনুভব হয়। শ্রোতা ও কীর্তনকারী উভয়ে ভগবানের ভাবে পূর্ণ হয়। অনুরাগভরে কীর্তন করিলে ভগবান্ দর্শন দান করেন। তখন কত আনন্দ! সে আনন্দ আকাশেও ধরে না। যাহাকে যোগীর ধ্যান-পূত মন ধরিতে পারে না তিনি কীর্তনে নৃত্য করেন। প্রাণান্তেও কীর্তন হইতে বিরত হইবে না।

সাধুগণের গুণগান করিয়া তাহাদের সঙ্গে আমরা হরিনাম কীর্তন করিব। এক এক জন এক এক প্রকার সাধন করিয়াছেন। আমরা নাম-সাধন করিব। সাধু-দর্শন সৌভাগ্যের সূচনা করে। সত্যকার সাধু তাহার মনের শান্তভাব ভঙ্গ হইতে দেন না। অপরের দ্বারা নিগৃহীত হইয়া অথবা প্রিয়জন হারাইয়াও শোকাশ্রু বিসর্জন করেন না। সর্বস্ব চুরি করিয়া লইয়া গেলেও বিমর্ষ হন না. প্রশংসা ও নিন্দাকে তিনি সমান ভাবেই গ্রহণ করেন। সকল ব্যথার মধ্যেও তাহার ব্যথাহারী ভগবানের কথাই অন্তরে ফুটিয়া উঠে। তাহার আহ্বানে ভগবান্ সাড়া দেন। তাহারা অমৃতবর্ষী মেঘ হইতেও জনসুখকর কৃপাবর্ষণকারী। তাঁহাদের সঙ্গ লাভে মানুষের মৃত্যুভয় দূর হইয়া যায়। ভক্তের সমীপে ভগবান্ নিজে তাঁহার ভগবত্তা ভুলিয়া যান। ভক্তের কাছে ভগবান্ আপন-ভোলা হইয়া যান। ভক্ত তাহার বোঝা ভগবানের কাঁধে চাপাইয়া দেয়। ভগবানও আনন্দ সহকারে উহা বহন করেন। তিনি তাহার ভক্তকে সেবা করেন। তিনি অর্জুনের সারথ্য অঙ্গীকার করিয়াছেন। দ্রৌপদীকে বিপদ্ হইতে মুক্ত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ সুদামার দারিদ্র্য দূর করিয়াছেন। ক্ষত্রিয় পরীক্ষিতকে মায়ের গর্ভে রক্ষা করিয়াছেন। বৈশ্য রাখাল বালকের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াছেন। কুম্ভকার গোরার সঙ্গে মাটীর হাঁড়ি তৈরী করিয়াছেন। চোখামেলার সঙ্গে গরুর গাড়ী চালাইয়াছেন। সান্তবার সঙ্গে ঘাসের বোঝা বহিয়াছেন। ভক্ত কবীরের সঙ্গে তাঁত বুনিয়াছেন। রুহিদাসের সঙ্গে চামড়া রঙাইয়াছেন। কসাই সুজনের সঙ্গে মাংস বেচিয়াছেন। নরহরির সঙ্গে স্বর্ণকারের কাজ করিয়াছেন। জনার সঙ্গে ঘুঁটে দিয়াছেন। দামাজীর অস্পৃশ্য সংবাদদাতা হইয়াছেন। সত্যই ভক্তির প্রাবল্য ভক্তকে বড় করিয়াছে, ভগবানকে ছোট করিয়াছে। ভগবান ও ভক্তের

সম্বন্ধ সমুদ্র ও তরঙ্গের মত, স্বর্ণ ও অলঙ্কারের মত, কুসুম ও তাহার গন্ধের মত। ভগবান্ ভক্তের পদাঘাত বক্ষে ধারণ করিয়াছেন। কংস কৃষ্ণের সহিত বিরোধ করিয়াছিল, কিন্তু নারদকে সম্মান করিল বলিয়াই মুক্তি পাইল। ভক্ত প্রাণ, ভগবান্ দেহ। ভক্তের কথা ব্যর্থ হইলে ভগবানের হৃদয়ে ব্যথা লাগে।

একনাথ বলেন—ভগবদনুভবে অশ্রু, কম্প, পুলক, ভাবসমূহ উদিত হয়। তিনি বলেন,—আমার দৃষ্টির মধ্যে ভগবান্ আসিয়া চক্ষুর চক্ষু হইয়াছেন। সমস্ত বস্তুর মধ্যে তিনি বসিয়া সর্বময় হইয়া আছেন। সকল অঙ্গ ভগবৎসাক্ষাৎকারে উন্মত্ত হইয়াছে। আমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির অবস্থা অতিক্রম করিয়াছি। গুরুকৃপায় আমার সন্দেহ ভঙ্গ হইয়াছে। অন্তরে অন্তরতমরূপে আমি গুরু জনার্দনকেই দর্শন করি। জগন্ময় তাঁহারই অঙ্গের কান্তি ছড়াইয়া রহিয়াছে। আমার অন্তরে অস্তবিহীন রবির প্রকাশ। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যার ভেদ মিটিয়া গিয়াছে। পূর্ব-পশ্চিম দিগ্‌ভ্রম ঘুচিয়া গিয়াছে। কর্ম, অকর্মের বন্ধন টুটিয়া গিয়াছে। সরোবরের জলে তাঁহারই স্পর্শ, তীর্থে তাঁহারই স্থিতি, প্রতিটি জীবে তাঁহারই অস্তিত্ব, গগনের মেঘেও তাঁহারই ধ্বনি। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে তাঁহারই অনুভব। সাধুদের সঙ্গ-লাভের আকাঙ্ক্ষায় বিতাড়িত হইলেও ভগবান্ নির্লজ্জের মত ভক্তের গৃহেই অবস্থান করেন। ভক্ত দেশ-দেশান্তর বন-বনান্তর পর্বত বা অরণ্যে গমন করিলে ভগবান্ তাহার অনুগমন করেন। পূজকের পূজার সামগ্রী ভগবন্ময় হইয়া যায়। কে পূজারী, কে পূজ্য তাহাও নিরূপণ করা কঠিন হয়। একনাথ বলেন—আমি যেদিকে তাকাই আমার প্রিয়তমকে ভিন্ন আর কিছুই দেখি না, শাস্ত্র তাঁহার মহিমা বর্ণনায় অসমর্থ।